গৌড়ীয় প্রবন্ধ-মালা

সংগ্রাহক

শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী

—জগতে যে সকল দানের পরিচয় আছে, সেই সকল দান অল্পকাল স্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। তারপর জগতের দাতৃগণের সমষ্টিও অতি অল্প। পণ্ডিত মূর্খগণকে, ধনবান্ দরিদ্রগণকে, স্বাস্থ্যবান্ রোগিগণকে, বুদ্ধিমান্ নির্বুদ্ধিগণকে তাদের আশানুরূপ দান দিতে পারে না, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে দান প্রদান ক'রেছেন, মানবজাতি ততবড় দানের আশা প্রার্থনাও ক'রতে পারে নাই। এতবড় দান জগতে আস্‌তে পারে জীবের ভাগ্যে বর্ষিত হতে পারে,—একথা মানবজাতি পূর্ব্বে ভাব্‌তে ও আশা ক'রতে পারে নাই। শ্রীগৌরসুন্দর যে অপূর্ব্ব দান মানবজাতিকে দিয়েছেন, তা সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রেমা। জগতে প্রেমের বড়ই অভাব; সেই জন্যই হিংসা, বিদ্বেষ, কামনা, অন্যান্য কথা জীবকুলকে এত ক্লেশ প্রদান ক'র্‌ছে। ভগবানের সেবা করবার জন্য যাঁরা অভিলাষ-বিশিষ্ট, তাঁ'দিকে বাধা দিবার জন্য এমন কি, দেব প্রতিম ব্যক্তিগণ—সাক্ষাৎ দেবতাগণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত।

—জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় প্রবন্ধ-মালা

সংগ্রাহকঃ—

শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী

প্রথম সংস্করণ :

প্রকাশক :—

শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাশ্রম।

শ্রীধাম গোদ্রুম ; নবদ্বীপ

পোষ্ট - স্বরূপগঞ্জ,

জেলা—নদীয়া।

পিন কোড নং—৭৪১৩১৫

প্রকাশ কাল :—

কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ৫১০

তম শুভ আবির্ভাব তিথি বাসর।

দোল পূর্ণিমা, ৩০শে গোবিন্দ ৫০৯ গৌরাব্দ

৫ই মার্চ, ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

২১শে ফাল্গুন, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

মুদ্রক :— পোড়ামা প্রিন্টিং ওয়ার্কস

চরস্বরূপগঞ্জ

পোঃ—গাদিগাছা

জেলা—নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সবিনয় নিবেদন

১৯৯৬ সালের ৫ই মার্চ পরম ঔদার্যময় বিগ্রহ ও মহাবদান্য শিরোমণি কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব তিথি। এই তিথিরাজকে কেন্দ্র করে বিশ্বের সমস্ত জায়গায় ভক্তবৃন্দ প্রীতির অর্ঘ্য সাজিয়ে এই তিথিকে বরণ করে সাদরে অভ্যার্থনা করছেন। আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের জয়ধ্বনি, শুভ মঙ্গলধ্বনি সুরধুনীর মৃদু মন্দ মিষ্টি সুরের কলতান, পক্ষীগণের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন অবশেষে ভক্তবৃন্দের মুখে শ্রীগৌর আবির্ভাবের মঙ্গলগীতি অনুক্ষণ অনুরণিত হচ্ছে।

আজকের এই শুভ আবির্ভাব বাসরে শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদবর ও জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়তম অন্তরঙ্গ জন শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অভীষ্টানুসারে তাঁর কিছু বাণী পুনঃ প্রকাশিত হলেন। তিনি আচার্য লীলাকালীন বদ্ধজীবের সাধন ভজনের কোথায় খুঁত থেকে যাচ্ছে—যার জন্য তাঁরা বাড়ী-ঘর, আত্মীয় স্বজন এমনি সমস্ত ভোগ-ত্যাগ করে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কাছে এসে শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বাঁধছেন অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ করতে পারছেন না—সেদিকে শ্রীল আচার্যদেবের সুতীব্র দৃষ্টি ছিল। শ্রীল আচার্যদেব সুতীব্র রঞ্জন রশ্মির দ্বারা সাধক জীবের কেন ভজন হচ্ছে না—সেই সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে

'গৌড়ীয়'তে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তিনি এমনি দয়ালু যে, গ্যাল্‌ন গ্যাল্‌ন চিদ্‌রক্ত ব্যয় করে সাধক জীবগণের ভজনের Defect গুলো ধরিয়ে দিলেন।

কালের বিক্রমে এসব অমূল্য গ্রন্থরাজি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্যদেবের ইচ্ছায় বহুকষ্টে সংরক্ষিত এসব গ্রন্থরাজি থেকে অল্প কিছু সংকলন করে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হলো। যে সমস্ত সাধকজীব একজন্মে সিদ্ধিলাভ করতে চায়, দিব্যদেহে গোলোকে গমন করে যুগল সেবা পাবার অভিলাষী তারা এই গ্রন্থ পড়ে নিজের জীবনতরীকে ভজন পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে ও একজন্মে সিদ্ধিলাভ করতে পারবে—এবিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। এই গ্রন্থের মধ্যে মহৌষধী স্বরূপ এক একটি article আছে। তার মধ্যে 'সিদ্ধি হইতেছে না কেন?' 'যেন বঞ্চিত না হই', 'অশ্রুর মূল্য', 'কি ভাবে বাঁচিব', 'বঞ্চনা ও অমায়ায় কৃপা', 'শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি হইতে আমি কতটা দূরে!' 'অধিকার নির্ণয়', 'বিনোদবাণী গৌরসেবা কি ত্যাগ করিব?'—এরূপ বহু অমূল্য সম্পদ গ্রন্থের মাধ্যমে শ্রীল আচার্যদেব রেখে গেছেন ভজনেচ্ছু সাধক জীবের জন্য। এই সব বাণী—সাক্ষাৎ ভজনজীবনের অমূল্য রত্নরাজি স্বরূপ। শ্রীল আচার্যদেব আজও গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের সংশোধন করে একজন্মে শ্রীকৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে নিয়ে যেতে চাইছেন। সাধক জীবের ভজন পথে এই বাণী অদম্য উৎসাহ, নব নব প্রেরণা, নতুন আলোর পথ দেখাবে। এই অমূল্য বাণীই আমাদের ব্রজাভিযানের একমাত্র অবলম্বন।

গঙ্গাজলে যেমন গঙ্গাপূজা হয় তেমনি শ্রীল আচার্যদেবের বাণীর আলোকে তাঁরই কিঞ্চিৎ সুখবিধান করার ক্ষুদ্র চেষ্টা করা হয়েছে। সাধক জীব এই গ্রন্থের যথার্থ সার গ্রহণ করলে তাঁদের ভজনজীবন পুষ্ট হবে।

এই গ্রন্থ মুদ্রণ কার্য্যে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে আমার একান্ত স্নেহভাজন শ্রীমান শ্যামানন্দ দাস ও শ্রীমান মদনমোহন দাস (বড়)। প্রুফ সংশোধন করেছেন শ্রীমান্ ব্রজদুলাল দাস, শ্রীমান্ সুধীর কৃষ্ণ দাস, শ্রীমতী কৃষ্ণা দাসী, শ্রীমতী রঞ্জনী দাসী ও শ্রীমতী অর্পিতা দাসী। শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তীর আবির্ভাব বাসরে তাঁদের ভজনজীবন উত্তরোত্তর উন্নতি হোক এই প্রার্থনা করি।

অবশেষে সুধীপাঠকবৃন্দের শ্রীচরণে প্রার্থনা তাঁরা যেন গ্রন্থের মুদ্রণ জনিত ত্রুটি বিচ্যুতির দিকে গুরুত্ব না দিয়ে গ্রন্থের সারনির্যাস গ্রহণ করেন। সর্বোপরি এই গ্রন্থ প্রকাশে যদি শ্রীশ্রীল আচার্যদেব ও রূপানুগগুরুবর্গগণের ও শ্রীশ্রীগৌরগদাধর শ্রীরাধাগোবিন্দের কিঞ্চিৎ সুখ হয় তাহলে আমাদের সকল শ্রম সার্থক হবে ও আমাদের জীবন ধন্যাতিধন্য হবে।

নিবেদন

ইতি—

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের রেণু প্রার্থী

শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী

শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জ
শ্রীগৌরজয়ন্তী বাসর
৫ই মার্চ : মঙ্গলবার
১৯৯৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় প্রবন্ধ-মালা

॥ সূচীপত্র ॥

সূচীপত্র

—০—

সর্ব্বধাম শিরোমণি সন্ধিনীবিলাস। ষোল ক্রোশ নবদ্বীপ চিদানন্দবাস॥
সর্ব্বতীর্থ দেব-ঋষি-শ্রুতির বিশ্রাম। স্ফুরুক্ নয়নে মম নবদ্বীপ-ধাম॥

* * * *

কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত-কৃপা যোগ্যতা কারণ। জীবে দয়া সাধু সঙ্গে লভে ভক্তজন॥
জ্ঞান-কর্ম্মযোগে সেই যোগ্যতা না হয়। শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয়॥
জড় জাল জীবেন্দ্রিয়ে ছাড়ে যেই ক্ষণ। জীবচক্ষু করে ধাম-শোভা দরশন॥
আহা কবে সে অবস্থা হইবে আমারে। দেখিব শ্রীনবদ্বীপ জড়মায়া পারে॥
অষ্টদলপদ্মনিভ ধাম নিরমল। কোটি চন্দ্র জ্যোৎস্না জিনি অতীব শীতল॥
কোটি সূর্য্যপ্রভা জিনি অতি তেজোময়। আমার নয়ন-পথে হইবে উদয়॥
অষ্টদ্বীপ অষ্টদল মধ্যে দ্বীপবর। অন্তর্দ্বীপ নাম তার অতীব সুন্দর॥
তার মধ্য-ভাগে যোগপীঠ মায়াপুর। দেখিয়া আনন্দলাভ করিব প্রচুর॥
ব্রহ্মপুর বলি শ্রুতিগণ যাকে গায়। মায়ামুক্ত চক্ষে আহা মায়াপুর ভায়॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল নাম মহাবন। যথা নিত্যলীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শুদ্ধিপত্র

পাতা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	২	যব	যব
৩৯	৩	পরয়	পুরয়
৬৬	৫	শ্রীযুর্ত্তির	শ্রীমূর্ত্তির
৭০	৮	শ্রেষ্ঠশ্চতুষ্পাযগুতো	শ্রেষ্ঠশ্চতুষ্পাদস্ততো
১০৫	২১	অভিসিবিষ্ট	অভিনিবিষ্ট
১২৭	২১	হে	যে
১৬০	২	শ্রীরঙ্গপুরী	শ্রীরঙ্গপুরী
১৭৮	১৬	শ্রীল প্রতুপাদ	শ্রীল প্রভুপাদ
২৩৩	৬	অদ্বয়ভাবে	অন্বয়ভাবে
২৪২	১৯	অবিষ্ট	অরিষ্ট
২৪৬	১০	আব্রহ্মস্তস্ত	আব্রহ্মস্তম্ব
২৭০	৭	মহাপ্রভুর, নিজ-জন-গণের	মহাপ্রভুর নিজজনগণের
৩০১	২	বিদ্বেযফলে	বিদ্বেষফলে

—:০:—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় প্রবন্ধ-মালা

সিদ্ধি হইতেছে না কেন ?

আমাদের অনেক সময় প্রশ্ন হয়--আমরা সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে উপনীত হইয়াও, এমন কি, কেহ কেহ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও সিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেছি না কেন? আবার কেহ কেহ কটাক্ষের সহিত প্রশ্ন করেন, "মহাপ্রভু ও আচার্য্যগণের অনুগ ও শিষ্যমণ্ডলীর অনেকের মধ্যেই অষ্টসাত্ত্বিকভাব-বিকার প্রভৃতি সিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশিত হইত; কিন্তু আপনাদের মধ্যে সেরূপ একটি আদর্শও দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?" ঐরূপ কোন আদর্শ দেখিতে না পাইয়া আবার আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলেন যে, "প্রাকৃতসহজিয়া ও সখীভেকী-সম্প্রদায়ের অনেকের মধ্যে মহাপ্রভুর ভক্তগণের ন্যায়, এমন কি, মহাপ্রভুর ন্যায় (!) ভাববিকারাদি দৃষ্ট হয়; অতএব তাঁহারাই ভজনে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, গৌড়ীয়মঠের লোকেরা সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই! অথবা তাঁহারা সিদ্ধির প্রণালীই অনুসরণ করেন নাই!" যাঁহারা বহিরঙ্গ লোক, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও গৌড়ীয়-মঠের কথায় শ্রদ্ধা-প্রকাশের অভিনয়কারী কাহারও কাহারও

মনোভাব হয়ত' এরূপ হইতে পারে যে, 'যখন কাহারও মধ্যে ঐরূপ সিদ্ধির লক্ষণসমূহ (?) দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন ইঁহাদের ভজন প্রণালীতেই বোধ হয় কোন গলদ আছে!' এ সকল কথা কেহ চুপি চুপি বলেন, কেহ বা মনে মনে বলেন, আবার কেহ অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিয়া ফেলেন বলিয়া অনেকের শুনিবারও সুযোগ হয়।

উপরের সংশয়, প্রশ্ন বা কটাক্ষের মীমাংসা, উত্তর বা প্রাকৃত তথ্য প্রদান করিতে হইলে, 'সিদ্ধি' কি জিনিষ, তাহার আলোচনা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় বা অন্যান্য আচার্য্যের সময় অনেকেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ; কিন্তু আমরা সিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেছি না— এই আশঙ্কার মূল কোথায় ? 'আমরা ঠিক আছি, উপদেষ্টা ঠিক নাই'—ইহাই কি ঐরূপ সমালোচনার জনক ? অথবা 'উপদেষ্টা ঠিক আছেন, তাঁহার নিকট কতকগুলি ভণ্ড জুটিয়াছেন (অবশ্য আমি ভণ্ডের দল থেকে পৃথক্ আছি !)'— এইরূপ বিচারই কি উক্ত কটাক্ষের আকর-স্থান ? অথবা 'সিদ্ধি-ব্যাপারটি আমি বা আমার সমজাতীয় দল (সিদ্ধ না হইয়াও! অথবা 'স্বয়ং সিদ্ধ' বলিয়া মনে করিয়া) বুঝিয়া ফেলিয়াছি,' এরূপ অভিমানই কি ঐ সমালোচনার কারণ ?

যাঁহারা ভিন্ন তন্ত্রের লোক, তাঁহাদের যুক্তি অনেক সময়ই উপরিউক্ত তিনটি শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া পড়ে ; এমন কি, তাঁহারা স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধেও বলিয়া থাকেন যে. "চৈতন্যদেবের নিকট যে-সকল লোক জুটিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই সরল-

বিশ্বাসী ছিলেন ; কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁহাদিগের সেই সরলতার সুযোগ লইয়া অনুগমণ্ডলীকে ভ্রান্তপথে চালিত করিয়াছিলেন এবং তাহাতে অনুগমণ্ডলীও যেন কি এক যাদুমন্ত্রে বশীভূত হইয়া ঐ ভ্রান্তপথ-প্রদর্শকের (?) ধামাধরা হইয়া পড়িয়াছিলেন।" আবার কেহ কেহ, দয়া করিয়া এমনও বলিয়া থাকেন যে, "শ্রীচৈতন্যদেব ভাল লোক ছিলেন এবং তিনি লোকের মঙ্গল করিতেই চাহিতেন ; কিন্তু তাঁহার যে-সকল সঙ্গী জুটিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে বিকৃতভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন ও চৈতন্যের অভীপ্সিত প্রকৃত বিচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন!" আবার কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগমণ্ডলীর সিদ্ধির ধারণাকেও 'সিদ্ধি বলিয়া গ্রহণ করিতে নারাজ! যেমন, প্রেমানন্দের নিকট ব্রহ্মানন্দ গোষ্পদতুল্য কৈবল্যসিদ্ধি নরক সদৃশ, মুক্তিকামনা পিশাচী বা তথাকথিত নির্ব্বিকল্প সমাধিরূপ নির্ব্বিশেষভাবাশ্রয়ে আত্মহত্যা-নাম্নী সিদ্ধি গো-বিপ্রঘাতী অসুরগণেরও লভ্য, যোগসিদ্ধি যক্ষের বা অজগরের গ্রাসে গ্রস্ত হওয়ার ন্যায় অবস্থা-বিশেষ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্তসমূহকে একশ্রেণীর ব্যক্তি সিদ্ধির সম্বন্ধে প্রকৃত বিচার বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ; আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি 'উহা শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত নহে, শ্রীচৈতন্যের ভ্রান্ত (?) শিষ্যগণের ধর্ম্মোন্মত্ততা' প্রভৃতি বলিতে প্রস্তুত!

আমরা উপরিউক্ত তিন শ্রেণীর বিচার লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করিব। প্রথমতঃ সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে উপদেষ্টা, উপদেশ ও উপদেশ-গ্রহণকারী,—এই তিনটি বস্তুরই অকৃত্রিমতা

ও সুনির্ম্মলতা থাকা আবশ্যক। উপদেষ্টা যদি নিত্যসিদ্ধ না হন, তাহা হইলে তাঁহার উপদেশে নিত্যসিদ্ধসিদ্ধির সন্দেশ পাওয়া যাইবে না। আর উপদেশ-গ্রহণকারী যদি অকৃত্রিম ও একান্ত শুশ্রূষু না হন, তাহা হইলেও নিত্যসিদ্ধির উপদেশ তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না।

'সিদ্ধি' জিনিষটি কি? আর সিদ্ধি-সম্বন্ধেই বা মতভেদ কেন? —এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে শেষের প্রশ্নের উত্তরটি আগে দিতে হয়। অসিদ্ধ ব্যক্তিগণ সিদ্ধির যে কল্পনা করেন, তাহা হইতেই মতবাদ ও মতভেদের উদ্ভব হয়। আর নিত্যসিদ্ধ অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ যে নিত্যসিদ্ধ সিদ্ধির বার্ত্তা নিত্যসিদ্ধ-গণের ধারায় প্রকাশিত করেন, তাহাতে কোন মতভেদ বা মতবাদ নাই,—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

কৃষ্ণপ্রেম অর্থাৎ নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় স্বরাট্‌লীলাপুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য মূল আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সর্ব্বতোমুখী স্বাভাবিকী উৎকণ্ঠা এবং সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ সেবা করিয়াও 'আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহের কিছুই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে পারিলাম না,'— আত্মবৃত্তির এইরূপ সেবোন্মুখতাই চরম সিদ্ধি— যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে দৃষ্ট হয়,—

"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।

বংশীবিলাস্যানন-লোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥”

“দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ,
সেহ মোর কৃষ্ণে নাহি পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন,
করি, ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
যাতে বংশীধ্বনি সুখ, না দেখি’ সে চাঁদ মুখ,
যদ্যপি নাহিক ‘আলম্বন’।
নিজ-দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণ-কীটেরে করিয়ে ধারণ ॥”

(চৈঃ চঃ মঃ ২।৪৫-৪৭)

কি প্রণালীতে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সরল ভাষায় আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

“অন্য-অভিলাষ ছাড়ি’ জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি’
কায়-মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ভক্তি-পরম-কারণ ॥
মহাজনের যেই পথ, তা’তে হ’ব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন-স্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা,
কায়-মনে করিয়া সুসার ॥

অসৎসঙ্গ-সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য গীতরাগ,
কর্ম্মী, জ্ঞানী পরিহরি' দূরে।
কেবল ভকত-সঙ্গ, প্রেম-কথা-রসরঙ্গ,
লীলাকথা ব্রজরসপুরে॥
যোগি-ন্যাসি-কর্ম্মি-জ্ঞানী, অন্যদেব পূজক-ধ্যানী,
ইহ-লোক দূরে পরিহরি'।
কর্ম্ম, ধর্ম্ম, দুঃখ, শোক' যেবা থাকে অন্য যোগ
ছাড়ি' ভজ গিরিবরধারী॥
তীর্থযাত্রা-পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।
দৃঢ়বিশ্বাস হৃদে ধরি' মদ-মাৎসর্য্য পরিহরি
সদা কর অনন্যভজন॥
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি' কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ হেরি'
শ্রদ্ধান্বিতে শ্রবণ কীর্ত্তন।
অর্চ্চন, বন্দন, ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান,
এই ভক্তি-পরম-কারণ॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আরও স্পষ্ট করিয়া 'সিদ্ধিলালসা'য় সিদ্ধি-লাভের প্রণালী জ্ঞাপন করিয়াছেন—

"দেখিতে দেখিতে, ভুলিব বা কবে,
নিজ স্থূল পরিচয়।
নয়নে হেরিব, ব্রজপুরশোভা
নিত্য চিদানন্দময়॥

বৃষভানুপুরে, জনম লইব,
যাবটে বিবাহ হবে।
ব্রজগোপী-ভাব, হইবে স্বভাব,
আন ভাব না রহিবে ॥
নিজ সিদ্ধদেহ, নিজ সিদ্ধনাম,
নিজরূপ, স্ববসন।
রাধাকৃপা-বলে, লভিব বা কবে,
কৃষ্ণপ্রেম-প্রকরণ ॥

* * *

স্বারসিকী সিদ্ধি ব্রজগোপী ধন,
পরমচঞ্চল সতী।
যোগীর ধেয়ান নির্বিশেষ জ্ঞান
না পায় এখানে স্থিতি ॥

* * *

বৃষভানুসুতা- চরণ সেবনে,
হইব যে পাল্যদাসী।
শ্রীরাধার সুখ, সতত সাধনে,
রহিব আমি প্রয়াসী ॥
শ্রীরাধার সুখে কৃষ্ণের যে সুখ
জানিব মনেতে আমি।
রাধাপদ ছাড়ি, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে
কভু না হইব কামী ॥

সখীগণ মম, পরম সুহৃদ্,
যুগল প্রেমের গুরু।
তদনুগ হ'য়ে সেবিব রাধার
চরণ-কলপ-তরু।।"

সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে কিরূপ আত্মসমর্পণ প্রয়োজন, তাহাও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় আমরা জানিতে পাই—

"আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজ রক্ষা বিধান।।
তুয়া ধন জানি তুঁহু রাখবি নাথ।
পাল্য গোধন জানি করি তুয়া সাথ।।
চরাওবি মাধব যমুনাতীরে।
বংশী বাজাওত ডাকবি ধীরে।।
অঘ বক মারত রক্ষা বিধান।
করবি সদা তুঁহু গোকুল কান।।
রক্ষা করবি তুঁহু নিশ্চয় জানি।
পান করবুঁ হাম্ যামুনপানি।।
কালীয় দোষ করবি বিনাশা।
শোধবি নদীজল বাড়াওবি আশা।।
পিয়ত দাবানল রাখবি মোয়।
গোপাল গোবিন্দ নাম তব হোয়।।
সুরপতি-দুর্ম্মতি নাশ বিচারি।
রাখবি বর্ষণে গিরিবরধারি।।

চতুরানন করব যব চোরি।
রক্ষা করবি মোএ গোকুল হরি ॥
ভকতিবিনোদ তুয়া গোকুল ধন।
রাখবি কেশব করত যতন ॥"

(শরণাগতি—২৩ সং)

এই সেবা-সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে আত্মসমর্পণকারীর স্বরূপটি কিরূপভাবে প্রকাশিত হয়, তাহাও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন—

"ছোড়ত পুরুষ অভিমান।
কিঙ্করী হইলুঁ আজি কান ॥
বরজ বিপিনে সখীসাথ।
সেবন করবুঁ রাধানাথ ॥"

উপরে উদ্ধৃত মহাজন-পদাবলী আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, যাবতীয় অন্যাভিলাষ কর্ম্মজ্ঞানাদির প্রতি অনুরাগ ও যাবতীয় অসৎসঙ্গে আসক্তি ও তজ্জনিত পুরুষাভিমান অর্থাৎ ভোক্তৃবুদ্ধি সেবাবিগ্রহে সর্ব্বাত্মসমর্পণ-ফলে বিদূরিত হইলে যে অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত আশ্রয়বিগ্রহের কৈঙ্কর্য্য করিবার জন্য নির্ম্মল চেতনবৃত্তির স্পৃহা উদিত হয়, তাহাই সিদ্ধিলালসা এবং সেই লালসা অত্যন্ত ঘনীভূত হইলে যে নিত্যবর্দ্ধমানা সেবা-লালসার অফুরন্ত প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দেয়—তাহাই সিদ্ধি। সেই সিদ্ধিতে আশ্রয়বিগ্রহের সুখোৎপাদনে বিষয়বিগ্রহের যে সুখোৎপাদনের জন্য সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা আছে, ইহাই সিদ্ধির

রহস্য। আশ্রয়ের সুখে বিষয়ের যে সুখ, তাহাতে অভিনিবিষ্ট না হইয়া বিষয়ের সহিত আত্মসুখের যে কামনা, তাহাই 'সম্ভোগ'বাদ বা সিদ্ধির বিপরীত কথা। এখানেই 'সিদ্ধ' ও 'বদ্ধ', 'ভক্ত' 'অভক্ত'কে চিনিতে পারা যায়। বদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন—"ভগবানের সঙ্গে যখন আমার প্রয়োজন, তখন ভগবান্‌কে আমি নিজে দেখিয়া লইব। সোজাসুজি ভগবানের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হইবে।" কিন্তু সিদ্ধব্যক্তির কথা এই যে, "ভগবানের শ্রেষ্ঠ ও প্রেষ্ঠ সেবকের সুখোৎপাদনে ভগবানের যে সুখ, তাহারই আমি আরাধনা করিব। আর সেই প্রেষ্ঠসেবকের সেবার যাঁহারা সহায়ক, তাঁহারাই আমার পরমসুহৃদ্, বিষয় ও আশ্রয়ের সেবা-শিক্ষার গুরু ; আমি তাঁহাদের অনুগত হইয়াই মূল আশ্রয়বিগ্রহের সেবা করিব।"

আমরা কেহ কেহ 'সিদ্ধি পাইলাম না' বলিয়া অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছি! এই অসহিষ্ণুতা কিন্তু সিদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য অকপট আর্ত্তি নহে। "আমি বা আমরা ঠিকই আছি, সিদ্ধিদাতারই বোধ হয় কিছু কৃপণতা বা অসামর্থ্য আছে"—এই ভাবিয়াই আমরা অসহিষ্ণু এবং সিদ্ধিলালসার পরিবর্ত্তে সম্ভোগলালসায় প্রমত্ত! সিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেছি না কেন, ইহা অনুধাবন করিতে গিয়া নিজের দোষানুসন্ধানের পরিবর্ত্তে, আত্মসংশোধন করিবার পরিবর্ত্তে, নিজের দুষ্ট মন, দুষ্টস্বভাবকে শত শত সম্মার্জ্জনীর প্রহারের দ্বারা শাসন ও মার্জ্জন করিবার পরিবর্ত্তে, অপরের ছিদ্রানুসন্ধান, এমন কি, গুরু-বৈষ্ণবকে শাসন ও শোধন করিতে উদ্যত

হইয়াছি !! একবারও ভাবিয়া দেখিতেছি না, 'আমি কি সত্য-সত্যই সকল অন্যাভিলাষ সর্ব্বভাবে পরিত্যাগ করিয়াছি ? কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-স্পৃহার আবরণ হইতে কি আমার অন্তর অনাবৃত হইয়াছে ? লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাকে, কনক-কামিনী চিন্তার দুঃসঙ্গকে কি বর্জ্জন করিতে পারিয়াছি ? কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা বাঘিনী কি প্রতিমুহূর্ত্তে আমার রক্ত শোষণ করিতেছে না ? আমি কি 'ভাবের ঘরে চুরি' করিবার জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত অভ্যাস হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি ? আমার কি পুরুষাভিমান-বর্জ্জনের জন্য আত্যন্তিক উৎকণ্ঠার উদয় হইয়াছে এবং তজ্জন্য হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়াছে ? আমি কি আত্মসমর্পণের জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়াছি ? আমার কি নিজ-সুখতৎপরতা অপেক্ষা অকৃত্রিম ও নিষ্কপটভাবে আশ্রয়বিগ্রহের সুখে বিষয়বিগ্রহকে সুখী করিবার জন্য অদম্য পিপাসার উদয় হইয়াছে ? আমি কি আশ্রয়-বিগ্রহের অকপট সুখান্বেষণকারীদিগকে নির্ম্মৎসর হইয়া সুহৃদ্ ও আমার সেবাশিক্ষার গুরু বলিয়া ভাবিতে পারিয়াছি ? —না, মৎসরতায় জর্জ্জরিত হইয়া প্রাকৃত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার শোচনীয় কাঙ্গালের ন্যায় 'অমুকের কিছু অধিক বিষয় লাভ হইল, অমুকে কিছু প্রতিষ্ঠা পাইয়া উঁচু হইয়া গেল, আমার কিছু প্রতিষ্ঠার খর্ব্ব হইল'—এই সকল চিন্তাস্রোতে ধাবিত হইয়া আশ্রয়-বিগ্রহের সেবার এক-তাৎপর্য্যপরতা ও ঐকতানকে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও ভগ্ন করিয়া দিতেছি ? নিজের ছিদ্র অনুসন্ধান করিবার পরিবর্ত্তে অদোষদর্শী গুরুবৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধানের স্পৃহা ও তাহাতে সুখোপভোগরূপ

মৎসরতা নির্ম্মৎসর সাধুগণের লভ্য ভাগবতী সিদ্ধিকে আমা হইতে অনেক দূরে সংরক্ষণ করিয়াছে ! আমি রাবণ হইয়া সিদ্ধিলক্ষ্মীকে হরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করি ! কায়মনোবাক্যে ত্রিদণ্ড গ্রহণ না করিলে সিদ্ধিশ্রীর সাক্ষাৎকার হয় না। রাবণের ন্যায় যাত্রার দলের ত্রিদণ্ডি-যতি সাজিলে বা পরমহংসের সজ্জা গ্রহণ করিলে কিংবা ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থের বেষোপজীবী হইলে সিদ্ধিশ্রীর সাক্ষাৎকারই হয় না, স্পর্শ ত দূরের কথা !

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় স্বয়ং ভগবান যে সকল নিত্য-সিদ্ধ-পার্ষদ লইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের কেন অনুকরণকারী বা তাঁহাদের মত একজনও কেন এই যুগে হইতেছেন না—এইরূপ ছিদ্রানুসন্ধান-স্পৃহা আত্মমঙ্গলের জন্য-চিন্তার অভাব ও অসিদ্ধির পরিচায়ক। আত্মমঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধ-ব্যক্তি – "সবে কৃষ্ণভজন করে এইমাত্র জানে" ; আর সিদ্ধির পথের যাত্রী মধ্যমাধিকারী বিচার করেন,— "ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অপ্রকটলীলার আবিষ্কার-কালে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ নিজজনকে আচার্য্যরূপে জগতে প্রেরণ করিয়া যখন লোক-মঙ্গলের ব্যবস্থা করেন, তখন আচার্য্য ভবব্যাধির চিকিৎসা-সদন উন্মোচন করিয়া নানাপ্রকার ভবব্যাধিগ্রস্ত লোককে তথায় স্থান প্রদান করেন। চিকিৎসা-সদনের বিভিন্ন রোগীর বিভিন্নপ্রকার রোগ ও অধিকার থাকে। সেই এক অদ্বিতীয় সদ্বৈদ্য মূল আচার্য্যের আনুগত্যে অন্যান্য সহকারী চিকিৎসকগণ তাঁহাদের অধিকারানুযায়ী সেই চিকিৎসাসদনের সেবক হইতে

পারেন অর্থাৎ মধ্যমাধিকারীগণ চিকিৎসাসদনের মধ্যে চিকিৎসিত হইবার সময়ও মূল আচার্য্যের আনুগত্যে তন্নিম্নাধিকারীর কিছু কিছু উপকার করিতে পারেন। প্রাকৃত বা কনিষ্ঠাধিকারী ভবব্যাধিগ্রস্ত জীবের চিকিৎসা বা জীবে দয়া করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহারা চিকিৎসাসদনের কিছু কিছু স্থূল বা বহিরঙ্গ সাহায্য করিতে করিতে ও মধ্যমাধিকারীর হরিকথৌষধ শ্রুতিমূলে পান করিতে করিতে মধ্যমাধিকারে উপনীত হইলে জীবে দয়া করিবার যোগ্যতা লাভ করেন।” অতএব কনিষ্ঠাধিকারী যদি তাঁহার সিদ্ধির কল্পিত ধারণা লইয়া 'সিদ্ধ' খুঁজিয়া না পান, কিংবা গুরুকৃপায় মধ্যমাধিকারের অর্থাৎ বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব-বিচারের একটু সামান্য আমেজ পাইয়াই সিদ্ধ ও সিদ্ধিকে মাপিয়া লইতে চাহেন কিংবা চিকিৎসাসদনে সকলকেই সমজাতীয় সিদ্ধ দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার বিচারের গোড়ায়ই গলদ রহিয়াছে, জানিতে হইবে। চিকিৎসা-সদনে অন্ততঃ একটিও সম্পূর্ণ রোগমুক্ত বা সিদ্ধ কি দেখিতে পাওয়া যাইবে না? মধ্যমাধিকারীর অভিনয়কারী ছিদ্রানুসন্ধিৎসু প্রাকৃতব্যক্তির এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়—“সিদ্ধি ও সিদ্ধ বলিতে তোমার ধারণা কি? সিদ্ধব্যক্তির কি দশমুণ্ড, বিশহাত গজাইবে, অথবা সে একহাত শূন্যে উঠিতে পারিবে? সিদ্ধিদাতা গণেশের মন্ত্রের উপাসকগণ সিদ্ধির ঐ সকল লক্ষণ দেখিতে চাহিতে পারেন! কিন্তু ভাগবতী সিদ্ধির লক্ষণ পুরুষাভিমান হইতে মুক্তি ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য অতৃপ্ত নিরন্তর লালসা। কৃষ্ণকাম কামনাই 'সিদ্ধি'।”

"ঈহা যস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।"

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৮৩)

আশ্রয়-বিষয়ের সুখে বিষয়-বিগ্রহের সুখের জন্য সর্ব্বতোমুখী স্বাভাবিকী ও অহৈতুকী যে চিত্তবৃত্তি, তাহাই ভাগবতী সিদ্ধি—সেই সিদ্ধি অনন্ত প্রগতিশালিনী। সেই সিদ্ধি যতটা আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয়বিগ্রহের সেবাসুখপথে অভিসার করিতেছে, ততটাই সিদ্ধি বলিয়া আদরণীয়া। আচার্য্যের মনোঽভীষ্ট-পরি-পূরণ-সেবায় অবিক্ষেপের সহিত সতত বা নিরন্তর নিমগ্ন থাকিলে তদনুগ নিষ্কপট সেবকবৃন্দে এই সিদ্ধিশ্রী এখনও সেবোন্মুখচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। তবে ভাগবতীয় সিদ্ধিসূর্য্যরশ্মি উলূকের চক্ষে অসহনীয় হইয়া মাৎসর্য্যের উদয় করায়, তাই সেই মৎসরতা সিদ্ধি-শোভা-দর্শনের পথে কণ্টক হইয়া থাকে।

সিদ্ধি বা সিদ্ধ যে খুব বহু পরিমাণে দেখা যাইবে, তাহা আশা করাও সিদ্ধবিজ্ঞানে অনভিজ্ঞতা; কারণ ভগবানের ও ভাগবতের বাণীতে শুনিতে পাই—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

—(গীঃ ৭।৩)

"সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥"

— (ভাঃ ৬।১৪।৫)

নিত্যসিদ্ধ গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল

জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি মহাপুরুষ-গণ খেদের সহিত অনেক সময়ই বলিতেন যে, বহুলোক তাঁহাদের নিকট আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা একটি মানুষও পাইলেন না। অনেকেই তাঁহাদের নিকট আসিয়া বাহ্যদর্শনে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ-সিদ্ধির অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। সম্ভোগবাদকেই সকলে 'সিদ্ধি' মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছেন। কেহই বিপ্রলম্ভবিগ্রহের সেবায় সিদ্ধি লাভ করিতে চাহেন নাই। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট পুনঃপুনঃ এই কথাই শ্রবণ করিতেছি— আমরা ভোগ্য, ভোক্তা নহি ; ভোক্তা এক অদ্বিতীয় স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম। তাঁহার ভোগ্য বা সেই অপ্রাকৃত কামদেবের কামবর্দ্ধন-যজ্ঞের ইন্ধনরূপে প্রকাশিত হওয়াই আমাদের 'স্বরূপসিদ্ধি'। আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই বাণী এই মুহূর্ত্তেই কায়মনোবাক্যে অনুসরণ করি, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই আমাদের নিত্যসিদ্ধসিদ্ধি আত্মপ্রকাশ করিবে—ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা তাহা কায়মনোবাক্যে অনুসরণ ও প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি কি? না ; গ্রাম্য-কবির ভাষায় বলিতে গেলে আমাদের অবস্থা হইয়াছে—

"মারো আর ধরো, পিঠ ক'রেছি কুলো।
বকো আর ঝকো, কানে দিয়েছি তুলো॥"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তু-সিদ্ধির এইরূপ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন,—সাধকের যখন রাগা-নুগমার্গে লোভ হয়, তখন সদ্গুরুর নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি

সাধকের রুচি পরীক্ষা করিয়া তাঁহার ভজননির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধদেহের পরিচয় করিয়া দিবেন। সেই পরিচয়মতে প্রাত্যহিক সাধক অর্থাৎ প্রেমারুরুক্ষু ব্যক্তি গুরুকুলে বাস করতঃ সমস্ত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত স্বস্থানে স্থিত করিয়া ভজন করিতে থাকিবেন। গুরুদত্ত নিজ নামরূপাদি স্মরণ করিতে করিতে শীঘ্রই তাহাতে অভিমানযুক্ত হইবেন। এই অভিমানই—আত্মজ্ঞান এবং ইহাকেই 'স্বরূপসিদ্ধি' বলে। * * ভক্তিলতা যখন বিরজা পার হইয়া ব্রহ্মলোক ভেদ করত পরব্যোমের উপরিভাগে গোলোকবৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে আরোহণ করেন, তখন সেই লতা অবলম্বন করিয়া সাধক মালীও অপ্রাকৃত ধাম প্রাপ্ত হন। এই স্বরূপসিদ্ধিকে কোন কোন ভক্ত-লেখক সাধকের সাধন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই 'গোপগৃহে ব্রজে জন্ম গ্রহণ করা' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; * * ইহাই ভক্তবৈষ্ণবের বস্তুসিদ্ধির পূর্ব্বে দ্বিজত্বলাভ বলিয়া জানিতে হইবে। ভক্তের গোপীদেহ-প্রাপ্তিই—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধদ্বিজত্বপ্রাপ্তি বা 'আপনদশা'। যখন সেই অবস্থায় গুণময় দেহ বিগত হয়, তখনই সাধকের স্বরূপ-সিদ্ধি হইতে বস্তুসিদ্ধি হয়। কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা-স্মৃতির বিকাশেই নিত্য-বৃন্দাবন লাভ হয়।"

স্বরূপসিদ্ধি কৃত্রিম উপায়ে লাভ হয় না, নিষ্কপট সেবোন্মুখতা ও আশ্রয়-বিগ্রহের কৃপায় নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের নিত্যসিদ্ধ সেবাবৃত্তি যখন প্রকাশিত হয়, তখনই উহাকে সিদ্ধি বলে। সিদ্ধিতে সেবা-লালসা অধিকতর উৎকণ্ঠাময়ী ও অতৃপ্তিময়ী হইয়া নবনবায়মান

চমৎকারিতা বিধান করে। যিনি সিদ্ধি লাভ করেন, তিনি তাঁহার সিদ্ধিধনকে লোকের নিকট দেখাইয়া বেড়ান না ; অথবা বিজ্ঞাপন দিয়া উহার প্রচারও করেন না। অতি সংগোপনে, কোন লোকে কোনপ্রকারে বুঝিতে না পারে, জানিতে না পারে—এইরূপভাবে তিনি সিদ্ধি-সম্পৎকে সুগোপ্য সম্পুটে সংরক্ষণ করিয়া অধিকতর সেবা-লালসায় প্রমত্ত থাকেন। সিদ্ধব্যক্তি কখনও বলেন না, 'আমি ভগবান্ দেখিয়াছি, আমি এক্ষণেই ভগবান্‌কে দেখাইতে পারি' ইত্যাদি। মনোধর্ম্মের ভগবান্‌কে দেখা বা না দেখা সিদ্ধির লক্ষণ নহে। সেবায় নৈরন্তর্য্য, রুচি, আসক্তি ও নবনবায়মান উৎসাহই সাধন-সিদ্ধের চরিত্রেও পূর্ব্ব হইতেই দৃষ্ট হয়। স্বরূপসিদ্ধ —কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, কৃষ্ণকীর্ত্তনজীবাতু ও বিপ্রলম্ভ-সেবারসে সতত মগ্ন। প্রকৃত সেবা-সিদ্ধিকামী কি করিয়া আশ্রয়-বিগ্রহের কৃপা লাভ করিবেন, এজন্যই সর্ব্বদা উদ্‌ভ্রান্ত। কেবল আমারই সেবালাভ হইল না, সকলেই কৃষ্ণভজন করিতেছেন, এই বিচার সর্ব্বক্ষণ তাঁহার আন্তরিকতাকে ভরপূর করিয়া রাখিয়াছে। আর যে ব্যক্তি নিজে প্রকৃত সেবা-সিদ্ধির জন্য আন্তরিক আর্ত্তিবিশিষ্ট নহেন, অথবা ফাঁকতালে সিদ্ধ হইয়া যাইতে চাহেন, সেরূপ ব্যক্তিই 'অপরের সিদ্ধি হইতেছে না, আমি খুব বুঝ্‌দার'— এইরূপ ভোগময় বিচারে ধাবিত। অশ্রু পুলকাদি—সিদ্ধির বাহ্য বা তটস্থ লক্ষণ, তাহা শিক্ষাষ্টকের "নয়নং গলদশ্রুধারয়া" শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। আর সিদ্ধির আন্তর-লক্ষণ শিক্ষাষ্টকের সপ্তম শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥
উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ'-সম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন॥
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন॥
(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৩৯-৪১)

এই সিদ্ধিতে বা সাধ্য ভক্তিতে পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তি কৃষ্ণসেবার জন্যই উদ্‌গ্রীব, কৃষ্ণ-সম্ভোগের জন্য উদ্‌গ্রীব নহেন। তাহা শিক্ষাষ্টকের ৮ম শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"আমি ত' তোমার তুমি ত' আমার
কি কাজ অপর ধনে॥"

—ঃ০ঃ—

অশ্রুর মূল্য

সাধন ও সিদ্ধি—উভয় অবস্থাতেই অকপট অশ্রুর মূল্য অনির্ব্বচনীয়। অত্যন্ত অযোগ্য ব্যক্তিরও হৃদয়গুহা হইতে উৎসারিত অশ্রুগঙ্গার একটি কণা শ্রীহরির যেরূপ প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে, এরূপ আর কিছুই পারে না। শত শত সাধন, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, স্বাধ্যায়, সদাচার, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদিপালন, তীর্থভ্রমণ, এমন কি নববিধা ভক্তিযাজনের অভিনয় করিয়াও হৃদয়-বিগলিত একবিন্দু অকপট-অশ্রুর অভাবে করুণাবারিধি শ্রীহরির কৃপা ও প্রীতি আকৃষ্ট হয় না। (যাঁহার অন্ততঃ প্রত্যহ একবারও নিজের অযোগ্যতা অনুভব করিয়া শ্রীহরির কৃপা ও সুখানুসন্ধানের জন্য একবিন্দু অশ্রু নির্গত না হয়, তাঁহার হৃদয়ে নিশ্চয়ই জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত দুরন্ত অপরাধের বজ্রলেপ আছে।) চোখের জল ও চিন্তা অর্থাৎ 'আমার কিছুই হইল না'—হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে এই অনুভূতি—এই দুইটী প্রত্যহই প্রত্যেক সাধকের হৃদয়ে সমুদিত হওয়া চাই। কেহ হরিভজনে অকপটভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন কিনা, তাহার একমাত্র কষ্টিপাথর—অযোগ্যতার অনুভূতি হইতে উদিত একবিন্দু অকপট অশ্রু। যাঁহার অযোগ্যতার অনুভূতি নাই, শ্রীগুরুদেব ও শ্রীহরিদেবের সুখানুসন্ধানস্মৃতি নাই, তাঁহার চক্ষু হইতে কিছুতেই অশ্রু নির্গত হইবে না। হয়ত তিনি খুব নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া ম্লানমুখে অবস্থান করিতে পারেন, কিংবা

নিজের দুর্দ্দশা-দর্শনে শুভেচ্ছামাত্র পোষণ করিয়া দুই একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতে পারেন বা সাময়িক বিমর্ষভাব ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু হৃদয় অপরাধমুক্ত না হইলে কিছুতেই অকপট অশ্রুর উদ্‌গম হইবে না। যদিও অশ্রুপ্রকাশ প্রীতির সামান্য তটস্থ-লক্ষণমাত্র, তথাপি নিরপরাধ না হইলে কখনই অশ্রুর উদ্‌গম হইতে পারে না। স্বভাবপিচ্ছিল চক্ষু হইতে যে অশ্রু নির্গত হয়, তাহা ব্যাধিবিশেষ; সেরূপ অশ্রুর কথা হইতেছে না। শোক, ভয়, মোহ প্রভৃতিজাত অশ্রু অত্যন্ত জড়াভিনিবেশ এবং অপরাধের পরিচায়ক। দশবিধ নামাপরাধের একটী, কোনও কোনটী বা সবগুলি হৃদয়ে থাকিলে নিজের দেহসৌখ্যের অভাব বা দেহ-সম্বন্ধীয় তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনের জাগতিক অভাব-অসুবিধা প্রভৃতিতে কিংবা কোন জড়বস্তুর অপ্রাপ্তি বা বিনাশে যে অশ্রুর উদ্‌গম হয়, অথবা জড়-প্রতিষ্ঠালাভের আশায় যে কৃত্রিম অশ্রু মোচন, তাহা অপরাধেরই অভিব্যক্তি; উহাতে হৃদয়ে নিজের অযোগ্যতার অনুভূতি হয় না—শ্রীহরির সুখানুসন্ধানস্পৃহা থাকে না. বহির্ম্মুখ দেহমনের সুখানুসন্ধান এবং সুখের অপ্রাপ্তিজনিত খেদ ও অভাব-বোধরূপ মোহই প্রবল থাকে।

পরমকরুণ শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের নাম উচ্চারণ করিবামাত্র যদি হৃদয় বিগলিত হইয়া নয়নে অশ্রুগঙ্গার একটি কণিকাও প্রকাশিত না হয়, তবে নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে ইষ্টদেব ও আত্মা বলিয়া বরণ করা হয় নাই, কেবল কোন অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজন করিবার ছলনা

প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের নামের এমনই শক্তি যে—

"অদ্যাপিহ দেখ 'চৈতন্য'-নাম যেই লয়।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥
'নিত্যানন্দ' বলিতে হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয়।
আউলায় সকল অঙ্গ, অশ্রুগঙ্গা বয়॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৮।২২-২৩)

শ্রীকৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করেন, কিন্তু পরমকরুণ অত্যন্ত উদার শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-নাম কোন অপরাধ গ্রহণ করেন না। কেবল নিজের অযোগ্যতা বা অকপট অনুভূতির সহিত যিনি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের নাম করেন, তাঁহাকেই শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রেম প্রদান করেন; তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা নির্গত হয়। এই অযোগ্যতার অনুভূতিটুকু-পর্য্যন্ত যাহার নাই, সেইরূপ ব্যক্তি দুশ্চিকিৎস্য। এইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ-সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তা'রে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৮।৩১-৩২)

শ্রীকৃষ্ণের কৃপা যোগ্যতম ব্যক্তির উপর বর্ষিত হয়। পরম-মুক্ত ব্যক্তি, পরমসিদ্ধ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কম্পাশ্রু-

পুলকাদি সাত্ত্বিকবিকারে বিভূষিত হন। কিন্তু অযোগ্যতম ব্যক্তিও কেবলমাত্র অকপটে নিজ অযোগ্যতা অনুভব করিয়া সমগ্র সত্ত্বার দ্বারা নিজ-অযোগ্যতার কথা নিবেদন করিতে করিতে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সম্বোধনাত্মক নামকীর্ত্তন করিলে তাঁহার হৃদয়েও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের পরম ঔদার্য্যগুণ, পরমকারুণ্যগুণ ও তৎসঙ্গে নিজ অত্যন্ত অযোগ্যতার কথা যুগপৎ স্মৃতিপথে উদিত হইয়া অযোগ্য ব্যক্তির হৃদয়কে মথিত করিয়া দেয়; তখনই হৃদয়-বিক্রিয়ার লক্ষণস্বরূপ নয়ন সরোবর হইতে অশ্রুবিন্দু উদগত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মের আরতি করিয়া থাকে—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা-বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে॥
পতিতপাবন-হেতু তব অবতার।
মো-সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ-সুখী!
কৃপাবলোকন কর, আমি বড় দুঃখী।
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত-গোসাঞি!
তব কৃপা বলে পাই চৈতন্য-নিতাই॥
হা হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ!
ভট্টযুগ, শ্রীজীব, হা প্রভু লোকনাথ॥"

এইরূপে সপার্ষদ পরমকরুণ শ্রীগৌরহরির নিকট নিজ-অযোগ্যতা-জ্ঞাপনকালে যদি গোপনে অশ্রুবিন্দু বিগলিত না হয়, তবে নিশ্চয়ই হৃদয়ে দম্ভ অর্থাৎ কাপট্য আছে, অযোগ্যতার

অনুভব হয় নাই। কারণ, পরতত্ত্বের উপাসনার একমাত্র অমূল্য উপকরণ—অযোগ্যতার অনুভব হইতে জাত অশ্রুবিন্দু। ইষ্টদেবের পরম উদারতা ও সেবকের অযোগ্যতার অনুভব এবং তাঁহার সেবার একমাত্র উপকরণ অশ্রু—এই তিনটীর যেখানে সংযোগ, সেখানেই মহাবদান্য শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ বা ঔদার্য্যবিগ্রহ পরতত্ত্বের ভজন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয় এই ভজন-রহস্যটী তাঁহার প্রার্থনা-গীতির সর্ব্বপ্রথমেই অযোগ্য জীবের জন্য গান করিয়াছেন,—

> "গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক-শরীর।
> 'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয় "শ্রীগৌরাঙ্গ" নাম উচ্চারণমাত্র পুলকশরীরবিশিষ্ট হইবার আশাবন্ধের কথা দুরিত জীবকে জানাইয়াছেন; ইহার তাৎপর্য্য কি? জীব যখন নিজের অযোগ্যতমতা ও শ্রীগৌরহরির পরমোদারতা অনুভব করিতে পারে, **পরম-কারুণিকো ন ভবৎপরঃ, পরমশোচ্যতম ন চ মৎপরঃ"** (পদ্যাবলী, ৬৬),—এই অনুভব যখনই সুতীব্রভাবে হয়, তখনই শরীরে পুলক হইয়া থাকে, তখনই হৃদয় বিগলিত হয় এবং শ্রীগৌরহরির নামকীর্ত্তনে নয়ন হইতে অশ্রুধারা নির্গত হয়, এতৎপূর্ব্বে পুলকাশ্রুর উদ্গম হইতে পারে না।

পরমকরুণ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ দেখিলেন যে, কলিহত জীব জড়াভিমান, জড়াভিনিবেশ, জন্মজন্মান্তরের অপরাধপুঞ্জ হইতে মুক্ত হইবার পর যে হরিভজন করিবে, এরূপ আশা নাই। এজন্য

পরম উদার দুই ঠাকুর অত্যন্ত অযোগ্যের পক্ষেও যাহা উপলব্ধি করা একান্ত স্বাভাবিক, সেই অযোগ্যতার অনুভূতি ও তাহার অভীষ্টদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔদার্য্যগুণের স্মৃতিতে পুলক ও অশ্রুর উদ্গম হইতেই শিবদ নিঃশ্রেয়োলাভের পথ আবিষ্কার করিলেন ; অতএব অশ্রুবিন্দুই পরম-করুণ দুই ঠাকুরের শ্রীচরণার্চ্চনের অদ্বিতীয় অনবদ্য উপকরণ। নিতাইচাঁদ করুণা করিয়া আর্ত্ত বিষয়ীর বিষয় বা সংসার-বাসনা তুচ্ছ করিয়া দেন। নতুবা শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত বিমল ভজনে অত্যন্ত অযোগ্য জীবের কিছুতেই অধিকার লাভ হইতে পারে না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর "তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং" (শ্রীভা ২।৩।২৪) শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"যেষান্ত চিত্ত-দ্রবেঽপি সতি চিত্তস্যাশ্মসারতা তিষ্ঠেদেব, তে তু দুশ্চিকিৎস্যা এব জ্ঞেয়াঃ"—অর্থাৎ যাহাদের চিত্ত দ্রব হওয়া সত্ত্বেও চিত্তের কাঠিন্য থাকিয়াই যায়, তাহাদের আর মঙ্গলের আশা নাই।

চারিপ্রকার অপরাধীর চক্ষু হইতে অশ্রু বহির্গত হয় না—(১) বিষয়ী, (২) অবজ্ঞাকারী, (৩) অরুচিবিশিষ্ট ও (৪) বিদ্বেষী। কিন্তু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় সেই বিষয়ী অপরাধীও যদি "এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে। এক নিত্যানন্দ-বিনু জগৎ-ভিতরে ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৫।২০৭)—এই বলিয়া নিজের অযোগ্য-তার তীব্র অনুভবের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের শরণাগত হইয়া গোপনে অশ্রুমোচন করেন, তবে তাঁহারও বিষয়-বাসনা বিদূরিত হইতে পারে। অবজ্ঞাকারী ব্যক্তিও যদি নিজের অকিঞ্চিৎকরতা

ও অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া অশ্রুমোচন করেন, তৎপ্রতিও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপা হয়, তিনিও প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন। অরুচি-বিশিষ্ট ও বিদ্বেষী ব্যক্তিগণের হৃদয় অপরাধের অশ্মলেপ ও বজ্রলেপের দ্বারা এত কঠিন যে, তাহাতে কখনও অযোগ্যতার অনুভূতি হয় না। বিষয়ীর ধূলিলেপ বা অবজ্ঞাকারীর পঙ্কলেপ পর্য্যন্ত অযোগ্যতার অনুভূতিজাত অশ্রুদ্বারা বিধৌত হইতে পারে, কিন্তু অরুচিবিশিষ্ট ও বিদ্বেষীর কস্মিন্‌কালেও অযোগ্যতার অনুভূতি না হওয়ায় মহাকরুণ পরতত্ত্বের পূজার একমাত্র উপকরণ অশ্রুগঙ্গার একটী কণাও প্রকাশিত হয় না। এজন্য তাহারা মহাবদান্য বিগ্রহের করুণা হইতে বঞ্চিত হয়। যদি পরমকরুণ প্রভুদ্বয়ের অবিচিন্ত্য কৃপায় কখনও অবজ্ঞাকারী ও বিদ্বেষীর মঙ্গল হয়, তখন তাহাদের মঙ্গল অশ্রুবিন্দুর মধ্য দিয়াই লাভ হইবে, অর্থাৎ তাহাদের হৃদয় বিগলিত হইয়া নয়নদ্বারা অশ্রু নির্গত না হওয়া পর্য্যন্ত মঙ্গল-লাভ হইবে না।

শরণাগতি-বিগলিত হৃদয়-গঙ্গোত্রী হইতে অশ্রুবিন্দু বিনির্গত হইয়া নেত্রযুগলের দ্বারে উচ্ছলিত হয় এবং শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের পাদ্য রচনা করে। এই যে অযোগ্যতার অনুভূতি-রূপ চিন্তা বা আবেশময়ী স্মৃতি, তাহাই অশরণাগতকে শরণাগত করিয়া দেয়, জড়াভিমানীকে অজ্ঞাতসারে 'তৃণাদপি সুনীচ' অর্থাৎ পরম করুণ প্রভুদ্বয়ের পরিকরগণের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিরূপ অভিমানে অভিমানী করায়। এই অশ্রুবিন্দুর এইরূপ মূল্য যে, তাহা ব্রহ্মানন্দ ও পরমাত্মানন্দকেও ধিক্কার করিয়া সর্ব্বিশেষ

পরতত্ত্বের—লীলাপুরুষোত্তমের—অজিতের চিত্তকেও বিজিত ও বিগলিত করিয়া তাঁহার নেত্রের অশ্রু আকর্ষণ করে। অযোগ্যতার অনুভূতিজাত অশ্রুবিন্দু দর্শনে স্বয়ং অজিত ভগবান্ পর্য্যন্ত করুণা-বিগলিত হইয়া অশ্রুমোচন করেন। অবলার যেরূপ সংপতিকে বশীভূত করিবার একমাত্র অস্ত্র—অশ্রু, অসমর্থ শিশুর যেরূপ মাতাপিতার কারুণ্য উদ্রেক করিবার একমাত্র উপায়—ক্রন্দন, সেইরূপ অত্যন্ত অযোগ্যের অত্যন্ত-করুণকে আকর্ষণ করিবার একমাত্র অস্ত্র—অশ্রুকণা। এই জন্যই অশ্রুর এত মূল্য। অযোগ্যতার পূর্ণ অনুভূতি দূরের কথা, অকৈতবা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তির শান্তরতিযুক্ত যাজকও শ্রীহরির অশ্রু আকর্ষণ করিতে পারেন, আর যাঁহারা পূর্ণ শরণাগত হইয়া অশ্রু-অর্ঘ্যের দ্বারা ইষ্টদেবের নিরন্তর পূজা করেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই। শ্রীমৈত্রেয়ঋষি বলিতেছেন,—

"যস্মিন্ ভগবতো নেত্রান্ন্যপতন্ হর্ষবিন্দবঃ।
কৃপয়া সম্পরীতস্য প্রপন্নেঽর্পিতয়া ভৃশম্॥
তদ্বৈ বিন্দুসরো নাম সরস্বত্যা পরিপ্লুতম্।
পুণ্যং শিবামৃতজলং মহর্ষিগণসেবিতম্॥"

(শ্রীভা ৩।২১।৩৮-৩৯)

এই আশ্রমে কর্দ্দম-ঋষির শরণাগতি-দর্শনে ভগবান্ শ্রীশুক্ল-দেবের অন্তঃকরণ স্নেহাপ্লুত হইয়া তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু-বিন্দু পতিত হইয়াছিল। শ্রীভগবানের সেই স্নেহাশ্রুই সরস্বতী-জলের সহিত পরিব্যাপ্ত হইয়া পবিত্র, মঙ্গলাবহ, অমৃততুল্য

সুস্বাদু জলে পরিপূর্ণ, মহর্ষিগণ-সেবিত 'বিন্দুসরোবর'-নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

শরণাগত ভক্তের অশ্রুর এইরূপ মূল্য যে, তাহা শ্রীভগবানের অশ্রুবিন্দু আকর্ষণ করিয়া ভক্তগণের নিত্য অবগাহনযোগ্য, মঙ্গলাবহ, অমৃতোপম বিন্দুসরোবর রচনা করিতে পারে। শান্তরতিতে শ্রীগুরুদেবের ভজন করিয়াই কর্দ্দম-ঋষি নিজেকে কৃতকৃতার্থ ও জগতের এইরূপ মঙ্গল করিয়াছিলেন ; আর যাঁহারা অশ্রুগঙ্গার দ্বারা মহাভাবস্বরূপ মহাবদান্য শ্রীগৌরহরির আরাধনা করেন, তাঁহাদের অশ্রুর মূল্য ব্রহ্মানন্দে মগ্ন ব্যক্তিগণ দূরে থাকুক, বৈকুণ্ঠবাসিগণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারেন না। ব্রহ্মজ্ঞানীর অভিমানকারী রামচন্দ্রপুরী শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শ্রীনয়নকমল হইতে নির্গত অশ্রুধারার মূল্য উপলব্ধি করিতে না পারায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গদেবের শ্রীচরণে অপরাধ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরি চিত্তদ্রবতা-কম্পাশ্রুপুলকাদি-রহিত ঔপনিষদ-ব্রহ্মজ্ঞানকেও ধিক্কার দিয়াছেন।

"শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ।
যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্ত-কম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥"

শ্রীভঃ সঃ, ৬৯ অনু)

শ্রীহরিকথামৃত হইতে শুদ্ধ জীবহৃদয়ে যে চিত্তদ্রবতা, কম্প ও অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিকভাব-বিকার প্রকটিত হয়, সেই সব লক্ষণ ঔপনিষদ্ ব্রহ্মজ্ঞানে না থাকায়, সেই ব্রহ্মজ্ঞান দূরে অবস্থান করুক অর্থাৎ উহার প্রয়োজন নাই।

মহাভাব-স্বরূপ শ্রীশ্রীগৌরহরি শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধান-লীলা প্রকট করিয়া সিদ্ধি বা সাধ্যভক্তির বাহ্য ও অন্তর উভয় লক্ষণেই 'অশ্রু-ধারার মূল্য' বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন।

"**নয়নং গলদশ্রুধারয়া** বদনং গদ্‌গদ-রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥
যুগায়িতং নিমেষেণ **চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্**।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥"

(শিক্ষাষ্টক—৬, ৭)

শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখোদ্‌গীর্ণ প্রথম শ্লোকটীতে সিদ্ধির বাহ্য-লক্ষণ ও দ্বিতীয় শ্লোকটীতে সিদ্ধির অন্তর্লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। উভয়ত্রই "নয়নং গলদশ্রুধারয়া", "চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্" শ্লোকাংশ-দ্বয়ের দ্বারা অশ্রুর সর্ব্বোত্তম মূল্য অর্থাৎ সাধ্যভক্তির চরম অবস্থাতেও অশ্রুই জীবের কাম্য, ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে যে,—অযোগ্যতম, দুর্ব্বলতম, কোটী কোটী অনর্থগ্রস্ত বিষয়ী দুরাচার অপরাধী ব্যক্তির মঙ্গল-লাভের একমাত্র উপায়—অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতির সহিত কৃপা-প্রার্থনাজাত অশ্রুর দ্বারা পরমকরুণ পরতত্ত্বের আরাধনা। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই আরাধনার কথা স্বল্পাক্ষরে একটী গীতির মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।

করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর ।।" (শরণাগতি)

বর্ণাশ্রমিগণ আপনাদের সুযোগ্যতা অনুভব করিয়া সেই সকল যোগ্যতার দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনায় নিযুক্ত হন, জ্ঞানিগণ বৈরাগ্যাদি সাধন-সম্পত্তির যোগ্যতা লইয়া ব্রহ্মের উপাসনা করেন, যোগিগণ অষ্টাঙ্গযোগ-সাধনের যোগ্যতার অনুভূতি লইয়া পরমাত্মার উপাসনায় সচেষ্ট হন। শ্রীনারায়ণের উপাসকগণও সদাচারাদি-যোগ্যতা লইয়া শ্রীনারায়ণের অর্চ্চনে তৎপর হন। কিন্তু **পরম-করুণ পরতত্ত্বের উপাসকগণের অযোগ্যতার অনুভূতিই তাঁহাদের একমাত্র যোগ্যতা।** এই অযোগ্যতার তীব্র ও অকপট অনুভূতি হইতেই অনুক্ষণ যে অশ্রু-গঙ্গার প্রবাহ প্রকটিত হয়, তাহাতেই অযোগ্যতম জীব পরমকরুণ প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম ভেলারূপে প্রাপ্ত হইয়া অনায়াসে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হন এবং শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে অবগাহন-পর্য্যন্ত করিবার সুদুর্ল্লভ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন। "করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণ না রাখিব আর"— এই চিত্ত-বৃত্তিটী যখন বাস্তব ও ঐকান্তিক হয়, তখন পরমকরুণ পরতত্ত্ব উপযাচক হইয়া এরূপ ক্রন্দনকারীর হৃদয়ে স্বয়ং অবরুদ্ধ হন। অযোগ্যতার সুতীব্র অনুভূতির সহিত যে অশ্রু, তাহা অজিতকে জয় করে, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রকে অবরুদ্ধ করে, পূর্ণতম নিরপেক্ষকেও সাপেক্ষতম অর্থাৎ দীনবৎসল করিয়া দেয়। অশ্রুর এত বড় মূল্য যে, স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাকে পূর্ণভাবে বিলাইয়া দিয়াও 'ঋণী' বলিয়া অভিমান করেন।

যেন বঞ্চিত না হই

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব আমাদের চিত্তবৃত্তি-অনুসারে যেরূপ আমাদিগকে অমায়ায় কৃপা করেন, আবার আমাদের বিপরীত চিত্তবৃত্তি দেখিয়া আত্ম-গোপন করিবার জন্য মায়া বিস্তার করিয়া থাকেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায়ও এই কথা জানাইয়াছেন,—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥

—(গীতা ৭।২৫)

আমি সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। বহিরঙ্গা মায়া দ্বারা বহির্ম্মুখ লোক-লোচনে সমাবৃত থাকি বলিয়া অব্যয়-স্বরূপ আমাকে মূঢ় লোকেরা জানিতে পারে না।

শ্রীহরি, শ্রীগুরু ও শ্রীবৈষ্ণব সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ বস্তু হইলেও আমরা যখন আমাদের লোচনের উপর বহির্ম্মুখতার যবনিকা টানিয়া ধরি, তখন সেই স্বপ্রকাশ সূর্য্যের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ দর্শন করিতে পারে না। আমরা আমাদের এই আবৃতাবস্থায় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের স্বরূপ-দর্শনে অনেকপ্রকারে বঞ্চিত হইয়া থাকি।

'ভগবান্ বা ভগবানের ভক্ত—বঞ্চক,' এই কথা শুনিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, সাধারণ মৎসর জীবের ন্যায়

ভগবান্ ও বৈষ্ণবের মধ্যে কি করিয়া কপটতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে? বস্তুতঃ ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত মৎসরতার বশীভূত হইয়া অপরকে বঞ্চনা করেন না। যাঁহারা চেতনবৃত্তির নিজস্ব-স্বভাব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া আত্ম-বঞ্চনা ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের স্বরূপে নিজে নিজেই বঞ্চিত হন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের বঞ্চনা—আমাদেরই স্বকৃত আত্ম-বঞ্চনার প্রতিমূর্ত্তি।

বহির্ম্মুখ আত্ম-বঞ্চনাকামী জীবকে এইরূপভাবে বঞ্চিত হইতে দেওয়া ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের পক্ষে করুণার অভাব—ইহা বলা যাইতে পারে না; কারণ, ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত যদি বহির্ম্মুখ ও উন্মুখকে একই প্রকার যোগ্যতা দেন, তাহা হইলে উন্মুখতার জন্য কেহই লালসান্বিত হইতে পারেন না; প্রকারান্তরে উহাতে বহির্ম্মুখতাই বদ্ধমূল থাকিয়া যায়। বিশেষতঃ তাঁহারা জীবের স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ করিয়া জীবকে জড়বস্তু করিতে প্রস্তুত হন না। যদি জীবের সেই স্বতন্ত্রতায় বাধা দেওয়া যায়, তাহা হইলে এক দিকে যেমন জীবের জীবত্ব ধ্বংস করা হয়, অপর দিকে জীবের উন্মুখতা-লাভের কোন প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতাই থাকে না। অতএব আমরা আত্ম বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করিলেই "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই ভগবৎ-প্রতিজ্ঞানুসারে বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন অর্থাৎ আমরাই আমাদের স্বতন্ত্রতা প্রয়োগ করিয়া আত্ম-বঞ্চিত হই।

'আত্ম-বঞ্চিত' কথাটি আমাদের নিকট আতঙ্কজনক ও অপ্রিয় এবং কেহই আত্ম-বঞ্চিত হইতে আন্তরিকভাবে ভালবাসিনা বটে, কিন্তু আবার আত্ম-বঞ্চনা ছাড়াও আন্তরিকভাবে আর কিছু চাহি না। ইহাই বহির্ম্মুখতার একটি অঘটন-ঘটন-পটিয়সী ছলনা; যেমন মায়ার চাতরে পড়িয়া কেহই আমরা ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হইতে ভালবাসিনা, কিন্তু জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক, মায়ার কবলে কবলিত হইবার জন্যই আমরা অনুক্ষণ অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়া থাকি, তদ্রূপ এই আত্ম-বঞ্চনার জন্য বহির্ম্মুখ অনর্থযুক্ত মানবজাতির বা প্রাণিজাতির একটা নৈসর্গিক অধ্যবসায় আছে।

হরি-গুরু-বৈষ্ণব আমাদের চিত্তবৃত্তির আত্ম-বঞ্চনা কামানুসারে বিভিন্ন প্রকার বঞ্চনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই বঞ্চনার রূপগুলি অসংখ্য ও অনন্ত। আমরা সাধু ও শাস্ত্রের বাণী হইতে কিছু কিছু ধারণা করিতে পারি।

হরি গুরু-বৈষ্ণব তাঁহাদিগকে মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় প্রকাশ করিয়া বঞ্চনা করেন, এই বঞ্চনা নানা আকারে প্রকাশিত হয়।

১। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের জরা-ব্যাধি, জন্ম-মৃত্যু-প্রতীতি।

২। তাঁহাদের পাণ্ডিত্যাদির অভাব, ভাষায় অপটুতা, বাক্-নৈপুণ্যের অভাব বা পাণ্ডিত্যাদি বিলাস আছে, ইত্যাদি প্রতীতি।

৩। তাঁহাদের বাক্যের অসামঞ্জস্য-প্রতীতি।

৪। তাঁহাদের নিরপেক্ষতার অভাব; এমন কি, সময় সময় অযৌক্তিক পক্ষপাতিত্বাদির প্রতীতি।

৫। ব্যবহারিক কথায় আদর প্রভৃতি প্রতীতি।

৬। কারণ বিহীন পারুষ্য, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ প্রভৃতির প্রতীতি।

৭। নিজ একান্ত সেবককে দণ্ড-দান ও বহির্ম্মুখ ব্যক্তিকে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি দান।

৮। বিলাসিতা, বিষয়-চেষ্টা, আত্ম-সুখানুসন্ধান, আরাম-প্রিয়তা প্রভৃতি প্রতীতি।

৯। বঞ্চনাকামী বা বঞ্চিতকে সত্যকথা সরলভাবে না জানাইয়া তাহার বঞ্চিতাবস্থাকে আরও নানাভাবে প্রশ্রয়-দান।

১০। বঞ্চিতকে শাসন না করিয়া অবঞ্চিতকে শাসন, তাহাতে বঞ্চিতকে অধিক স্নেহের পাত্র বলিয়া অপরকে ধারণা করাইবার সুযোগ-দান।

হরি-গুরু-বৈষ্ণব যখন আত্ম-বঞ্চনাকামী ও আত্ম-বঞ্চিত আমাদের নিকট তাঁহাদের ভাগবতী বাণীর মধ্যে—শ্রৌতবাণীর মধ্যে "নির্দ্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ," 'নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ", "ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ," "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" প্রভৃতি উপদেশ প্রদান করিয়াও তাঁহাদিগকে জরা-ব্যাধিগ্রস্ত জন্ম মৃত্যুর অধীন মর্ত্ত্যজীবরূপে প্রতীত করাইয়া আমাদের বুদ্ধিভ্রংশ করেন, তখনই জানিতে হইবে—আমাদের কপাল বড়ই মন্দ হইয়াছে—আমরা তাঁহাদের অকপট কৃপা-কটাক্ষে পতিত না হইয়া বঞ্চনার মধ্যে পড়িয়াছি।

তাঁহাদের বঞ্চনায় পতিত হইলে জীব দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হন। এক শ্রেণী মনে করেন,—হরি-গুরু-বৈষ্ণবের বস্তুত:ই জরা-ব্যাধি আছে, কিন্তু কেবল বৈষ্ণবী কপটতা বা বৈষ্ণবী পরিভাষার আবরণে উহাকে 'বঞ্চনা' প্রভৃতি কথা দ্বারা সজ্জিত বা আবৃত করা হয়। গুরু-বৈষ্ণবের অঙ্গে (?) ছুরি বসাইলে যখন আমারই মত রক্ত বাহির হয় এবং তাহারাও আমারই মত যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করেন, তখন বৈষ্ণবী পরিভাষায় উহাকে 'বঞ্চনা' বা তাঁহাদের দেহকে 'অপ্রাকৃত', যাহাই বলা হউক না কেন, উহা কেবল কতকগুলি কথার কথা, অথবা ঐ কথাগুলিই একটি মস্ত বঞ্চনা।

আর এক শ্রেণী মনে করেন—যাঁহারা সিদ্ধ মহাত্মা তাঁহাদের শরীরে কোনপ্রকার জরা-ব্যাধি নাই এবং যন্ত্রণার অনুভূতিও নাই। উদাহরণস্বরূপ তাঁহারা কোন কোন যোগীর আদর্শ উল্লেখ করেন। এমন অনেক যোগীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের গায়ে টিকার আগুন ধরাইয়া দিলেও তাঁহাদের যন্ত্রণার অনুভূতি থাকে না। সুতরাং তাঁহাদের মতে যাঁহাদের জরা ব্যাধি, বা যন্ত্রণায় অস্থিরতা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা কখনও সাধু বা সিদ্ধ-মহাত্মা নহেন।

লাহোরের মহারাজ রণজিৎ সিংহ হরিদাস সাধু নামক এক যোগীকে একটি কাষ্ঠের সিন্দুকের মধ্যে চাবি বন্ধ করিয়া মৃত্তিকার অভ্যন্তরে পুতিয়া রাখেন এবং নিঃসন্দেহ হইবার জন্য ঐ সমাধির উপর যবের চাষ ও উহার চতুর্দ্দিক ইষ্টকদ্বারা গাঁথাইয়া চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করেন। উনচল্লিশদিন পরে মৃত্তিকা খনন

করিয়া যোগীকে উঠাইলে সেইরূপ যোগাসনেই উপবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। হরিদাস জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিতেন ও যোগ-বলে শূন্যে অবস্থান করিতে পারিতেন। উক্ত যোগীর জীবনীলেখক কেহ কেহ বলেন যে উক্ত যোগীর নাকি ঐরূপ অবস্থালাভের পরও দুরাচার লক্ষিত হইয়াছিল। সৌভরী-প্রমুখ যোগসিদ্ধ ঋষিগণের দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায় যে, তাঁহাদেরও সংসার-বাসনা উদিত হইয়াছিল। শ্রীগৌর-পার্ষদ ঠাকুর হরিদাসের পাদপদ্মের নখাগ্রে এইরূপ কোটি কোটি যোগসিদ্ধি তাঁহার কৈঙ্কর্য্য করিবার অপেক্ষায় থাকিলেও তিনি উহাদিগকে তুচ্ছ করিয়াছেন।

মহাভাগবত-শিরোমণি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদকে তাঁহার অন্তর্দশায় ক্রন্দন করিতে দেখিয়া নির্ব্বিশেষবাদী রামচন্দ্রপুরী গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"তুমি—পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ, করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেন করহ রোদন?"

—(চৈঃ চঃ অ ৮।১৯)

ইহা শুনিয়া গুরু মাধবেন্দ্রপুরী রামচন্দ্রপুরীকে কিরূপ ক্রোধ-ভরে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে দেখিতে পাই,—

"শুনি' মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
'দূর, দূর, পাপী' বলি' ভর্ৎসনা করিল॥
'কৃষ্ণকৃপা না পাইনু, না পাইনু মথুরা।
আপন দুঃখে মরোঁ, এই দিতে আইল জ্বালা॥

মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যাও যথি-তথি।
তোরে দেখি' মৈলে মোর হ'বে অসদ্গতি॥
কৃষ্ণ না পাইনু মরোঁ আপনার দুঃখে।
মোরে 'ব্রহ্ম' উপদেশে এই ছার মূর্খে॥'
এই যে মাধবেন্দ্র উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইঁহার বাসনা জন্মিল॥

—(চৈঃ চঃ অ ৮।২০-২৪)

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অকপট কৃপালব্ধ অবঞ্চিত শিষ্য ঈশ্বরপুরী কিন্তু তাঁহার তথাকথিত গুরু-ভ্রাতা রামচন্দ্রপুরীর ন্যায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকে সামান্য একজন যোগ-বিভূতিসম্পন্ন বা নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানানুসন্ধিৎসু জীবমাত্র বিচার করিয়া মাধবেন্দ্রের বিপ্রলম্ভময় ক্রন্দন বা জরা-ব্যাধির অভিনয়কে মহাভাগবতত্বের বিরোধি-লক্ষণ বলিয়া বিচার করেন নাই, কিংবা প্রাকৃত মায়া-মুগ্ধ আত্মীয়-স্বজনের সেবা-শুশ্রূষা করিবার ন্যায় মোহমুগ্ধ হইয়া কোন স্বার্থের উদ্দেশ্যে গুরুসেবার অভিনয় করেন নাই। তিনি কি করিয়াছিলে ?—

"ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ-সেবন।
স্বহস্তে করে মল-মূত্রাদি মার্জ্জন॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ॥"

—(চৈঃ চঃ অ ৮।২৬-২৭)

যেখানে কোন অপস্বার্থ বা অন্যাভিলাযমূলে কেবলমাত্র

দৈহিক মায়ামুগ্ধ হইয়া গুরু বা বৈষ্ণব-সেবার অভিনয়, সেখানে স্বহস্তে মল-মূত্রাদি মার্জ্জনরূপ গুরু বৈষ্ণব-সেবার তটস্থ লক্ষণ থাকিলেও আন্তরিকভাবে ' নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ ॥" —সেবার ঐ স্বরূপ লক্ষণ থাকিবে না। গুরু-বৈষ্ণব বা মাতা-পিতৃ-অভিনয়কারী মহাভাগবতের সেবা করিতে গিয়া সময় সময় শিষ্যাভিমানী বা পুত্রকন্যাভিমানী ব্যক্তি-গণে দৈহিক মমতা ও তদ্‌বিয়োগ-জনিত প্রবল দুঃখাদির চিহ্নও দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেখানে **গুরু-বৈষ্ণব** বা মাতা-পিতা-অভিনয়কারী **মহাভাগবতের দ্বারা** কোন না কোনপ্রকার **'খাজাঞ্চিগিরি'** করাইয়া লইবার প্রচ্ছন্ন পিপাসা হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকে। যেখানে নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য গুরু-বৈষ্ণবের সেবা-শুশ্রূষার ছলনা নাই, সেখানে ঈশ্বরপুরী বা স্বরূপ-রামানন্দের চিত্তবৃত্তি বা আচরণ দৃষ্ট হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলায় স্বরূপ-রামানন্দ কি করিয়া-ছিলেন ?—

"রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥
তাঁ'র সুখ-হেতু সঙ্গে রহে দুই জনা।
কৃষ্ণরস-শ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা॥"

—(চৈঃ চঃ অ ৬।৬, ৭)

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের অন্ত্যলীলায় ঈশ্বরপুরী কি কোন সম্পত্তি বা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা গুরুদেবের নিকট হইতে চাহিয়া-ছিলেন ?—মুখে না হউক, অন্তরে কি কোনপ্রকার 'আশীস্'

চাহিয়াছিলেন ? তিনি কি স্বহস্তে গুরুদেবের মল-মূত্রাদি-মার্জ্জন বা কৃষ্ণনাম শুনাইবার মাশুল-স্বরূপ গুরুদেবের সার্ষ্টি, সারূপ্যাদির অভিলাষী হইয়াছিলেন ? ঈশ্বরপুরী জানিতেন—"যস্ত আশীষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্"। 'আশীসে'র অর্থ—অভিলাষ, আর এক অর্থ—সর্পের বিষদন্ত। অভিলাষ বা কামনা সর্পের বিষদন্তই বটে। গুরু-বৈষ্ণবের দ্বারা খাজাঞ্চিগিরি করাইয়া লওয়া বণিকের স্বভাব, উহা প্রেমিকের স্বভাব নহে। তাই—

"তুষ্ট হৈয়া পুরী তারে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন ॥
সেই হ'তে ঈশ্বরপুরী—'প্রেমের সাগর'।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্বনিন্দাকর ॥
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুই জনে।
এই দুই দ্বারে শিখাইলা জগজনে ॥
জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র করি' প্রেমদান।
এই শ্লোক পড়ি' তেঁহো করিলা অন্তর্দ্ধান ॥"

"অয়ি দীনদয়াদ্র্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥"
—(চৈঃ চঃ অ ৮।২৭-৩২)

জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি গৌর-জনগণের অন্তর্ধান-লীলা ও জগতে আবির্ভাব-লীলা স্বেচ্ছাকৃত। ঠাকুর হরিদাসকে যখন মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কোন্ ব্যাধি কহ ত' নির্ণয় ?
তেঁহো কহে,— সংখ্যা-কীর্ত্তন না পরয় ।"
—(চৈঃ চঃ অ ১১।২৩)

জগদ্‌গুরু মহাভাগবতগণের ব্যাধি প্রভৃতির বাহ্য প্রতীতিকে এইজন্যই 'লীলা' বা 'অভিনয়' বলা হয়। অর্থাৎ তাঁহারা ব্যাধির ছলে বহির্ম্মুখকে বঞ্চনা করিয়া এবং উন্মুখকে সেবা-সুযোগ ও তাঁহাদের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া সুখে-দুঃখে অনুক্ষণ 'অন্তর্মনাঃ' হইয়া হরিভজন করিবার আদর্শ প্রচার এবং তাঁহারা স্বয়ং বিপ্রলম্ভসুখে বিভাবিত থাকিয়া স্বভজন করিবার কৌশল আবিষ্কার করেন।

যদি জগদ্‌গুরু বৈষ্ণবগণ নীচদেশে, নীচকুলে আবির্ভূত হইবার লীলা প্রকাশ না করিতেন, যদি আধি-ব্যাধির অভিনয় প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে কর্ম্মফলবাধ্য ত্রিতাপতপ্ত বদ্ধজীব কোনও দিন হরিভজনের সর্ব্বোচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিতেন না। ক্ষুদ্র জীবের নিকট অভয়বাণী-প্রচারের জন্য, তাহাদের প্রাণে আশা ও উৎসাহ সঞ্চারের জন্য মহাভাগবতগণের জরা-ব্যাধির অভিনয়। তাঁহারা স্বয়ং পরিপূর্ণভাবে স্বভজনে নিমগ্ন থাকিয়াও ঐরূপ অতৃপ্তি ও অভাবের অভিনয় করিতেছেন,— ইহা সেবোন্মুখদিগকে বুঝাইবার জন্যই অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভজনের সর্ব্বোত্তমত্ব জানাইবার জন্যই তাঁহাদের ঐ প্রকার লীলা। এইজন্যই ঠাকুর বৃন্দাবন গাহিয়াছেন, –

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥"

—(চৈঃ ভাঃ ম ৯।১৪০)

কোন কোন ফাজিল-প্রকৃতি ব্যক্তি মনে করে, আচ্ছা, গুরু-বৈষ্ণবের জরা-ব্যাধি প্রভৃতি যখন লীলা বা অভিনয়মাত্র, তখন আমরা দূরে থাকিয়া তাঁহাদিগকে একটুকু পরীক্ষা করিয়া দেখি অর্থাৎ তাঁহাদিগকে ক্ষুধায় অন্ন ও পিপাসায় জল দেওয়ার প্রয়োজন নাই—গুরুকে পঙ্কে পতিত (?) হইতে দেখিয়াও ধরিবার আবশ্যকতা নাই। 'গুরু', অথচ তিনি পতিত হইতেছেন ; 'বৈষ্ণব', অথচ তিনি কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন, আমি তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারি, বা ইচ্ছা করিলে না করিতেও পারি,—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধিই গুরু-বৈষ্ণবে অসূয়ামূলক মর্ত্ত্যবুদ্ধি।

হরি-গুরু-বৈষ্ণব সর্ব্বসিদ্ধ থাকিয়াও যদি ঐরূপ অভিনয় না করিতেন, তাহা হইলে আমাদের ভোগতৎপরতায় নিযুক্ত ইন্দ্রিয়-গুলি কি প্রকারে কোন-না-কোনদিন সেবোন্মুখতায় নিযুক্ত হইবার সুযোগ পাইত? অর্চ্চাবতার ক্ষুধা-তৃষ্ণাহীন হইয়াও ক্ষুধা তৃষ্ণা-যুক্তের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া অর্চ্চকের মঙ্গল করেন ; কিন্তু অত্যন্ত প্রাকৃত-বিচার-বশতঃ অর্চ্চাতে ভোগ-বুদ্ধি বা অচেতন-বুদ্ধি প্রবল হয় বলিয়া গোবিন্দের নিজ-জন গুরু-বৈষ্ণব জীবন্ত-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া নানাভাবে কৃপাপূর্ব্বক সেবা গ্রহণ করিয়া সেবা-শিক্ষার সুযোগ দান করেন। আমরা সেই সুযোগকে ভোগের ব্যাঘাতকর জানিয়া প্রত্যাখ্যান করি, কখনও বা গুরু-বৈষ্ণবের

সেবার ছলনা করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা আমাদের খাজাঞ্চিগিরি করাইয়া লইতে চাহি।

মুক্ত পুরুষগণের এই জগতে অবস্থান, আগমন ও এই জগৎ হইতে গমনাদি—সকলই তাঁহাদের স্বেচ্ছাকৃত।

"মুক্তা অপি হি কুর্ব্বন্তি স্বেচ্ছয়োপাসনং হরেঃ।"

—(মাধ্বভাষ্য ৩।৩।২৭ ধৃত ব্রহ্মতর্কবাক্য)

অর্থাৎ মুক্তগণও স্বাভাবিকী ইচ্ছায় হরির উপাসনা করিয়া থাকেন—

'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"

(ভাঃ ১০।৮৭।২১ শ্লোকে শ্রীধরকৃত সর্ব্বজ্ঞভাষ্যকার-ব্যাখ্যা)

অর্থাৎ মুক্ত পুরুষগণও স্বেচ্ছায় (কর্ম্মজনিত নহে) নিত্যশরীর পরিগ্রহ করিয়া ভগবান্‌কে ভজনা করিয়া থাকেন।

নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতগণের লীলায় বা স্বেচ্ছায় শরীর গ্রহণ। সুতরাং তাঁহাদের জরা, ব্যাধি প্রভৃতির অভিনয়ও লীলা বা স্বেচ্ছাকৃত। শ্রীধরস্বামিপাদ আরও বলিয়াছেন,—

"পার্ষদতনূনামকর্ম্মারব্ধত্বং নিত্যত্বং শুদ্ধত্বঞ্চ।"

—(ভাবার্থদীপিকা ১।৬।২৯)

অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদশরীর-সমূহের কোন প্রারব্ধ কর্ম্ম নাই, তাহা নিত্য ও শুদ্ধ।

ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন,—

"অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই ॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম, জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি' কহে॥"

তথা (হি পাদ্মোত্তরখণ্ডে ২৫৭।৫৭, ৫৮)—

"যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া॥
পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তদ্‌বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্‌।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥"

—(চৈঃ ভাঃ অ ৮।১৭৩।১৭৬)

শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ-তনু-সম্বন্ধেও শাস্ত্রে শত শত প্রমাণ পাওয়া যায়,—'নৈবৈতে জায়ন্তে নৈবৈতে ম্রিয়ন্তে নৈষামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্ব এব হ্যেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দাঃ।"—(মাধ্বভাষ্যধৃতা শ্রুতিঃ)

"সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥"

—(মহাবারাহে)

"যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বস্মাদ্বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ।
মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলঃ স্নানমাচরেৎ॥"

—(বৃহদ্বৈষ্ণবে)

মহাবিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর সন্তান-অভিনয়কারী কেহ কেহ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর সচ্চিদানন্দ-তনুকে প্রাকৃত বিচার করিয়াছিলেন; এমন কি, শুনা যায়,—অদ্বৈত-পুত্রাভিমানী বলরামের প্রথম পক্ষীয়

স্ত্রীর কনিষ্ঠ সন্তান মধুসূদন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের পুত্র রাধারমণ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের আনুগত্যে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর কুশ-পুত্তলিকা পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ ও দগ্ধ করিয়া রাক্ষস-শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যখন কৃষ্ণভক্তিশূন্য পৃথিবী দেখিয়া অন্তর্দ্দশায় স্ব-ভজনে নিযুক্ত থাকিবার জন্য জড়ভাব অবলম্বন করিলেন, তখন বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ বঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে যে চক্ষে দর্শন ও যে ভাবে সেবা করিয়াছিলেন, আর তদীয় অন্তরঙ্গ নিজজন যে-ভাবে দর্শন ও সেবা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত যাঁহার চিত্তবৃত্তি একতাৎপর্য্যবিশিষ্ট, তিনি ঠাকুরের জড়ভাবের অভিনয়কে এইরূপভাবে বিচার করিলেন,—

"শ্রীগৌর-বিমুখ-ভাব, রাধাকৃষ্ণ প্রেমাভাব,
ভকতিবিনোদ দেখে যবে।
সংসারের দেখি' গতি, কৃষ্ণভক্তিহীন মতি,
বাতব্যাধিছলে মৌনী তবে॥
অবলম্বি' জড়ভাব, জড়ত্যাগে ব্রজ লাভ,
অনুক্ষণ এই কথা মুখে।
কৃষ্ণভক্তিশূন্য ধরা, দেখি' প্রকাশিল জরা,
অন্তর দশায় ভজে সুখে॥

আমার হরিভজনে নানাপ্রকার কপটতা এবং গৌরজনের হৃদয়-স্বরূপ বা একমাত্র জীবাতু অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের প্রতি নানা আকারে বিদ্রোহ-দর্শনে গৌরজন যে ব্যাধির অভিনয় করিয়া

স্বভজনে নিযুক্ত থাকিবার কৌশল আবিষ্কার করেন, তাহাও কপাল-দোষে বহির্ম্মুখ আমার বঞ্চনার কারণ হয়।

কেহ কেহ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখাইয়া তাঁহার গোদ্রুমে যাইবার পক্ষে নানাপ্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন; কিন্তু ভক্তিবিনোদের সহিত যাঁহার চিত্তবৃত্তি একতাৎপর্য্যপর, তিনি সেরূপ বিচার করেন নাই। তাই তাঁহার সহিত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গোদ্রুমাভিমুখে যাত্রা করিবার প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন,—

"অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ম্ গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্॥"

ঠাকুরের নিত্যলীলা প্রবেশের পরেও অনেকেরই তাঁহার স্বরূপ-দর্শনে বাধা হইয়াছে। কিন্তু নির্য্যাণের অব্যবহিত পরেই তাঁহার নিজ-জন জানাইলেন,—

ঠাকুব ভক্তিবিনোদ কাহারও বাবা, কাকা, দাদা, মামা প্রভৃতি নহেন। মাংসদৃক্ ব্যক্তিগণের বাবা, মা প্রভৃতি প্রাকৃত-দর্শন গৌর-জনের প্রকৃত স্বরূপ-দর্শনে বাধা। "দীর্ঘ বকারদ্বয়ের প্রথম বকারে গোলোকোপরিস্থিতি বুঝিতে না পারিলেই বাধা উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় দীর্ঘ বকারে আঁকশী বা আকর্ষণী গরুড়-বাহনের কৃপায় বাধা অতিক্রম করাইয়া ভক্তিবিনোদে রাধারাণীর পদনখ-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করে।"—গৌর-জনের এই কথাগুলি ইঙ্গিতেই বলা হইল।

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ নিজ-হস্তে আত্ম-সমাধি-স্থান খনন করিয়াছিলেন; শ্রীল গৌরকিশোর

প্রভু তাঁহার প্রকটকালে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার অপ্রকট হইলে যেন তাঁহার (চিদানন্দ) দেহ শ্রীধাম-নবদ্বীপের রাস্তা দিয়া টানিতে টানিতে লইয়া যাওয়া হয়। মহাজনগণের এই সকল আচরণে ও বাক্যে অনেকেই বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ এই সকল বঞ্চনাকে একান্ত অনুগত জনগণেরই নিকট জানাইয়া দিয়াছেন। তথাপি আমরা বঞ্চিত হইতে চাহি ! অহো বলীয়সী মায়াপিশাচীর ছলনা !

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৎসল। কিন্তু যে স্থলে কৃষ্ণাধস্তনের কৃষ্ণবৈমুখ্য বা কার্ষ্ণবাৎসল্যাভাব বা ভগবদধীন জনের মধ্যে মিত্রতাভাব, সে-স্থলে কৃষ্ণের আত্মীয়-জ্ঞানে বিদ্বেষি জনের প্রতি জীবের মিত্রতা অজ্ঞতারই কারণ হয়। কংসকে 'ভগবন্মাতুল' মনে করিয়া যদি কেহ তাহাকে কৃষ্ণের অনুগত জ্ঞান করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিচার যেরূপ ভ্রমপূর্ণ হয়, দুর্জ্জনাদিকে কৃষ্ণের আত্মীয়জ্ঞানে যদি কৃষ্ণবিদ্বেষি-পক্ষকে কৃষ্ণপাল্যপক্ষ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সেইরূপ মায়াবাদাশ্রিত জনগণ কৃষ্ণভক্তবিরোধিগণকে কৃষ্ণাত্মীয়-কুলজ্ঞানে অবিচার গ্রহণ করিলেন। বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণের প্রতি আশ্রয়ের কৃত্যবিমুখ যে-সকল আশ্রিতাভিমানী, তাহাদিগকে কৃষ্ণ-ভক্তির বিরোধী বলিয়া না জানিয়া অনুকূল-জ্ঞান কখনই 'সুদর্শন' শব্দ-বাচ্য নহে। যদিও প্রাকৃত-সহজিয়াকুল আপনাদিগকে কৃষ্ণের 'আত্মীয়' জ্ঞান করেন, তথাপি পরম দয়াময় কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের বিনাশ-সাধনে সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ তাহাদের কোন সেবাই গ্রহণ করেন

না। যদুকুমারগণের কপটতা 'বিনীতবৎ' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহারা দুর্ব্বিনীত।

শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় মিছাভক্ত-সম্প্রদায় পরস্পর প্রতিষ্ঠাশায় 'ভাগবাটোয়ারা' ও কনক-কামিনীর অংশ-নির্দ্দেশ লইয়া এরকা-তৃণের শর সংগ্রহ-রূপ মিছাভক্তিশর দ্বারা কামবাণে আচ্ছন্ন হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করিবেন অর্থাৎ নিত্যকৃষ্ণবৈমুখ্যই লাভ করিবেন।"

আত্মবঞ্চনাকামী ব্যক্তি শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর গুরুপাদপদ্মে তাঁহার স্বরূপ-রূপানুগত্ব দর্শন না করিয়া অনেক সময় অনুস্বার-বিসর্গের পাণ্ডিত্যের অভাব, সাহিত্যিকতা ও বাগ্মিতার অভাব কিংবা শ্রীমদ্ভাগবতকার শ্রীব্যাসের রচনায় ভূগোল ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার ভ্রমাদি, শ্রীরূপ গোস্বামীতে অঙ্ক-শাস্ত্রের জ্ঞানের অভাব প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া বঞ্চিত হয়।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণের কেহ কেহ শ্রীরূপ ও শ্রীজীবের বাক্যের মধ্যে এমন কি, শ্রীরূপেরই বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে, কখনও বা মহাপ্রভুর বাক্য ও আচরণের মধ্যে * কপাল-দোষে অসামঞ্জস্য দর্শন করিয়া অর্থাৎ সেবোন্মুখতা ও অকপটতার অভাবে সমন্বয় দর্শন করিতে না পারিয়া বঞ্চিত হইয়া থাকে।

---

* যেমন 'স্ত্রী-গান' শব্দমাত্র-শ্রবণে মহাপ্রভু স্ত্রী-স্পর্শ হইবে বলিয়া শঙ্কান্বিত হইবার লীলা দেখাইলেন, অথচ শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে একটি উড়িয়া-স্ত্রী মহাপ্রভুর স্কন্ধে পদস্থাপন করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন জানিয়াও ঐরূপ কার্য্য অনুমোদন করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরূপ-সনাতনের পক্ষপাতিত্ব, আবার কখনও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সম্বন্ধে মৎসর অমোঘের প্রতি স্নেহভাব-প্রদর্শন, কখনও বা রূপ-সনাতন-রঘুনাথকে ছেঁড়া কাঁথা পরাইয়া ও 'সড়া' অন্ন খাওয়াইয়া শ্রীবল্লভ ভট্টাদির প্রতি অধিকতর ব্যবহারিক আদর প্রদর্শন অনেকের পক্ষে বঞ্চনার কারণ হইয়া পড়ে।

শ্রীল গৌরকিশোর, মহাত্মা শ্রীবংশীদাস প্রভৃতি অতিমর্ত্ত্য বৈষ্ণবগণের চরিত্রে গ্রাম্য লোককে চাউল, ধান, সুপারী প্রভৃতির বাজার-দর জিজ্ঞাসা; শ্রীবংশীদাসের তাম্রকূট ও অবৈষ্ণব-বেযাদির-গ্রহণের অভিনয় অনেকের বঞ্চনার কারণ হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল বঞ্চনার অভ্যন্তরে কিরূপ স্বভজন-বিতরণরূপ কৃপা আছে, তাহাও আচার্য্যের কৃপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু প্রমুখ মহাত্মগণ বিনা কারণে অনেক সময় এরূপ ক্রোধাভিনয় ও কর্কশ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছেন, সামান্য অর্থাদির প্রতি এরূপ আসক্তি দেখাইয়াছেন যে, তাহাতে অনেক বিষয়ী ব্যক্তি বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু স্বরূপ-রূপানুগবর আচার্য্যের কৃপায় আবার অনেকের তাহাতে সেই সকল অচিন্ত্য, অতিমর্ত্ত্য চরিত্র বুঝিবারও সৌভাগ্য হইয়াছে।

ঐ সকল অতিমর্ত্ত্য-চরিত্র মহাপুরুষগণের চরিত্রে অসংখ্যবার দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা নিজ-জনকে দণ্ড দান করিয়া বহির্ম্মুখ সামাজিক ব্যক্তিগণকে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি প্রদান করিয়াছেন—দ্রবিণাদি দ্বারা বঞ্চনা করিয়াছেন। ভক্তিবিনোদ

ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রে বহির্ম্মুখ সামাজিকগণকে ঐরূপ লৌকিক প্রতিষ্ঠাদি বা দ্রবিণাদি-দানপূর্ব্বক বঞ্চনা করিবার অনেক আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রায় রামানন্দ প্রভৃতির হরিভজনকে 'বিলাসিতা' ও 'বিষয়-চেষ্টা' বলিয়া অনেকে ভ্রম করিয়াছেন। এমন কি, সাক্ষাৎ শ্রীগদাধর পণ্ডিত ও প্রদ্যুম্ন মিশ্রের ন্যায় ব্যক্তি-গণও লোক-শিক্ষার জন্য সেইরূপ ভ্রান্ত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রায় রামানন্দের রাজ-কার্য্য, ভক্তিবিনোদের রাজ-কার্য্য, মুরারিগুপ্তের ব্যবসায়, শিবানন্দ ও ভবানন্দের সন্তান-সন্ততি, ঠাকুর নরোত্তমের খেতুরীতে বাস ও নিজ-গুরু লোকনাথের আদর্শের আপাত-প্রতিম বিরুদ্ধ কার্য্যস্বরূপ বহু শিষ্য-করণ, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পরিণত বয়সে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ, জাহ্নবা-মাতার উষ্ণ জলে স্নান ও সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান প্রভৃতির বিষয় বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের বঞ্চনার কারণ হইয়াছে; আবার কেহ কেহ ঐ সকলের অনুকরণ করিয়া ঐ সকল মহাপুরুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্করণ সাজিবার পাষণ্ডতাও করিয়াছে। কিন্তু স্বরূপ-রূপানুগবর এই উভয় প্রকার আত্মবঞ্চনা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নিয়ত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

এমনও দেখা যায় যে, কাহারও হয়ত প্রথমে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে নিষ্কপট সেবা-প্রবৃত্তি ছিল। সেই সেবা-প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া গুরু-বৈষ্ণবগণ সেবককে নানাভাবে প্রচুর উৎসাহ-প্রদান ও তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু সেবক যদি গুরু-বৈষ্ণবের ঐ

প্রতিষ্ঠা-দানে বিমোহিত হইয়া কেবল প্রতিষ্ঠারই কাঙ্গাল হইয়া পড়েন, তবে বাঞ্ছাকল্পতরু গুরু-বৈষ্ণবগণ প্রতিষ্ঠালিপ্সুকে বঞ্চনা করিয়া পরবর্ত্তিকালেও নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠা দান করিতে পারেন। বস্তুতঃ গুরু-বৈষ্ণবের ঐরূপ প্রতিষ্ঠা-দানই শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্নেহ বা সেবায় অনুমোদন বা বৈষ্ণবগণের সমর্থন নহে। যদি আমরা আত্ম-বঞ্চনা না চাই, তাহা হইলে এ বিষয়েও আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে। গুরু-বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠা প্রদান করিলে যদি হৃদয় উৎফুল্ল হয়, আর প্রতিষ্ঠা কম দিলে বা সত্যকথা বলিলে যদি সেবার প্রতি বৈরাগ্য বা আত্মসংশোধনে বিমুখতা উপস্থিত হয় কিংবা গুরু-বৈষ্ণবগণকে একটি বিপক্ষ-দল বা দলের দ্বারা অভিভূত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলেও আত্মবঞ্চিত হইলাম।

শ্রীল গৌরকিশোরাদি মহাপুরুষগণের চরিত্রে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া এমন অনেক কপট ও অসৎ ব্যক্তি অবস্থান করিত— যাহাদিগকে তাঁহারা অধিকতর বঞ্চিত হইবারই সুযোগ প্রদান করিতেন। এমন কি, অনেকে নিজদিগকে সেই মহাপুরুষগণের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র বলিয়া মনে করিতেন। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ ও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি মহাত্মগণের সেবকাভিমান করিয়া অনেকের আজীবন খাওয়া-পরার দুঃখ, পারিবারিক অস্বচ্ছলতা বিদূরিত হইয়াছিল এবং অনেকে অনেক প্রকার লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি পাইয়া আপনাদিগকে হরি-ভজনের ফল-লাভে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল বঞ্চনা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বিনোদ-বাণী-গৌরের

অবতার হইয়াছে। বিনোদ-বাণী-গৌরের সেবায় অকপটতা থাকিলে এরূপ বঞ্চনায় পতিত হইতে হয় না, ইহাই আমরা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াছি। তাই হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে আমাদের এইমাত্র আশীর্ব্বাদ নিষ্কপটে কামনার বিষয় হউক যে, কোটি কোটি জন্মের পরেও হরিভজনে প্রবেশাধিকার হয় হউক, আপত্তি নাই; কিন্তু যেন বৈষ্ণবী মায়ায় বঞ্চিত না হই, যাহা প্রোজ্ঝিতকৈতব হরিভজন নহে, তাহাতে যেন 'হরিভজন' বলিয়া বিবর্ত্তবুদ্ধি না হয়।

—:*:—

বৈষ্ণব সেবা

মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ (শ্রীবিগ্রহ), নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণব পতিত বদ্ধ জীবের জন্য প্রপঞ্চে নিত্য অবতীর্ণ থাকেন। পতিতের জন্য—দুর্গতের জন্য এই অদ্বয়জ্ঞান চারি বস্তুর কৃপার যেমন সীমা নাই—হেতু নাই বা কোন কুণ্ঠা নাই, তেমনই আবার বদ্ধজীবের দুর্ভাগ্যের পরিচয়ও এই যে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিতা, কেবলা, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা এই কৃপার প্রতি বিমুখ সে হইবেই হইবে। ইহারই নাম বদ্ধতা। কৃপার প্রতি উন্মুখতা উপস্থিত হইলে মায়ার বন্ধন মোচনের সময় হইয়াছে জানিতে হইবে। কৃপাসিন্ধু এই চারি তত্ত্বই সেব্য। সেব্যবস্তুর কৃপাই হইতেছে—সেবককে স্বীয় সেবা প্রদান করা। সেবা-ব্যতীত সেবক যদি অন্যবস্তু চাহেন, অথবা সেব্য যদি অন্যবস্তু

দান করেন, তবে আর সেখানে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ থাকিল না। সেখানে হয় সেবক, সেবক নহেন—বণিক্, অথবা সেব্য, সেব্য নহেন - বঞ্চক পাটোয়ার অথবা উভয়েই বণিগ্‌বৃত্তিবিশিষ্ট। জীব স্বরূপতঃ সেবক এবং এই চারি তত্ত্বই জীবের নিত্য সেব্যবস্তু। কাজেই যখনই স্বরূপের উদ্বোধন হইতে আরম্ভ হয়, তখনই এই চারি তত্ত্বে সেবার প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে উন্মেষিত হইতে থাকে। এই চারি তত্ত্বের মধ্যে বৈষ্ণবের করুণাই অধিকভাবে মায়াবদ্ধ জীবকে মঙ্গল দান করিয়া থাকে। আবার ইহাও দেখা যায়, বৈষ্ণব-কৃপাবরণেই জীব সর্ব্বাপেক্ষা বিমুখ। বৈষ্ণব-সেবাপ্রবৃত্তি সহসা জাগরূক্ হয় না। বৈষ্ণবই মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ ও শ্রীনামব্রহ্মের কৃপা জীবকে জানাইয়া দেন এবং বৈষ্ণবের কৃপাতেই তাহা লাভ হইয়া থাকে।

শাস্ত্র বলেন,—"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে। স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥" অল্পপুণ্যবান্ অর্থাৎ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি যাহাদের নাই, তাহাদের এই চারি তত্ত্বে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা হয় না। মহাপ্রসাদের তত্ত্ব না বুঝিয়া তাঁহাকে ভোগ্য জ্ঞান করে, এইজন্য মহাপ্রসাদে বাহ্য আদর বদ্ধজীবে দেখা যায়। শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ আমাকে সাক্ষাদ্ভাবে নিয়মন করেন না, পরন্তু নয়নের তৃপ্তিদায়ক বলিয়া তাহাতেও কিছু আদর দেখা যায়। নামব্রহ্ম আমাদের বিষয়সুখান্বেষী কর্ণ ও মনকে বাধা দেন বলিয়া তাঁহাতে অনাদর হয়; কখনও জ্ঞানপিপাসা বা কর্ণ ও মনের সুখের জন্য হরিকথার বিচারসমূহে বা সুর-তালাদিতে রুচি হয়।

ঐগুলি শব্দব্রহ্মের বাহ্য ও দূর আবরণমাত্র। বৈষ্ণব আমাদিগকে নিয়মন ও শাসন দ্বারা আমাদের বিমুখতাকে বাধা দেন, কাজেই বদ্ধজীব নিসর্গতই বৈষ্ণববিরোধী।

জীব যখনই উন্মুখ হয়, তখনই তাহার লক্ষণ প্রকাশ পায় বৈষ্ণবসেবাপ্রবৃত্তির মধ্য দিয়া। উন্মুখতার ঈষৎ বিকাশ পাইলেই জীব বৈষ্ণবের আচরণের অনুমোদন করিয়া থাকে; বৈষ্ণবের আচরণ এবং ক্রিয়ামুদ্রা তাহার চিত্তে বিরোধি-ভাবের উদয় করায় না। যদি তাহার সুকৃতির জোর থাকে, তাহা হইলে এই অনুমোদন হইতে আদর উপস্থিত হয়। যদি সে বহু ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আদর হইতে শ্রদ্ধা উদিত হয়। শ্রদ্ধা হইতে বিশ্রম্ভ ও ক্রমশঃ গাঢ় প্রীতি হইয়া থাকে। "কিরূপে পাইব সেবা" প্রভৃতি গাঢ় প্রীতিময়ী উক্তি। যদি বৈষ্ণবের আচরণ ও ক্রিয়ামুদ্রা অনুমোদন করিয়াও ক্রমে তাহাতে আদর ও শ্রদ্ধা না হয়, তবে জানিতে হইবে নিশ্চয়ই বৈষ্ণবাপরাধ কিছু ঘটিয়াছে। প্রকৃত শ্রদ্ধা হইলে—সে শ্রদ্ধার চ্যুতি হয় না। শ্রদ্ধা যদি কোমল হয়, তাহা হইলে নিজস্বার্থে আঘাত পড়িলে গুরু-বৈষ্ণবে বিশ্বাস প্রায়-সময়ই থাকে না। শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহাতে বা তাঁহার বাণীতে অর্থাৎ আদেশ ও উপদেশ পালনে আদরও থাকে না। বিশ্রম্ভভাব না জাগিলে সেবাবুদ্ধি উদিত হয় না। মমত্ববোধ যেখানে নাই, সেখানে সেবা করিবার প্রেরণা থাকিতেই পারে না। কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি বৈষ্ণবের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারেন। শাস্ত্র বা মহাজন-মুখে বৈষ্ণবসেবার কথা শ্রবণ

করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিবশে তিনি সহযোগিতা করিবার যে চেষ্টাটুকু করেন, শ্রদ্ধার অভাবে অনাদর উপস্থিত হইলে সেই সহযোগিতা করিবার প্রবৃত্তিও আর থাকে না। কখনও কখনও বাহিরের ঠাট বজায় থাকিলেও গুরুবৈষ্ণবে আদর না থাকায় তাঁহাদের আচরণ ও বাণীকে আমরা কিছুতেই অন্তর হইতে অনুমোদন করিতে পারি না। তখন সন্দেহ, বিরক্তি প্রভৃতি আসিয়া যায়। এইরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া কি সহযোগিতার ঠাট বজায় রাখা চলে! কাজেই দূরভবিষ্যতে অসহযোগিতা এবং পরে প্রতিযোগিতা বা বিরোধিতা করাই স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়।

বৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তির বিকাশ যেখানে যত বেশী দেখা যাইবে, সেখানে চেতনের বিকাশও ততটাই জানিতে হইবে। তেমনই আবার যেখানে বৈষ্ণববিরোধ দেখা যায় অর্থাৎ যেখানে গুরু-বৈষ্ণবের বাণী বা আচরণকে অনুমোদন পর্য্যন্ত করিতে না পারিয়া অসহযোগ অথবা তদপেক্ষা শোচনীয় অবস্থায় প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, সেখানে চেতনবৃত্তির সু-সুপ্তাবস্থা—পঙ্গু অবস্থা জানিতে হইবে। চেতনের আবৃতাবস্থা চরমদশায় উপনীত হইলে সে বৈষ্ণববিরোধে প্রবৃত্ত হয়।

"বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়"। কাজেই অত্যন্ত অজ্ঞ, মূর্খ, বদ্ধজীব সাধন-রাজ্যে প্রবেশের মুখে বৈষ্ণবের আচরণ বা বাণীতে দৃঢ়শ্রদ্ধা বা আদরও সকল সময় করিতে পারে না, তবুও যদি সে স্তব্ধ বা পতিত না হইয়া থাকে, যদি তাহার ভজন-প্রগতি থাকে তবে সে নিশ্চয়ই গুরুবৈষ্ণবের বাণী ও আচরণ অনুমোদন

করিবে বা অন্তর হইতে অনুমোদন করিবার জন্য সর্ব্বদা ইচ্ছা বিশিষ্ট থাকিবে, সংশয়, বিরক্তি বা বিরোধ প্রকাশ করিতে পারিবে না। আমাদের ভজনের প্রগতির পরিমাপ অর্থাৎ আমরা অগ্রসর হইতেছি কি না, কতদূর অগ্রসর হইলাম অথবা স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছি কি না, কিম্বা বিপরীত গতি লাভ করিলাম কি না, ইহা জানিতে পারি—বৈষ্ণবের প্রতি আমাদের চিত্তবৃত্তি দেখিয়া। গুরুবৈষ্ণবের বাণী ও আচরণে অনুমোদন, আদর অথবা বিশ্বাস আমার আছে কি না অথবা উদিত হইতেছে কি না, বিচার করিলেই আমার ভজনগতি বুঝা যাইবে। যিনি সর্ব্বক্ষণ আদর করিতে না পারিলেও গুরু-বৈষ্ণবের বাণী ও আচরণ অনুমোদন করিতেছেন (অবশ্য দায় ঠেকিয়া বাহ্য অনুমোদন নহে) তাঁহার মধ্যে গুরু-বৈষ্ণবের সহিত adjust করিবার একটা চেষ্টা রহিয়াছে। ভাগ্য ভাল থাকিলে adjusted হইয়া যাইতে পারেন। Adjusted হইতে পারিলে তখন আর ভয় নাই, কারণ তখন স্বজাতীয়াশয় বিশ্রম্ভভাব আসিয়া যায়।

১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রবণসদনে ইষ্টগোষ্ঠী-সভায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের "প্রাত্যহিক Progressএর একটা Tangible result চাই" এই বাণীটি কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তখন কোন শ্রোতা প্রশ্ন করেন,—"এই Tangible result টি কি ও তাহা কি করিয়া বুঝা যায় ?" তাহার উত্তরে শ্রীল ভক্তিসুধাকরপ্রভু বলেন, "গুরু-বৈষ্ণবের personalityর প্রতি আমার একটা personal

attachment যদি ক্রমশঃ বাড়িতে দেখা যায়, তবেই tangible result পাওয়া গেল। টানটা ব্যক্তিগত জিনিষ। শ্রীল আচার্য্য-দেব এত বড় মিশনের Controlling Authority অথবা তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা, ধীশক্তি, বিচার-নৈপুণ্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব দশজনের আদরের বিষয় জানিয়া আমিও সেই দশজনের একজন হইয়া যদি আচার্য্যদেবের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি, তাহা দ্বারা অধিক ফল হইবে না। যদি সমস্ত জগৎ তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যদি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ গুণসমূহের বাহ্য প্রকাশকে তিনি সংগোপন করেন, যদি মিশনের সহিত তিনি বাহ্য-নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করেন অথবা মিশনের বাহ্য অঙ্গ তাঁহার আনুগত্য করিতে না পারে তবুও তাঁহার প্রতি যদি ব্যক্তিগত টান থাকে, আমি তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছি। সেখানে আমার চিত্ত ও তাঁহার পাদপদ্ম-ব্যতীত তৃতীয় বস্তুর অপেক্ষা নাই। সেবা করিলেই বুঝা যায়। আমি খাইয়াছি কি না, তাহা খাইলেই ঠিক বুঝিব। তবে সেবার মত অত বড় কথা বলিতে চাই না; আমি কেবলমাত্র এইটুকু বলি যে, এ জীবনটা যাহাতে বৈষ্ণবাপরাধ না করিয়া কাটাইয়া যাইতে পারি, এই চেষ্টাটাই করি।” তখন আর একজন প্রশ্ন করিলেন,—“কি ভাবে চলিলে আমরা বৈষ্ণবাপরাধের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি?” তাহার উত্তরে শ্রীল ভক্তিসুধা-করপ্রভু বলিলেন,—“দেখুন, গ্রন্থ পড়িয়া বা বিচার করিয়া আমরা বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মুক্ত থাকিতে পারিব না। তবে যদি বৈষ্ণবে মমত্ববোধ হয়, তাহা হইলে সহজে আপনা হইতে অপরাধ করিবার

মত চিত্তবৃত্তি অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। অপরাধের মূলে থাকে মাৎসর্য্য। মমত্ব বা প্রীতি যেখানে নাই, সেখানেই মাৎসর্য্য। আপনার-জনের প্রতি মাৎসর্য্য আসে না।”

চেতনের গতিরেখাটি এক। যেখানে চেতনের পরিপূর্ণ বিকাশ, সেখানে বৈষ্ণব-সেবাপ্রবৃত্তি পূর্ণ প্রস্ফুটিত; যেখানে চেতন সম্পূর্ণ আবৃত—সেখানে বৈষ্ণবাপরাধ। একই গতিরেখার বিপরীত দুইটী সীমার ন্যায় সেবা ও অপরাধ। আমাদের চিত্ত বিচার করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, আমাদের গতি কোন্ দিকে। বৈষ্ণবসেবা বলিতে আমরা যেন আবার মনুষ্যবিশেষের সেবা না বুঝি। গৌরাঙ্গ হইতে যেমন গুরুকে পৃথক্ করা যায় না, তেমনই গুরুদেবকে বৈষ্ণব হইতে পৃথক্ করা যায় না। শ্রীগুরুদেব বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। যদি আমাদের চিত্তবৃত্তি তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বৈষ্ণব-সেবায় উদ্বুদ্ধ না হয়, তবে বৈষ্ণবসেবা হইতে পারে না। আমাদের মূল সম্বন্ধ গুরুপাদপদ্মের সহিত। বৈষ্ণব তাঁহার প্রিয়জন, আর আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের অযোগ্য দাসাভাস, এই সম্বন্ধ ঠিক রাখা দরকার। অযোগ্য হইলেও আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলি—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত আমার সম্বন্ধ আছে. এ অভিমান আমার থাকিবে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধ যদি না থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য বৈষ্ণবে অমল শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না; কারণ, আমাদের মূল সম্বন্ধ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত। মূলে ভুল হলে সমস্তই ভুল হইয়া যায়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর

সন্তান-নামধারী অথবা শিষ্যব্রুব, যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মানে নাই অথচ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে অত্যন্ত আদর (?) প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাদিগকে শ্রীঅদ্বৈতের গণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কারণ তাহারা মূলবস্তুতে শ্রদ্ধাহীন। মূল কাটিয়া শাখার আদর করিলে কি হইবে? শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ উপদেশ করিয়াছেন,— "শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞয়া তৎসেবনাবিরোধেন চ অন্যেষামপি বৈষ্ণবানাং পূজনং শ্রেয়ঃ।" (ভঃ সঃ ২৩৮ অনুঃ)। আমার জীবাতু শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের প্রিয় যাঁহারা, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রতি প্রচুরভাবে মমত্ববোধ আসে। গুরুপাদপদ্মে প্রীতি থাকিলে ইহার অন্যথা হয় না। যদি গুরুপাদপদ্মে প্রীতি দেখা যায়, অথচ তাঁহার প্রিয় বৈষ্ণবগণের প্রতি সেবাপ্রবৃত্তির উন্মেষ দেখা না যায়, তবে শ্রীগুরুদেবে কেবলমাত্র প্রীতির অভিনয় হইয়াছে, উহার মূলে দম্ভ, মাৎসর্য্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি আছে জানিতে হইবে। তেমনই যদি কোন বৈষ্ণবে প্রীতি, শ্রদ্ধা বা আদর আছে, অথচ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে প্রীতিহীন দেখা যায়, সেখানেও অন্যাভিলাষ এবং ইতরাভিসন্ধি আছে, ইহা ধ্রুবসত্য।

বৈষ্ণবের সন্তোষবিধানই বৈষ্ণব সেবা। নিজের হাতের মুঠায় বৈষ্ণবকে রাখিতে যাইতে হইবে না। বৈষ্ণব শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের বৈভব—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্তোষেই শ্রীবৈষ্ণববৃন্দ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। আমার বৈষ্ণবসেবা-দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্তোষ-বিধান হইতেছে কি না, এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। নতুবা শুনিয়াছি বৈষ্ণব-সেবা করিতে হয়, অতএব কাহারও

পরিচর্য্যা, আদেশ-পালন অথবা সেবাসাহায্য করিতে নিযুক্ত হইয়া অন্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় করিয়া যাইতেছি, এরূপ করিলেও হইবে না। কিম্বা বিচারের নামে বৈষ্ণব-ছিদ্রান্বেষী, বৈষ্ণবাজ্ঞা-হেলনকারী দাম্ভিক বা সববুঝ্‌দার হইয়া "আমি ত' বৈষ্ণব' অভিমানে নিরয়গামীও হইতে হইবে না। প্রতি পদবিক্ষেপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্তোষ-বিধান হইতেছে কি না? শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সমচিত্ত হইলেই পূর্ণভাবে তাঁহার সন্তোষ-বিধান সম্ভব এবং যথাযোগ্য বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার হয়। সমচিত্তই বিশ্রম্ভ সেবক। সেবক যদি অকুটিল হয়, তাহা হইলে কোমলশ্রদ্ধ অবস্থায় শ্রীগুরুকৃপাই তাহার বৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তিকে রক্ষা করে। তাহার নিম্নাধিকারজনিত অজ্ঞতা শ্রীগুরুকৃপাবলের জন্য তাহাকে বিশেষ বাধা দিতে পারে না। কিন্তু অকুটিলের লক্ষণই এই যে, শ্রীগুরুকৃপায় তাহার অজ্ঞতা বেশী দিন থাকে না। কারণ, গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা আত্মার সহজবৃত্তি। সরল হইলে শ্রীগুরুকৃপাবলে শ্রদ্ধা পাইয়াও কি তাহা কোমল থাকিতে পারে? অচিরেই তাহা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকে। শ্রদ্ধা দৃঢ় হইলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সমচিত্ত হওয়ায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের সজাতীয়াশয় বৈষ্ণববৃন্দের বিষয়ে তাহার অজ্ঞতা আর কি করিয়া থাকিবে! আগেই আমরা বলিয়াছি যে, সমচিত্তই বিশ্রম্ভ সেবক। বিশ্রম্ভ-সেবাপ্রবৃত্তি গাঢ় প্রীতিতে পর্য্যবসিত হয়। প্রীতির স্বভাবই এই যে, প্রীতির পাত্রের সামান্য আনুকূল্য যেখানে দেখা যায়—সম্বন্ধের গন্ধলেশ যেখানে দেখা যায়, সেখানেই প্রীতির উদয় হয়। কাজেই

গুরুপাদপদ্মে প্রীতি হইলে বৈষ্ণবে যে প্রচুর প্রীতি বা মমত্বের উদয় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের চিত্তের দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। শ্রদ্ধা দৃঢ় হইলেই অর্থাৎ মমত্ববোধ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই মঙ্গল, নতুবা কোমলশ্রদ্ধা বেশী দিন থাকে না—অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। শ্রদ্ধাহীন—আদরহীন হইয়া পড়িলে বৈষ্ণবের আচরণের অনুমোদন করা যায় না; কারণ, শ্রদ্ধাহীন নিজেকে adjust করিতে চায় না। সেখানে তাহার স্বার্থ আর গুরুবৈষ্ণবের স্বার্থ পৃথক্ এবং বিপরীতমুখী হইয়া পড়ে। কাজেই শেষে অসহযোগিতা বা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া যায়।

বৈষ্ণবের নিকট হইতে যত দূরে সরিয়া যাই না কেন, 'পলাইতে ত' পথ নাই'—পিছনে আমাদের যে শাস্তা আছেন, তিনিও বৈষ্ণবমহাজন। তবে আমাদের সম্মুখে অবতীর্ণ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ যে তাঁহাদের কৃপাসিন্ধুরূপ প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা আর করিবেন না। বৈষ্ণবের নিকট হইতে দূরে যাইবার আমাদের উপায় নাই। ব্রহ্মা, শিব ও শাস্তা যম সকলেই বৈষ্ণব-মহাজন। কাজেই গুরুবৈষ্ণব ছাড়িয়া যাইব কোথায়? তবুও এমনই দুর্দ্দৈব যে, আমাকে তারিতে যে গুরুবৈষ্ণবের অবতার, তাহাতে শ্রদ্ধাহীন হওয়ায় বৈষ্ণব-শাসনে থাকিয়াও বৈষ্ণবী কৃপা লাভ হইল না—বিমুখের দণ্ড লাভ করিয়াই জন্ম-জন্মান্তর কাটিয়া যাইতেছে। যথেষ্ট ত' হইয়াছে, এবারকার মত গুরুবৈষ্ণবের শাসনের কাছে যে মাথাটা পাতিয়া দিয়াছি, উহাকে আর কোনক্রমেই ফিরাইব না; তাহা হইলে বৈষ্ণব-সেবালাভ একদিন হইবেই হইবে।

ভূতদ্বেষ ও ভূতনিন্দা

ভূত বা প্রাণীর প্রতি অবজ্ঞা, দ্বেষ, তাহাদিগকে উদ্বেগদান তাহাদের হিংসা ও নিন্দা অতিশয় ভক্তিহানিকর। ভূতনাথ বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ শ্রীশিব ও প্রজাপতি ব্রহ্মাদি দেবতার প্রতি বিদ্বেষ বা তাঁহাদিগের নিন্দা করা দূরে থাকুক. সাধারণ প্রাণীর প্রতি অবজ্ঞা দ্বেষ, হিংসা ও নিন্দা করিলেও ভক্তিরাজ্য হইতে পতন ঘটে যাহারা সাধারণ প্রাণিজগৎকেও অবজ্ঞা করে, তাহাদিগের প্রতি দ্বেষ ও হিংসা করে, সর্ব্বভূতান্তর্যামী শ্রীহরি সেইসকল ব্যক্তির পূজা, বন্দনা প্রভৃতি কিছুই গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণব-নিন্দার ন্যায় অপরাধ আর নাই। বৈষ্ণবগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, যিনি আত্মা-রামগণের গুরুবর্গেরও গুরুদেব, সেই শ্রীশিবের এবং যিনি জগতের পরমগুরু আদিদেব, সেই শ্রীব্রহ্মার নিন্দায় মহা-অপরাধ হয় বিষ্ণুব্যতীত অন্য দেবতার নিন্দায়ও ভক্তিরাজ্য হইতে পতন হয়। শ্রীহরি সকল দেবতাগণেরই ঈশ্বর। তিনি সদারাধ্য ; কিন্তু ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি অন্য দেবতা তজ্জন্য অবজ্ঞার পাত্র নহেন। তাঁহা-দিগকে শ্রীবিষ্ণুর সেবক বৈষ্ণব-বিচারেই বন্দনা করিতে হইবে; নতুবা অপরাধ হইবে, কোনও দিন হরিভক্তি-লাভ হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে,—

"শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।"

(ভাঃ ১১।৩।২৬)

অর্থাৎ শ্রীভাগবত-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা সংস্থাপন-পূর্ব্বক অন্যান্য শাস্ত্রের নিন্দা না করাই কর্ত্তব্য।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু গৌতমীয়-তন্ত্রের নিম্ন-লিখিত প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"গোপালং পূজয়েদ্‌যস্তু নিন্দয়েদন্যদেবতাম্।
অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মোঽপি নশ্যতি॥"

(১০৫ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ যিনি শ্রীগোপালের পূজা করেন অথচ অন্যদেবতার নিন্দা করেন, তাঁহার পরধর্ম্মলাভ দূরে থাকুক, পূর্ব্বধর্ম্মও বিনষ্ট হয়।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মের একটী ইতিহাস উদ্ধৃত হইয়াছে। পুরাকালে মহারাজ শ্রীঅম্বরীষ সুদীর্ঘকাল ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিলে শ্রীবিষ্ণু শ্রীঅম্বরীষকে পরীক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রের রূপ ধারণ করিয়া ও গরুড়কে ঐরাবত রূপ ধারণ করাইয়া স্বয়ং তদুপরি আরোহণপূর্ব্বক শ্রীঅম্বরীষ মহারাজকে বর-প্রদানার্থ আগমন করেন। শ্রীঅম্বরীষ ইন্দ্রকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে নমস্কার প্রভৃতির দ্বারা অভিনন্দন করেন। ইন্দ্রের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর অধিষ্ঠান আছে, সুতরাং তিনি নিজ প্রভুরই সেবক—এই বিচারে ইন্দ্রকে বৈষ্ণববর শ্রীঅম্বরীষ যথাবিহিত সম্মান করিলেন। কিন্তু যখন ইন্দ্ররূপী বিষ্ণু বর প্রদান করিতে চাহিলেন, তখন শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ বলিলেন,—'যিনি আমার আরাধ্য-মূর্ত্তি, তিনিই আমাকে বরদান করিবেন, অন্য কেহ আমার বরদাতা

নহেন।' তখন ইন্দ্ররূপী বিষ্ণু বলিলেন,—'তোমার আরাধ্য-মূর্ত্তির প্রদেয় বর আমিই তোমাকে দিতেছি'। তৎসত্ত্বেও শ্রীঅম্বরীষ কোন বর প্রার্থনা না করায়, ইন্দ্ররূপী শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতি বজ্র উত্তোলন করিলেন। তথাপি শ্রীঅম্বরীষ সেই বর-গ্রহণে স্বীকৃত না হওয়ায় ভগবান্ শ্রীঅম্বরীষের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহার ইন্দ্ররূপ তিরোহিত করিলেন ও স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করিয়া শ্রীঅম্বরীষকে অনুগ্রহ করিলেন। এইজন্যই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্যমেকান্তং ভাবমাশ্রিতঃ।
বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ ঐকান্তিকী ভক্তি আশ্রয় করিয়াও কেহ যদি শ্রীমহাদেবের নিন্দা করিয়া আমাকে (শ্রীবিষ্ণুকে) নিত্য পূজা করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই নরকে যাইবে।

এই সকল উক্তিদ্বারা শ্রীব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতাকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর সমান বা স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বলিয়া স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বলিয়া কল্পনারূপ পাষণ্ডিত্বের প্রশ্রয়-প্রদান করা হয় নাই। পরন্তু সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর সম্পর্কে **"তদীয়"** বিচারে শ্রীশিবাদির পূজা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ বিষ্ণু যেরূপ স্বতন্ত্র পরমেশ্বর, শ্রীব্রহ্মা-শিবও সেইরূপ স্বতন্ত্র ভগবান্ নহেন, তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ সেবক বলিয়া নিত্যারাধ্য।

শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

"শ্রীকপিলদেবেন সাধারণানামপি প্রাণিনামবমানাদিকং নিন্দিতং, কিমুত তদ্বিধানম্ ; তথা হি। (ভাঃ ৩।২৯।২১)

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ অনুচ্ছেদ)

শ্রীকপিলদেব, শ্রীশিবাদির ন্যায় শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের কথা দূরে থাকুক, সাধারণ প্রাণিগণেরও অবমাননাদিকে নিন্দা করিয়াছেন।

শ্রীকপিলদেব মাতা শ্রীদেবহূতিকে বলিতেছেন,—"আমি অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বদাই সর্ব্বভূতের (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদি প্রাণবৃত্তিহীন বা সুপ্তচেতন ভগবদ্বিমুখ জীব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণকারী বা উদ্বুদ্ধ অনাবৃত-চেতন জীবপর্য্যন্ত) অন্তরে অবস্থিত। যে-সকল মর্ত্ত্য মানব প্রাণিসমূহে আমার অধিষ্ঠান-দর্শনের অভাবে আমাকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক অর্থাৎ ঐ সকল প্রাণীর প্রতি অবজ্ঞার দ্বারা তাহাদের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়স্বরূপ আমাকেই অবজ্ঞা করিয়া আমার শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করে, তাহাদের ঐরূপ অর্চ্চনাদি বিড়ম্বনামাত্র।

পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন,—

"যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥"

(ভাঃ ৩।২৯।২২)

যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে অবস্থিত অন্তর্যামী পরমাত্মা ঈশ্বরস্বরূপ

আমাকে মূঢ়তাবশতঃ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ 'এই প্রতিমাটী প্রস্তরময়ী, কাষ্ঠময়ী'—এইরূপ মূঢ়বুদ্ধিপ্রযুক্ত সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান পরমাত্মা ঈশ্বরস্বরূপ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া—আমার সহিত আমার অর্চ্চামূর্ত্তির ঐক্যবুদ্ধি না করিয়া মদীয় অর্চ্চার বা প্রতিমার ভজন করে, কেবল লৌকিক রীতি ও দৃষ্টি অনুসারে সেই বিগ্রহকে জলাদি অর্পণ করে, সেই মূঢ় ব্যক্তির সর্ব্বভূতে আমার দর্শনাভাবহেতু সর্ব্বভূতের প্রতি অবজ্ঞারূপ দোষ ঘটিয়া থাকে। অতএব তাহার অর্চ্চামূর্ত্তির পূজাদি চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতিমাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্তের লক্ষণে বলা হইয়াছে যে, যে-ব্যক্তি লৌকিকী শ্রদ্ধার সহিত শ্রীভগবানের অর্চ্চা বা প্রতিমাতে পূজার চেষ্টা প্রদর্শন করে, অথচ শ্রীভগবদ্ভক্ত ও অন্য জীবকে বৈষ্ণবজ্ঞানে পূজা করে না, সেই ব্যক্তিই 'প্রাকৃত' বা 'কনিষ্ঠ ভক্ত' নামে কথিত। অতএব অর্চ্চনকার্য্যে কেবলমাত্র অবজ্ঞাকারী ব্যক্তিরই সত্বর ফললাভ হয় না, নতুবা পরমকারুণিক অর্চ্চাবতার স্থূলবুদ্ধি বদ্ধজীবকেও কৃপা করেন।

শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন,—

"দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতিঃ॥"

(ভাঃ ৩।২৯।২৩)

পরদেহে অন্তর্যামী ও আশ্রয়রূপে অবস্থিত আমার বিদ্বেষকারী, দেহে আত্মাভিমানী নিজে ও পরে জড়ীয়ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন (সর্ব্ববস্তুতে একই অন্তর্যামিমাত্র অবস্থিত, এইরূপ দৃষ্টিরহিত বলিয়া

প্রাণিগণের প্রতি বৈরভাবাপন্ন) এবং প্রাণিসকলের প্রতি শত্রুতাবদ্ধ ব্যক্তির মন কখনও শান্তিলাভ করে না। এস্থানে 'শান্তি'-শব্দে মনের ক্ষণিক আরাম বা তৃপ্তি নহে, পরন্তু ভববন্ধ-মোচন। শ্রীমহাভারতেও উক্ত হইয়াছে,—

"পিতেব পুত্রং করুণোদ্বেজয়তি যো জনম্।
বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশস্তস্য তূর্ণং প্রসীদতি॥"

অর্থাৎ কৃপালু পিতা যেরূপ পুত্রকে উৎপীড়ন করেন না, তদ্রূপ যিনি অন্য কোন ব্যক্তিকে উদ্বেগ প্রদান করেন না, সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির প্রতিই শ্রীহৃষীকেশ শীঘ্র প্রসন্ন হন।

শ্রীকপিলদেব মাতা শ্রীদেবহূতিকে আরও বলিয়াছেন,—

"অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥"

(ভাঃ ৩।২৯।২৪)

হে নিষ্পাপে, প্রাণিগণের অবজ্ঞাকারী ব্যক্তি উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট বস্তু ও তদুৎপন্ন অনুষ্ঠানসমূহের দ্বারা আমার প্রতিমার পূজা করিলেও তাহার পূজায় আমি তুষ্ট হই না।

তৃণগুল্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বতোভাবে শরণাগত জীব-পর্য্যন্ত কাহারও অপমান বা নিন্দা করিলে শ্রীকৃষ্ণ কোনদিনই সেইরূপ দাম্ভিকের পূজা গ্রহণ করেন না; কেন না, সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণই অধিষ্ঠিত আছেন। বাহিরে শ্রীহরির অর্চ্চন করিয়া প্রাণিগণের অন্তর্যামী শ্রীহরিকে যাহারা অবজ্ঞা করে, তাহারা শ্রীহরিরই বিদ্বেষী। প্রতি জীবের অন্তর্যামিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন

না করিলে কেবল ঘণ্টাবাদন বা উপচারাদি সংগ্রহের দ্বারা যে অর্চ্চনের ছলনা হয়, তাহাতে পরিশ্রমই সার হয়। যাহারা সর্ব্বভূতে আদর করিয়া সকলই শ্রীভগবানের দ্বারা চালিত,—এই বিচারে লোকপরম্পরাজাত শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন করেন, তাঁহারাই কনিষ্ঠ ভাগবত। আর সর্ব্বভূতে যাহার আদর নাই, সেরূপ ব্যক্তি যে অর্চ্চনাদি করে, তাহা ভণ্ডামীমাত্র।

শ্রীহরির অর্চ্চাবতারের অর্চ্চনাদির অভিনয় করিয়াও কোন কোন ব্যক্তির পরচর্চ্চা, পরনিন্দা, অন্য দেবতার নিন্দা, অপরের মঙ্গল করিবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা না করিয়া অর্থাৎ সদুদ্দেশ্যব্যতীত অপর সম্প্রদায়ের ব্যক্তির নিন্দায় প্রবল উৎসাহ ও রুচি দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ এরূপ ক্রূরপ্রকৃতি যে, অতিথি বা ক্ষুধাতুর ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া অন্নাদি যাচ্ঞা করিলে অত্যন্ত অসভ্য ভাষায়, কখনও বা অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া থাকে। কোন কোন 'বৈষ্ণব'-নামধারী গৃহস্থের দ্বারে কোন অতিথি বা ভিক্ষুক উপস্থিত হইলে 'গৃহস্থ'-নামধারিগণ বিত্তশাঠ্য করিবার অভিপ্রায়ে ঐ প্রার্থী ব্যক্তিদিগকে 'আউল, বাউল, নেড়ানেড়ী' প্রভৃতি বলিয়া বিতাড়িত করিয়া থাকে। উহাদিগকে কিছু দান করিলে ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, এই ছলনায় উহাদিগকে তিরস্কার, তাড়না, প্রহার প্রভৃতিও করিয়া থাকে। ইহারা নিজের বহির্ম্মুখ স্ত্রী-পুত্রাদির বহির্ম্মুখতাকে অনেক সময়েই নিন্দা করে না, নিজের ছিদ্রও দর্শন করে না, কিন্তু পরনিন্দায় উৎসাহী হইয়া দুঃসঙ্গবর্জ্জনের নামে ভূতবিদ্বেষ ও

ভূতনিন্দা করিয়া থাকে। ইহারা যদি শত শত উপচারের দ্বারাও শ্রীহরির অর্চ্চাবতারের পূজা করে, শ্রীহরি কখনও ঐসকল দাম্ভিক ভণ্ডের পূজা গ্রহণ করেন না।

ইহারা কোন কোন সময় বিত্তশাঠ্যকে প্রশ্রয় দিবার উদ্দেশ্যে ভক্তিযাজনের দোহাই দিয়া বলে যে, দীনদুঃখীকে দয়া করিলে বা প্রাণীর দৈহিক ও মানসিক তৃপ্তি-বিধান করিলে তাহাদিগকে কর্ম্মকাণ্ডী অথবা জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী অথবা জড়ভরতের হরিণ-শিশুর প্রতি আসক্তির ন্যায় অভক্তির কার্য্য হইয়া যাইবে! কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় স্বয়ং আচরণ করিয়া যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা কি অভক্তিমার্গ? শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই আচরণের কথা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"প্রভু সে পরমব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার॥
দুঃখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি'।
অন্ন, বস্ত্র, কড়িপাতি দেন গৌরহরি॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভুঘরে।
যা'র যেন যোগ্য, প্রভু দেন সবাকারে॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১১-১৩)

শুদ্ধভক্তিসাম্রাজ্যের অধিনায়ক শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর শিষ্যবর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন?

"স্বধর্ম্মপূর্ব্বকমর্চ্চনং কুর্ব্বংশ্চ ভূতদয়াং বিনা ন সিধ্যতীত্যাহ (ভাঃ ৩।২৯।২৬)—

"আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্ ।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্ ॥"

'অন্তরোদরম্' **উদরভেদেন ভেদং করোতি,** ন তু মদধিষ্ঠানত্বেনাত্মসমং পশ্যতি ; ততশ্চ **ক্ষুধিতাদিকমপি দৃষ্টবা স্বোদরাদিকমেব কেবলং বিভর্ত্তীত্যর্থঃ।** তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুরূপোঽহমুল্বণং ; ভয়ং সংসারম্ । নিগময়তি (ভাঃ ৩।২৯।২৭)

"অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানাং কৃতালয়ম্ ।
অর্চ্চয়েদ্দান-মানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥"

'অথ' অতো হেতোঃ ; যথাযুক্তং **যথাশক্তিদানেন** তদভাবে **মানেন চ।** অভিন্নেন চক্ষুষা ইতি পূর্ব্ববৎ। তথোক্তং সনকাদীন্ প্রতি বৈকুণ্ঠদেবেন "যে মে তনূর্দ্বিজবরান্ দুহতীর্ম্মদীয়া ভূতান্যলব্ধশরণানি চ ভেদবুদ্ধ্যা" (ভাঃ ৩।১৬।১০) ইত্যাদি ; যদ্বা, ভিন্নেন চক্ষুষান্যত্র যা দৃষ্টিস্ততোঽতিবিলক্ষণয়া দৃষ্ট্যা সর্ব্বোৎকৃষ্টদৃষ্ট্যেত্যর্থঃ।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ অনুচ্ছেদ)

স্বধর্ম্মপূর্ব্বক অর্চ্চনের অনুষ্ঠান করিলেও প্রাণিগণের প্রতি দয়াব্যতীত অর্চ্চন সিদ্ধ হয় না, এই অভিপ্রায়েই শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন,—'যে ব্যক্তি **নিজের ও পরের পৃথক্ পৃথক্ উদর বা দেহ আছে দেখিয়া** পরস্পরের মধ্যে **ভেদবুদ্ধি** করে, বস্তুতঃ আমার অধিষ্ঠানভূত অপরকে আত্মসম দর্শন করে না, সুতরাং **ক্ষুধিত ব্যক্তিকে দেখিয়াও সে ব্যক্তি কেবল নিজের উদরাদিই**

পোষণ করে, সেই ভেদদর্শনকারীর মৃত্যুরূপী হইয়া আমি নিদারুণ ভয় অর্থাৎ সংসার বিধান করিয়া থাকি।' এ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ কপিলদেব নিশ্চয়রূপে দেখাইতেছেন,— 'অতএব মিত্রভাবে অভেদ-দর্শনপূর্ব্বক অর্থাৎ সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে দান ও মানের দ্বারা পূজা করা কর্ত্তব্য। দুঃখিত প্রার্থীকে যথাশক্তি দান এবং দানের সামর্থ্যাভাবে তাহাদিগকে সম্মান করিতে হইবে।

শ্রীনারায়ণ সনকাদি মুনিগণকে জয়-বিজয়ের অপরাধের কথা কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, যাহারা ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী ও রক্ষকহীন প্রাণিসমূহ— আমার এই তিনটি শরীর অর্থাৎ অধিষ্ঠানকে আমা হইতে ভেদবুদ্ধিতে দর্শন করে, আমার প্রদত্ত অধিকার-লব্ধ দণ্ডধারী যমের ক্রুদ্ধ গৃধ্রাকার সর্পতুল্য দূতগণ চঞ্চুদ্বারা পাপনষ্টচক্ষু সেই ব্যক্তিগণের চক্ষুগুলিকে ছেদন করিয়া থাকে।

শ্রীভগবানের অর্চ্চনকারীর নিকট সাধারণভাবে সকল জীবই পূজা লাভ করিবার যোগ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলেও **সম্মানের তারতম্য বিচার** করিতে হইবে, অর্থাৎ যে স্থানে শ্রীভগবানের সেবাবৃত্তি যতটা অধিক পরিস্ফুট, সেইস্থানে তত অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। কারণ, ভগবদ্ভক্তের সকল কার্য্যই শ্রীভগবানের সম্পর্কে কৃত হয়। যাঁহার সহিত শ্রীভগবানের সম্পর্ক যতটা অধিক, তাঁহাকে ততটা অধিক সম্মান প্রদান করিলে প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীভগবানকেই সম্মান প্রদান করা হয়। এইজন্য শ্রীকপিলদেব প্রাণিগণের মধ্যে তারতম্য বিচার করিয়া মাতা

শ্রীদেবহূতিকে বলিতেছেন,—

"জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥
তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ ॥
রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাযস্ততো দ্বিপাৎ ॥
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।
ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ ॥
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মকৃৎ।
মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্ম্মমাত্মনঃ ॥
তস্মান্ময্যর্পিতাশেষ-ক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণঃ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ ॥"

(ভাঃ ৩।২৯।২৮-৩৩)

হে মঙ্গলদায়িনি মাতঃ, অচেতন পদার্থ অপেক্ষা জীব অর্থাৎ সচেতন পদার্থ—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা (শ্বাসাদি ক্রিয়াশীল) প্রাণবৃত্তিমান জঙ্গম পদার্থ—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা জ্ঞানবান্ পদার্থ—শ্রেষ্ঠ আর তদপেক্ষা ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট বৃক্ষাদি * — শ্রেষ্ঠ।

---

* বৃক্ষাদিতেও নিশ্চয়ই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ বর্ত্তমান; যথা মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে—"তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাঃ, তস্মাজ্জিঘ্রন্তি পাদপাঃ" অর্থাৎ 'তজ্জন্য বৃক্ষাদি স্থাবরগণও দেখিতে পায়, আঘ্রাণ পায়' ইত্যাদি।

স্পর্শ অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা অনুভবশীল বৃক্ষাদি অপেক্ষা রস অর্থাৎ জিহ্বেন্দ্রিয়দ্বারা অনুভবশীল মৎস্যাদি—শ্রেষ্ঠ ; তদপেক্ষা গন্ধ অর্থাৎ নাসিকেন্দ্রিয়দ্বারা অনুভবশীল ভ্রমরাদি—শ্রেষ্ঠ ; তদপেক্ষা শব্দ অর্থাৎ কর্ণেন্দ্রিয়দ্বারা অনুভবশীল সর্পাদি—শ্রেষ্ঠ।

সেই সর্পাদি অপেক্ষা রূপভেদবিৎ অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা বস্তুর রূপবৈশিষ্ট্যানুভবশীল কাকাদি পক্ষী—শ্রেষ্ঠ ; তদপেক্ষা উভয়দিকে (পংক্তিতে) দন্তযুক্ত (পাদহীন) জীব—শ্রেষ্ঠ ; তদপেক্ষা বহুপদ জীব—শ্রেষ্ঠ ; তদপেক্ষা চতুষ্পদ জীব (পশু)—শ্রেষ্ঠ ; তদপেক্ষা দ্বিপদ জীব (মনুষ্য)—শ্রেষ্ঠ।

মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ, তন্মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ—শ্রেষ্ঠ ; বেদজ্ঞ অপেক্ষা বেদার্থবিৎ—শ্রেষ্ঠ।

বেদার্থজ্ঞ অপেক্ষা সংশয়চ্ছেত্তা অর্থাৎ মীমাংসাকারী—শ্রেষ্ঠ ; মীমাংসাকারী অপেক্ষা স্বধর্ম্মানুষ্ঠানকারী—শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা মুক্তসঙ্গ (অর্থাৎ সঙ্গত্যাগী নিষ্কাম অনাসক্ত বিরক্ত জ্ঞানী)—শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাঁহার স্বকৃত-কর্ম্মফলাভিসন্ধি নাই।

এই জ্ঞানী অপেক্ষাও যে ব্যক্তি স্বকৃত কর্ম্ম বা নিজানুষ্ঠিত ধর্ম্ম হইতে ফলদোহন অর্থাৎ ভোগকামনা করেন না, যিনি জ্ঞানাদি ব্যবধানরহিত শুদ্ধভক্তিমান্, যিনি শ্রীভগবানে দেহাদি অর্পণ করায় নিজের ভরণপোষণাদিতে নিরপেক্ষ, যিনি ভক্তির বশে আপনাকে শ্রীভগবানের অধীন জানিয়া তৎপ্রতি অভিমানশূন্য, সর্ব্বভূতে আমার দর্শনহেতু সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সেই ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

জীব আর নাই।

শ্রীভগবানের অধিষ্ঠানের তুল্যতানিবন্ধন অর্থাৎ কৃমি পিপীলিকা, কুকুর, হস্তী, দুরাচার, পাপী—সকলের মধ্যে (আমার মধ্যে যেরূপ শ্রীভগবান্ আছেন, তাহাদের মধ্যেও সেই রূপই) শ্রীভগবান্ অধিষ্ঠিত আছেন, এইরূপ উপলব্ধি করিয়া নিজের ন্যায় পরেরও মঙ্গল অনুসন্ধানকেই শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি প্রভু '**সমদর্শন**' বলিয়াছেন। প্রত্যেক জীবের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইতে হইবে, নিজের ন্যায় তাহারও উপকার করিতে হইবে। তবে শ্রীভগবানের ভক্তকে অধিকভাবে আদর করিতে হইবে, কেন না, তাঁহাতে ভক্তিবৃত্তি বা ভগবৎসম্পর্ক অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। অন্য জীবের প্রতি যোগ্যতানুসারে যথাশক্তি আদর করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই অন্তর্যামী ঈশ্বররূপে জীবহৃদয় পরিদর্শনপূর্ব্বক প্রবিষ্ট আছেন, ইহা জানিয়া সকল প্রাণীকেই মনে মনে বহুমানপুরঃসর প্রণাম করিবে, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিলদেবের বাণী।

"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥"

(ভাঃ ৩।২৯।৩৪)

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীউদ্ধব-গীতাতেও শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিতেছেন,—

"বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্॥" (ভাঃ ১১।২৯।১৬

অর্থাৎ, উপহাসকারী সহচরগণ, দেহ-বিষয়ে উচ্চনীচদৃষ্টি ও লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক কুক্কুর, চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভ পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবের দর্শনেই ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণত হইবে।

"ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি'।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি'॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম—সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্ম-ধ্বজী, যার ইথে নাহি রতি॥"

(চৈঃ ভাঃ অ: ২।২৮।২৯)

যাঁহারা প্রাথমিক উপাসক অর্থাৎ লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অর্চ্চন করেন, তাঁহারা সর্ব্বভূতে আদর অবশ্য করিবেন। ইহা তাঁহাদের পক্ষে বিধি। এই বিধি-লঙ্ঘনে তাঁহাদের কোনদিনই মঙ্গল হইবে না। কিন্তু যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ সাধক, তাঁহাদের সর্ব্বত্রই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর বৈভব স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে বলিয়া সর্ব্ব-ভূতের প্রতি আদর তাঁহাদের স্বতঃই সিদ্ধ হয়। যাঁহাদের সর্ব্বত্র ইষ্টস্ফূর্ত্তি, সকল বস্তুকেই যাঁহারা শ্রীভগবানের সম্পর্কে দর্শন করেন, শ্রীইষ্টদেবের সেবোপকরণ বলিয়া জানেন, সকল বস্তুকেই তাঁহারা গুরুজ্ঞানে সম্মান করেন।

স্কন্দপুরাণে শ্রীনারদের কৃপাপ্রাপ্ত এক ভক্ত-ব্যাধের প্রসঙ্গ আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদেও ঐ প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হইয়াছে। এক সময় শ্রীনারদ ত্রিবেণী-স্নানার্থ প্রয়াগে গমন করিয়াছিলেন। বনপথে আসিতে আসিতে তিনি কয়েকটি বাণবিদ্ধ মৃগ, শূকর ও শশককে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় যন্ত্রণায়

অস্থির দেখিতে পান। ইহারই কিছু দূরে একটি ব্যাধ শিকারের প্রতীক্ষায় ধনুর্ব্বাণহস্তে কতিপয় পশুর প্রতি লক্ষ্যস্থাপন করিয়া লুক্কায়িতভাবে অবস্থিত ছিল। ইহা দেখিয়া শ্রীনারদ নিজের নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া ঐ ব্যাধের নিকট উপস্থিত হইলে ব্যাধ শ্রীনারদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অভিযোগ করে যে, শ্রীনারদ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করায় পশুগুলি তাঁহাকে দেখিয়া পলাইয়া গিয়াছে। শ্রীনারদ ব্যাধকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পশুগুলিকে রাখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্যাধ বলিল যে, সে তাহার পিতার নিকট হইতে ঐরূপ শিক্ষা করিয়াছে; পশুগুলিকে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখিলে তাহার হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ হয়। ইহা শুনিয়া শ্রীনারদ ব্যাধের নিকট একটি ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। সন্ন্যাসীর মুখে ভিক্ষার কথা শুনিয়া ব্যাধ শ্রীনারদকে মৃগ ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম প্রদান করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু শ্রীনারদ বলিলেন,— "আমি অন্য কিছু চাহি না। কেবলমাত্র এই ভিক্ষা চাহি যে, তুমি এখন হইতে একেবারেই পশুকে মারিয়া ফেলিবে, উহাকে অর্দ্ধমৃত করিয়া রাখিবে না; কারণ, ব্যাধ হইয়া প্রাণিহত্যা করা অল্প অপরাধ, কিন্তু উহাকে দীর্ঘকাল যন্ত্রণা দিয়া বধ করা মহা-অপরাধ। তোমাকেও জন্মজন্মান্তর ঐরূপ যন্ত্রণা পাইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হইবে।" ব্যাধ বলিল,—"আমি বাল্যকাল হইতেই এইরূপ যন্ত্রণা দিয়া পশুহত্যা করিয়া আসিতেছি। তাহা হইলে আমার ত' অসংখ্য জন্ম এইরূপ যন্ত্রণা পাইয়া মরিতে হইবে! ইহার উপায় কি? আমাকে আপনি উদ্ধার করুন।"

শ্রীনারদ বলিলেন,—"যদি আমার কথা শুন, তাহা হইলে আমি তোমাকে উদ্ধার করিব। তুমি এখনই তোমার ধনুক ভাঙ্গিয়া ফেল।" ব্যাধ বলিল,—"ধনুক ভাঙ্গিলে আমি কি খাইয়া বাঁচিব, কোথায় অর্থ পাইব?" শ্রীনারদ বলিলেন,—"আমি তোমাকে প্রত্যহ আহার প্রদান করিব। আহারের জন্য তোমাকে বিন্দুমাত্রও ভাবিতে হইবে না। তোমার যত কিছু ধন আছে, সমস্ত ব্রাহ্মণকে দান কর! পাপার্জ্জিত অর্থ ভোগ করিলে কোনদিন তোমার পাপ কাটিবে না। তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়ে কেবলমাত্র এক এক খণ্ড বস্ত্র পরিধান করিয়া ঘরের বাহির হও এবং নদীর তীরে একটী কুটির বাঁধিয়া তৎসম্মুখে একটী তুলসী-বেদী রচনা করিয়া প্রত্যহ শ্রীতুলসীর পরিক্রমা ও শ্রীতুলসীর সেবা এবং সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তন করিতে থাক। আমি তোমাকে প্রত্যহ বহু অন্ন পাঠাইয়া দিব।" শ্রীনারদের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া ব্যাধের চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ নির্ম্মল ও শ্রীহরিনামে রতি হইল। ব্যাধ বৈষ্ণব হইয়াছে, ইহা গ্রামের চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হওয়ায় গ্রামের সমস্ত লোক ব্যাধকে প্রচুর ভোজ্যসামগ্রী আনিয়া দিতে লাগিল। ব্যাধ কেবলমাত্র দুইজনের ভোজনোপযোগী অন্ন গ্রহণ করিয়া সমস্ত বিতরণ করিয়া দিত। ইহার কিছুদিন পরে একদিন শ্রীনারদ পর্ব্বত-মুনিকে সঙ্গে করিয়া উক্ত ভক্তব্যাধের আচরণ দেখিবার জন্য ব্যাধের সমীপে গমন করিলেন। ব্যাধ শ্রীগুরুদেবকে দূর হইতে দর্শন করিয়া অতিশয় ব্যস্ততার সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণত হইবার জন্য ধাবিত হইল। দণ্ডবৎপ্রণাম করিবার স্থানে

পিপীলিকাসমূহ বিচরণ করিতেছে দেখিয়া উহাদিগকে কোনরূপে হিংসা না করিয়া, বস্ত্রদ্বারা ঐ স্থান ভাল করিয়া ঝাড়িয়া শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। শ্রীনারদ ভক্তব্যাধের ঐরূপ আচরণ দেখিয়া শিষ্যকে বলিলেন,—

"এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥"

অর্থাৎ হে ব্যাধ, তোমার এই অহিংসাদি গুণসমূহ কিছুই অদ্ভুত নহে; কারণ, যাঁহারা হরিভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা কখনও পরপীড়ক হন না।

ভক্ত ব্যাধ শ্রীগুরুদেব ও তৎসঙ্গী শ্রীবৈষ্ণবঠাকুরকে ভক্তির সহিত আসনাদি প্রদান করিয়া উভয়ের পদ-প্রক্ষালন করিলেন ও সহধর্ম্মিণীর সহিত সেই চরণামৃত পান করিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম গান করিতে করিতে উর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ও কৃষ্ণপ্রেমে পুলকিত হইলেন।

যাঁহারা ভগবৎপ্রেমিক তাঁহাদের সর্ব্বত্রই বিষ্ণুর বৈভব দর্শন হয় বলিয়া স্বতঃই সর্ব্বভূতের প্রতি আদর দৃষ্ট হয়।

"যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা
ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমন্ত্যং
যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্ম্মঃ॥"

(ভাঃ ১।১৮।২২)

অর্থাৎ 'বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যখন শ্রীভগবানে অনুরক্ত হইয়া

সহসা দেহাভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাধনের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত পরম-হংসাবস্থা লাভ করেন, তখন অহিংসা (নির্ম্মৎসরতা) ও উপরমই (নিবৃত্তিই) তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয়।' এই বাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধসখ্যাদি-ভাবাশ্রিত সাধকগণেরও সখ্যভাবে নিত্যসিদ্ধ শ্রীগোকুলবাসিগণের স্বভাব ও তাদৃশ ভগবদ্‌গুণের অনুসরণদ্বারাই প্রাণিগণের প্রতি আদর প্রকাশিত হয়। কিন্তু অহিংসা ও বৈরাগ্য জাতরতি ভক্তগণের স্বকীয় স্বভাব।

প্রেমিক ভক্তগণ যে গো-সেবা করেন, তাহা কর্ম্মকাণ্ডীর গো-সেবার ন্যায় নহে। শ্রীকৃষ্ণের গোধন, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের সম্ভার, শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য গাভীগণ দুগ্ধ দান করেন, গো-সমূহ শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার সঙ্গী, শ্রীব্রজবাসিগণের প্রিয়, শ্রীব্রজবাসিগণের চিত্তবৃত্তির অনুসরণেই তাঁহাদের গো-সেবা প্রভৃতিতে চিত্ত ধাবিত হয়। অন্যান্য ইতর প্রাণী, তৃণ-গুল্ম-লতা প্রভৃতিকেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবার উপকরণরূপেই আদর করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অবৈদিক মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের ন্যায় অথবা বৈদিকব্রুব ফলকামী কর্ম্মকাণ্ডীর ন্যায়, কিংবা আধুনিক চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম (?) করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর॥' —প্রভৃতি উক্তির ন্যায় বিচার শুদ্ধভক্তগণের আদর্শে দৃষ্ট হয় না। বেদনিন্দক বৌদ্ধ-জৈনাদি ব্যক্তিগণ শ্রীভগবৎসম্পর্ক-রহিত দেহের ও মনের তৃপ্তিবিধায়ক অহিংসাকে যে "পরম-ধর্ম্ম" মনে করে, চিজ্জড়সমন্বয়বাদী যে প্রারব্ধ ভোগকারী বহির্ম্মুখ

জীবকে পরমেশ্বর বা প্রেমের বিষয় বস্তু মনে করে, তাহা প্রচ্ছ
নাস্তিকতা হইলেও পৃথিবীতে ঐরূপ চিত্তবৃত্তির লোকই শতক
প্রায় শতজন বর্ত্তমান বলিয়া গণগড্ডলিকার নিকট ঐরূপ নাস্তি
কতাই 'পরম-ধর্ম্ম' বলিয়া বিবেচিত হয়। বৈদিকব্রুব কর্ম্মকাণ্ডি
গণও দেহ ও মনের কোন তুচ্ছ ফল কামনা করিয়া অথবা নির্ভে
জ্ঞানিগণ অচ্যুতভাববর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্মের অনুসন্ধান করিয়া যে ভূতপূজা
করিয়া থাকে, তাহা নিছক অভক্তি বা নাস্তিকতা-ব্যতীত আ
কিছুই নহে। শুদ্ধভক্ত কখনও জীবকে পরমেশ্বর-জ্ঞানে ভূতাদ
করেন না। পরমেশ্বর ব্যতীত 'সেবা' ও 'প্রেম' শব্দ ইতর-বস্তুতে
প্রযুক্ত হয় না। মায়াবশযোগ্য জীব কখনও মায়াধীশ পরমেশ্বর
হইতে পারে না। "জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান"—
এই বিচারেই ভগবদ্ভক্ত ভূতাদর করিয়া থাকেন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামীপ্রভু এই সিদ্ধান্তই শ্রীভক্তিসন্দর্ভে
স্থাপন করিয়াছেন।

"ইত্যনুসারেণ পরমসিদ্ধানাঞ্চ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাব
মাত্মনঃ' (ভাঃ ১১।২।৪৭) ইত্যাদ্যনুসারেণ সিদ্ধ এব সঃ। অত
সাধকানাং যত্তু 'যথা তরোর্মূলনিষেচনেন' (ভাঃ ৪।৩১।১৪
ইত্যাদৌ তদান্যোপাসনানাং পুনরুক্তত্বমুপলভ্যতে, তৎ পুনঃ কেবল
স্বতন্ত্রতত্তদ্দৃষ্ট্যোপাসনানামেব। অত্র তু তত্তদধিষ্ঠানক-ভগবদুপাস
নমেব বিধীয়তে। তদাদরাবশ্যকত্বঞ্চ তৎসম্বন্ধেনৈব সম্পদ্যতে
তচ্চান্যত্র ঝটিতি রাগদ্বেষনিবৃত্ত্যর্থমিতি জ্ঞেয়ম্। অতএব কেবল
ভূতানুকম্পয়া শ্রীভগবদর্চ্চনং ত্যক্তবতো ভরতস্যান্তরায়ঃ। তস্মাদু

তদয়ৈব ভগবদ্‌ভক্তির্মুখ্যায় নার্চ্চনমিতি নিরস্তম্।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ অনুচ্ছেদ)

শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্ত হইয়া সহসা দেহাভিমান-পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহারা পরমহংসাবস্থা লাভ করেন, তাঁহাদের নিম্মৎসরতা ও সর্ব্বভূতে আদরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয়। এই বিচার অনুসারেই পরমসিদ্ধ পুরুষগণে সর্ব্বভূতের প্রতি আদর দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ যিনি সর্ব্বভূতে বহির্দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া আত্মায় চিদ্বিলাস শ্রীভগবানের আবির্ভাব ও আত্মস্বরূপ শ্রীহরিতে চিদ্বিলাসোপ-করণসমূহ দর্শন করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম। 'বৃক্ষের মূলদেশে জবসেচনের দ্বারা যেরূপ তাহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখাদি তৃপ্তি লাভ করে, তদ্রূপ অচ্যুত-সেবাতেই সর্ব্বভূতের পূজা হয়'—এই বিচারে পৃথগ্‌ভাবে অন্যান্য প্রাণীর প্রতি আদর করিবার প্রয়োজন কি,— এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীতে অন্তর্যামী ঈশ্বর-রূপে অধিষ্ঠানযুক্ত শ্রীভগবানেরই উপাসনা বিহিত হইতেছে এবং ভগবৎসম্বন্ধেই অর্থাৎ হরিসম্বন্ধি-বস্তুজ্ঞানেই সেইসকল প্রাণীর প্রতি আদর দৃষ্ট হইতেছে। নিজ-ব্যতীত অপরাপর প্রাণীতে শীঘ্রই যাহাতে রাগদ্বেষের নিবৃত্তি ঘটে, তন্নিমিত্তই সেইরূপ ভগবৎসম্বন্ধি-বস্তুজ্ঞানে প্রাণীর প্রতি আদরের বিধি জানিতে হইবে। অতএব শ্রীবিষ্ণুভক্তিব্যতীত কেবল কর্ম্মাদি-বাসনাময় ভূতদয়া বা ভূতাদর-বশে শ্রীভগবানের অর্চ্চন পরিত্যাগ করিলে যে ভীষণ দুর্গতি হয়, তাহা প্রেমিক ভক্তবর জড়ভরত হরিণদেহ লাভ করিবার অভিনয়ের দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। জড়ভরত মহাপ্রেমিক

ছিলেন। তাঁহার পতন বা ভগবৎপ্রাপ্তির অন্তরায় ঘটিতে পা
না. কিন্তু ভগবদ্ভক্তও যদি কেবলমাত্র প্রাণীর বহির্ম্মুখ দেহের প্র
আসক্তিনিবন্ধন বা কর্ম্মকাণ্ডীর বিচার অনুসরণ করিয়া কো
প্রাণীর দৈহিক ও মানসিক উপকারে ব্যস্ত হন ও তজ্জ
শ্রীভগবানের সেবা পরিত্যাগ করেন বা বহির্ম্মুখ জীবসেবা
অপ্রাকৃত শ্রীভগবৎসেবা বলিয়া কল্পনা করেন, তবে তাঁহারও বন্ধ
অনিবার্য্য। অতএব ভগবদ্ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া শুধু কর্ম্ম
কাণ্ডের অনুষ্ঠানরূপ যে জীবদুঃখকাতরতা (?) তাহাই শ্রেষ্ঠ, আ
ভগবদর্চ্চন মুখ্য নহে—এইরূপ বহির্ম্মুখ মতবাদ শ্রীভরতের আদ
খণ্ডিত হইয়াছে।

বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ সর্ব্বভূতে আ
প্রদর্শনের ছলনার সুযোগ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব আসক্তির বস্তু-সমূহ
অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র-দেহ-দ্রবিণ প্রভৃতির সেবাকে ভগবৎসম্বন্ধিনী সে
বলিয়া মনে মনে কল্পনা ও প্রচার করিয়া থাকে। নিজের পু
পৌত্রাদির সেবাকে 'গোপালের সেবা', ভোগ্যা যোষিতের সেবা
'লক্ষ্মীর সেবা', প্রাকৃত মাতাপিতার সেবাকে 'ভগবানের সেব
আর্ত্ত বা দরিদ্রের পরিচর্য্যাকে 'নারায়ণের-সেবা', উত্তমদ্রব্যা
ভোজন বা স্রক্চন্দনবনিতা-ভোগকে 'আত্মার-সেবা', নিজের ভো
বিষয়ের সেবাকে 'কৃষ্ণের বিষয়-সেবা' বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও প
বঞ্চনায় লিপ্ত হয়। ইহা ভূতাদর নহে। ভূতাদরের মধ্যে কো
রূপ ভোগ্য-বুদ্ধি নাই। সকল বস্তুতে শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্ক ও শ্রীকৃষ্ণ
অধিষ্ঠান দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞাপালন বা শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্প

ভূতাদরের মুখ্য তাৎপর্য্য। যে-স্থানে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণানুসন্ধান মুখ্য তাৎপর্য্য নহে, তাহাই ফলভোগপর কর্ম্মকাণ্ড, না হয় নিরীশ্বর জ্ঞানকাণ্ড। তাহা কখনও ভূতাদর-পদবাচ্য হইবে না। আবার জ্ঞান ও কর্ম্মকে নিন্দা করিয়া মিছাভক্তিপ্রদর্শনের ছলনায় উদর-ভেদ-দর্শন মূলে নিজের অপস্বার্থ সিদ্ধ করিবার চেষ্টাও আত্ম-মঙ্গলকারী চেষ্টা নহে।

শ্রীভগবান্ শ্রীকপিলদেব শ্রীদেবহূতিকে বলিয়াছেন,—

"নিষেবিতানিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা।
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ॥"

(ভাঃ ৩।২৯।১৫)

হে মাতঃ, শুদ্ধভক্তির সাধনসমূহ বলিতেছি, শ্রবণ কর; অতিহিংসারহিত হইয়া নিষ্কামভাবে পঞ্চরাত্রোক্ত পূজাবিধি অনুসারে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির চিত্ত বিশেষভাবে শুদ্ধ হয়; সেই শুদ্ধচিত্তে আমার গুণ শ্রবণ করিবামাত্র অনায়াসে তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন।

এইস্থানে 'অতিহিংসা' শব্দান্তর্গত অতি-দ্বারা পঞ্চরাত্রোক্ত অর্চ্চনরূপ উপাসনাক্রিয়ায় কিছু হিংসাও বিহিত হইয়াছে, জানা যায়। কারণ, পত্র-পুষ্পাদি-চয়নের মধ্যে হিংসা আছে। বৃক্ষের পত্রাদি ছেদন করিলে সচেতন বৃক্ষের ক্লেশ উপস্থিত হয়, পুষ্পাদির অন্তর্গত কীটাদিও বিনষ্ট হয়। এই হিংসা অনিবার্য্য।

যাহারা ভূতহিংসা-প্রশ্রয়দানে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাহারা শ্রীভগবদর্চ্চন-কারিগণকেও প্রাণিহিংসক বলিয়া অভিযোগ করে। অর্চ্চনকারিগণ

শ্রীভগবানের অর্চ্চনের জন্য পত্রপুষ্পাদি আহরণ করেন, কিংবা বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া যে শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্য প্রস্তুত করেন, তদ্দ্বারা অবৈষ্ণবগণের ন্যায়ই প্রাণিহিংসা সাধিত হয়, এইরূপ যুক্তিমূলক হেত্বাভাস অর্থাৎ "তুম্ ভি চুপ, হাম্ ভি চুপ", অথবা "তুমিও আমারই মত চোর, অতএব নিরস্ত হও।" —এই জাতীয় অভিসন্ধিমূলা যুক্তি ভূতহিংসকগণের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে বৈষ্ণবগণ বলেন, শ্রীভগবান্ সকল বস্তুরই একচ্ছত্র অধিকারী। তিনি তাঁহার সেবার জন্য যে-ভাবে, যে বস্তু নিয়োগ করিবার 'প্রভূপদেশ' প্রদান করিয়াছেন, জীব তাহাই পালন করিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারে। শ্রীভগবান্ সচ্ছাস্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অর্চ্চনে যে-যে বস্তু নৈবেদ্যরূপে আহরণ করিতে হইবে, তাহা জানাইয়াছেন। সুতরাং সেই সকল বস্তু শ্রীবিষ্ণুর সেবোপকরণরূপে আহরণ করিলে তদ্দ্বারা হিংসা হয় না। শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে হিংসা নাই। যাহারা শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টাকেও অন্য চেষ্টার সহিত সমান জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণসেবাচেষ্টাতেও হিংসা দর্শন করে, তাহারাই নির্ব্বিশেষবাদী বা জৈন-বৌদ্ধগণের ন্যায় আত্মহত্যা-ব্যতীত 'হিংসা' হইতে সাময়িক নিবৃত্তির আর কোন উপায় দেখিতে পায় না। কারণ, সমস্ত আহার্য্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া আবদ্ধগুহাস্থ বায়ুমাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক মুহূর্ত্তমাত্র জীবনধারণ করিলেও বায়ুর অন্তর্গত অসংখ্য কীটরাশির প্রতি হিংসা বিহিত হয়। অতএব কোনরূপ হিংসা না করিয়া কাহারও জীবনধারণ অসম্ভব। বৌদ্ধ ও জৈনগণ এজন্য আত্মহত্যাকেই প্রাণিহত্যারূপ

পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র রাজকীয় পথ বলিয়া হয় ত' কল্পনা করেন ! বস্তুতঃ আত্মহত্যা করিতে গেলেও দেহমধ্যস্থিত অনেক জীবের হিংসা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এইরূপ হিংসা ও অহিংসার বিচার সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে স্থান পায় না। এজন্য তাঁহারা শাস্ত্রাবতারের আদেশ শিরে ধারণ করিয়া শ্রীভগবদর্চ্চনোপযোগী যে পুষ্প-পত্র-চয়নাদি লক্ষণময়ী তথাকথিত হিংসা, তাহাকে হিংসা মনে করেন না। তাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের সামান্য চেষ্টাকেও—শুভাশুভ যাবতীয় কর্ম্মকেই হিংসা বলিয়া পরিত্যাগ করেন।

এস্থানে কোনও কোনও অবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লোক বলেন, তোমরা বৈষ্ণব হইয়া যেরূপ বিষ্ণুর নৈবেদ্যের জন্য পত্র, পুষ্প, 'ডাঁটা', 'ডগা' ছেদনকে হিংসা বলিতেছ না, আমরাও তদ্রূপ জগন্মাতার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ছাগ-মহিষাদি-বলিদানকেও শাস্ত্রানুসারেই হিংসা বলি না। তোমাদের বৈষ্ণবশাস্ত্র বিষ্ণুসেবার জন্য শাক-পত্র-ফল-মূলের ব্যবস্থা করিয়াছে, আমাদের শাক্তশাস্ত্র শক্তির সেবার জন্য ছাগ-মহিষাদির ব্যবস্থা করিয়াছে। অতএব যদি তোমাদের বেলা হিংসা না হয়, আমাদের বেলাও হিংসা হইবে না। আবার অহিন্দু-সম্প্রদায় হয় ত' শাক্তসম্প্রদায়কে বলিতে পারেন, তোমাদের যদি ছাগ-মহিষ-বলিদানে প্রাণিহিংসা না হয়, তবে গোহত্যাদিতে আমাদেরই বা হিংসা হইবে কেন ? এইরূপভাবে অশ্রৌতযুক্তিজাল অপস্বার্থপর জীবকে হিংসার আবর্ত্তে পাতিত করে।

শাস্ত্রের দোহাই দিলেই চরমসিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় না। শাস্ত্র-বতারই বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে তারতম্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তামসিক ও রাজসিক অধিকারিগণের জন্য যে-সকল শাস্ত্রের বিধান, তাহা চরমসিদ্ধান্ত নহে। নির্গুণ শাস্ত্রের বিধানই চরম-সিদ্ধান্ত। তামসিক ও রাজসিক ব্যক্তিগণকে ক্রমশঃ সাত্ত্বিক ও নির্গুণ অধিকারে উন্নীত করিবার জন্য শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদির ব্যবস্থা আছে। বস্তুতঃ যজ্ঞাদিতে পশুবধ বা মদ্যপানাদিই বিধি নহে। উহা ঐ সকল প্রবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করিবার জন্য কৌশল-বিশেষ। অতএব পশুবলি প্রভৃতি নিত্যধর্ম্মপদবাচ্য হইতে পারে না এবং তজ্জন্য পশুহিংসাও নির্গুণ অর্চ্চনবিধির সহিত সমকক্ষায় স্থাপিত হয় না।

বিধর্ম্মীর ধর্ম্ম-বিধান দূরে থাকুক, উপনিষদাদিতেও গবাদি পশুবধের বিধান আছে। উহা সার্ব্বজনীন বিধি বা নিত্যধর্ম্ম নহে। ঐ নজীর দেখাইয়া বেদশাস্ত্র-স্বীকারকারী সনাতন-ধর্ম্মা-বলম্বিগণ নিষিদ্ধ মাংসভোজনাদিকে বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানরূপে আদর করেন না। অত্যন্ত সকাম ও অসুর-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের জন্য যে নৈমিত্তিক ধর্ম্মের ব্যবস্থা, তাহা নিত্যধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মের অনু-শীলনকারিগণের ব্যবস্থা হইতে পারে না। আত্মধর্ম্মই সার্ব্ব-জনীন ধর্ম্ম। তাহাই নির্গুণা, বিশুদ্ধা ভক্তি। তাহা শ্রীকৃষ্ণে-ন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্যময়ী। অতএব তাহাতে সমস্ত ভূতের তৃপ্তি অনুস্যূত। এজন্যই উক্ত হইয়াছে, যেরূপ তরুর মূলে জলসেচনের দ্বারা উহার স্কন্ধ, শাখা ও উপশাখাদি তৃপ্তি লাভ করে, তদ্রূপ

অচ্যুতের পূজাতেই সর্ব্বভূতের তৃপ্তি হইয়া থাকে। এই দৃষ্টিতেই শুদ্ধবৈষ্ণবগণই সর্ব্বভূতের আদর করিয়া থাকেন।

"তস্মাদন্যেষামনাদরো ন, **কর্ত্তব্যস্তৎসম্বন্ধে নাদরাদিকঞ্চ কর্ত্তব্যম্**। স্বাতন্ত্র্যেণোপাসনন্তু ধিক্‌কৃতমিতি।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ অনুচ্ছেদ)

অতএব অন্যান্য প্রাণিসমূহের অনাদর কর্ত্তব্য নহে, বরং **ভগবৎসম্বন্ধে আদরই কর্ত্তব্য।** আর **স্বতন্ত্রভাবে অন্যান্য দেবতার বা প্রাণীর উপাসনাকে ধিক্‌কারই** দেওয়া হইয়াছে।

"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে"—ইহা চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম নিষেধ-লক্ষণ অঙ্গ। কিন্তু যেস্থানে শ্রীগুরুদেব বা শ্রীবৈষ্ণব শিষ্যের বা জীবের মঙ্গলবিধানের জন্য শাসন করেন, সুতীব্র বাক্যের দ্বারা সাধুগণ জীবের মনোব্যাসঙ্গ বা হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করেন, সেইস্থানে এই বিধি শ্রীগুরুদেব বা শ্রীবৈষ্ণবগণের উপর প্রয়োগ করিলে তাহা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা বলিয়াই পরিগণিত হইবে। প্রেয়ঃকামী সাধক বা অন্যাভিলাষী জীব যদি তাঁহার উপরে যে বিধি প্রযুক্ত হইবে, তাহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীগুরুদেব বা শ্রীবৈষ্ণবের উপর প্রয়োগ করিতে যান, তবে তাহা আত্মহত্যার চেষ্টায় পর্য্যবসিত হইবে। অনেক সময় অত্যন্ত বিষয়াসক্ত, চিরাভ্যস্ত পাপী ও দুরন্ত অপরাধী ব্যক্তিগণের মনে আঘাত না দিলে কিছুতেই তাহাদের বিষয়াসক্তির মূল ছিন্ন হয় না। তাহারা এতটা জড় ও অন্যমনস্ক যে, কেবলমাত্র সাধারণ উপদেশে তাহাদের হৃদয়ে কোনই স্পন্দন হয় না। এজন্য পরমকৃপাময়

সাধু ও শাস্ত্রাবতারসমূহ সুতীব্র ও শাণিত উক্তিরূপ খড়্গের দ্বা
মনের দুর্ব্বাসনা-গ্রন্থি বা অন্যাভিলাষসমূহকে ছেদন করিয়া থাকে।
তাঁহাদের এই কৃপাকে "ভূতোদ্বেগ" বলিয়া বিচার করিলে বঞ্চি
হইতে হইবে।

—:*:—

কি-ভাবে বাঁচিব ?

আমরা সকলেই স্বরূপতঃ শ্রীভগবদ্দাস ও অজরামর হইয়ে
অনাদি-বহির্ম্মুখতা-বশতঃ এই প্রপঞ্চ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হই
তপ্ত হইতেছি। এই বিশ্ব-কারাগারের চতুর্দ্দিকেই অনিবার্য্য মৃ
বহুরূপী রাক্ষসের মত মুখ-ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। আমরা
সকলেই মৃত্যু-রাক্ষসের অতৃপ্ত-বুভুক্ষার অপরিহার্য্য গ্রাস ও মহো
সব-সম্ভার। সূর্য্যের উদয় ও অস্তের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আ
হৃত হইতেছে। জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতে শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি—মৃত্যু
দিকে অভিযান ব্যতীত আর কিছু নহে। শুনা যাইতেছে, ব
দেশের সহস্র সহস্র নরনারী বুভুক্ষার নরমেধ-যজ্ঞে বলি হইতেছে
আবার পাশ্চাত্যদেশে ও সুদূর-প্রাচ্যেও কোটি কোটি নরনা
স্বেচ্ছাকৃত মৃত্যুর যূপকাষ্ঠ বরণ করিয়া লইতেছে। ইহাই যু
মানবের সমসাময়িক অবস্থা। কেবল যুগ-মানব নহে, বিশ্ব-মা
সর্ব্ব-যুগে সর্ব্বত্র এই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু-পথের যাত্রী। এইরূ

অপরিহার্য্য অবস্থা বা অবস্থানের মধ্যে আমরা নিক্ষিপ্ত হইয়াছি ! কেহ কেহ অত্যন্ত তামসিক বা রাজসিক উন্মাদনায় বিহ্বল ও প্রমত্ত হওয়ায় মৃত্যুর গ্রাসে অবস্থিত হইয়াও তদ্বিষয়ে অচেতন রহিয়াছে ! কেহ-বা-তপ্ত-লৌহে জলবিন্দুনিক্ষেপে ক্ষণিক-স্পন্দনের ন্যায় কেবল সাময়িকভাবে মৃত্যুর কথা ভাবিতেছে ! "শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্"— এই উক্তির মধ্যে মৃত্যুর করাল-গ্রাসে অবস্থিত থাকিয়াও বিশ্ব জীবের নিশ্চিন্তভাবকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য-ব্যাপাররূপে বর্ণন করা হইয়াছে। অশান্তি, ক্লেশ, তাপ, জ্বালা ও দুঃখের আগ্নেয়গিরির গহ্বরে থাকিয়া যে নিশ্চিন্ত-ভাব, তাহা পশুত্ব ও প্রস্তরত্ব হইতেও অধিক আবৃতাবস্থা বা অচেতনতা। কিন্তু, পরম-কারুণিক শ্রীবিশ্বম্ভর এইরূপ অবস্থা হইতে বিশ্বজীব কিরূপে বাঁচিতে পারিবে, কেবল বাঁচা নয়, কিরূপে বিশ্বাতীত বিশ্বম্ভর-প্রেমের সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইবে, কি-ভাবে প্রাকৃতের মধ্যে থাকিয়াও অপ্রাকৃতের সহিত মিলিত হইতে পারিবে, কিরূপে প্রপঞ্চে থাকিয়াও প্রপঞ্চাতীত বস্তুর বিলাসোপকরণ হইতে পারিবে, তাহার বাস্তব-সন্ধান প্রদান করিয়াছেন।

প্রপঞ্চে অবস্থিত বিশ্বজীব দুইটী প্রধান-ভাগে বিভক্ত— (১) শ্রদ্ধাহীন বা অশ্রদ্দধান ও (২) শ্রদ্ধালু বা সশ্রদ্ধ ; অপ্রাকৃতের প্রতি অশ্রদ্ধাই অনাদি-বহির্ম্মুখতার সৌধ-সংরক্ষণ করিবার সর্ব্বপ্রধান স্তম্ভ। যাহারা অশ্রদ্ধার প্রাকার উত্তোলন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে কৃত-সঙ্কল্প, মৃত্যু-পিশাচী চিরদিনের জন্য তাহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহাদের রক্ষা নাই, তাহারা মৃত্যুর

যূপকাষ্ঠে চিরদিন বলি হইয়া থাকিবার জন্যই প্রতিজ্ঞা
হইয়াছে। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির হৃদয় অস্বচ্ছ। অস্বচ্ছ বস্তুর ম
দিয়া বাস্তববস্তুর দর্শন হয় না। অস্বচ্ছতা-প্রাকার বা অশ্র
যাহার হৃদয়কে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, সেই ব্যক্তি অপ্রা
বস্তুর অন্তঃসাক্ষাৎকার বা বহিঃসাক্ষাৎকার কোনটিই প্রাপ্ত হই
পারে না। অস্বচ্ছহৃদয় ব্যক্তি চারি প্রকার—(১) বিষয়ী, (
শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবৎ-সেবকের প্রতি অবজ্ঞাকারী, (৩) অর্
বিশিষ্ট, (৪) বিদ্বেষী। এই চতুর্বিবধ অশ্রদ্ধালুর মধ্যে তারত
আছে। কাহারও অশ্রদ্ধার আবরণ কিছু অল্প স্থূল, কাহারও
অধিক স্থূল বা গাঢ়; কাহারও হৃদয়ে অশ্রদ্ধার ধূলিলে
কাহারও পঙ্কলেপ, কাহারও কাষ্ঠলেপ, কাহারও প্রস্তরলে
কাহারও বা বজ্রলেপ রহিয়াছে।

শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত—(১) লৌকি
শ্রদ্ধাযুক্ত ও (২) শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাযুক্ত। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি
পর্য্যন্ত স্থায়িভাব-রতিতে প্রতিষ্ঠিত হন নাই, অর্থাৎ যখন তি
অজাতপ্রেমা সাধক, তখন তিনি মুখ্য-কনিষ্ঠ। যখন তাঁহা
স্থায়িভাবের উদয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখনই তিনি জাতভ
অর্থাৎ মধ্যম মহাভাগবত। তাঁহাতে ভেদবুদ্ধি নাই; তিনি বি
গ্রহণ করিয়াও তাহাতে রাগদ্বেষহীন; তিনি যুক্তবৈরাগী অর্থ
'বিষয়সমূহ, সকলি মাধব'—এই মানসিক লক্ষণ তাঁহাতে প্রকা
পাইয়াছে। ইহার উন্নতাবস্থাই পরম-সিদ্ধাবস্থা বা উত্তমোত্ত
ভাগবতাবস্থা।

বিশ্বজীব বিশ্বের সহিত কিরূপে মিশিবে, কি-ভাবে মৃত্যুর করাল-গ্রাসের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও অমর হইতে পারিবে, প্রাকৃতের মধ্যে থাকিয়াও অপ্রাকৃতের সংস্পর্শ লাভ করিতে পারিবে, তাহা 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'য় শ্রীকৃষ্ণ বিধিমার্গীয় জনগণের জন্য শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অস্ফুটভাবে বলিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরি তাহাই অধিকতর স্ফুটপথে চিদ্‌বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাঁহার প্রিয়তম নিজজন শ্রীশ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর দ্বারা কীর্ত্তন করাইয়াছেন। যদিও শ্রীরূপের ঐ উক্তি দুইটী পূর্ণপ্রগ্রহ-বৃত্তিতে রাগমার্গের বিচার জ্ঞাপন করিতেছে, তথাপি তাহা বৈধী, সাধন-ভক্তির প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। 'মাত্রা' অর্থাৎ 'বিষয়' বা 'ইন্দ্রিয়-বৃত্তি'র সহিত থাকিয়াও তাহা হইতে অনাসক্ত থাকিবার কৌশল শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় ! শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ !
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥"
(শ্রীগীঃ ২।১৪-১৫)

হে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন ! ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং তাহাদের সহিত বিষয়সকলের সংযোগই শীত-উষ্ণ ও সুখ-দুঃখাদি প্রদান করিয়া থাকে ; কিন্তু তৎসমস্তই উৎপত্তি ও বিনাশ-শীল ; সুতরাং অনিত্য। অতএব হে ভারত ! তাহাদিগকে সহ্য কর।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এই-সকল মাত্রাস্পর্শ (বিষয়ের সহিত

ইন্দ্রিয়গণের সংযোগজনিত জ্ঞান) সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন যে ধী ব্যক্তিকে বিচলিত করিতে পারে না, তিনিই অমৃতত্ব-লাভের যোগ্য।

'মাত্রা'-শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—"মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ।" ইহাদিগের দ্বারা বিষয়-সকল মাপা বা জ্ঞাত হওয়া যায়। অর্থাৎ 'স্পর্শ'-শব্দের অর্থ—"বিষয়েষু সম্বন্ধঃ" বিষয়সমূহের সহিত সম্বন্ধ। বহির্ম্মুখ জীব মাত্রা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বৃত্তির স্পর্শ বা সম্বন্ধের দ্বারা বদ্ধ হইয়া পড়ে। করী (হস্তী) অতি বলবান্ হইলেও করিণীর (হস্তিনীর স্পর্শ-লালসায় জালে আবদ্ধ হয়। ইহাই বহির্ম্মুখ জীবের মাত্রা স্পর্শজনিত অবশ্যম্ভাবি ফল। সেই স্পর্শের কুফল হইতে ক্রমশ বাঁচিতে হইলে লৌকিকশ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি ও শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারে জগতের সহিত ব্যবহার করিবেন। লৌকিক শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির ব্যবহারের মধ্যে শ্রীভগবদধিষ্ঠান বা অন্তর্যামি দর্শনে সর্ব্বভূতে আদর থাকিবে ; আর শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির ব্যবহারের মধ্যে শ্রীভগবদ্বৈভব-দর্শন আরম্ভ হইবে।

পরমাত্ম-বৈভব-দর্শন ও ভগবদ্বৈভব-দর্শনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। পরতত্ত্বের স্পষ্টবিশেষাবির্ভাব—১) পরমাত্মা ও ২) শ্রীভগবান্। পরমাত্মার বৈভব—জীবশক্তি, আর শ্রীভগবদ্বৈভব—শ্রীস্বরূপশক্তি ও তাঁহার কায়ব্যূহ বা বিস্তৃতি-সমূহ। পরমাত্ম-বৈভব তটস্থশক্তি জীবগণ শ্রীবলদেব বা শ্রীসঙ্কর্ষণ-প্রকটিত এবং শ্রীকারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু-প্রকটিত ভেদে দ্বিবিধ। শ্রীবলদেব বা

সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত জীবই শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনস্থ ও পরব্যোমস্থ নিত্য-পার্ষদ জীব। তাঁহারা উপাস্যসেবায় রসিক, উপাস্য-সুখানুসন্ধান-কারী, সর্ব্বদা উন্মুখ, সর্ব্বদা স্বরূপার্থ বিশিষ্ট ও নিত্যমুক্ত ; তাঁহারা জীবশক্তিতে চিচ্ছক্তির বল লাভ করিয়া সর্ব্বদা বলবান্ ; অচিচ্ছক্তি মায়ার সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। আর, শ্রীকারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষ-প্রকটিত জীব নিত্যবদ্ধ, কেহ-বা সাধুর কৃপায় চিদনুশীলনোন্মুখ। 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু পরমাত্ম-বৈভব ও ভগবদ্-বৈভবের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"পরমাত্ম-বৈভবগণনে চ তত্তটস্থশক্তিরূপাণাং চিদেকরসা-নামপ্যনাদি-পরতত্ত্বজ্ঞান-সংসর্গাভাবময়-তদ্বৈমুখ্যলব্ধছিদ্রয়া তন্মায়য়া-বৃত-স্বরূপজ্ঞানানাং তয়ৈব সত্ত্বরজস্তমোময়ে জড়ে প্রধানে রচিতাত্ম-ভাবানাং জীবানাং সংসারদুঃখঞ্চ জ্ঞাপিতম্।" (শ্রীভঃ সঃ ১ অনুঃ)।

অর্থাৎ পরমাত্মার বৈভবগণনায় যে তটস্থশক্তিরূপ জীবসমূহ, তাহারা বস্তুতঃ সুখ ও আনন্দস্বরূপ হইয়াও পরতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের প্রাগভাবরূপ সংসর্গাভাবময় বৈমুখ্য ছিদ্রহেতু পরমাত্মার মায়ার দ্বারা স্ব স্বরূপের জ্ঞান-বিষয়ে আবৃত হইয়াছে এবং সেই মায়ার দ্বারাই সত্ত্বরজস্তমোময় এই জড়বিশ্বে আত্মবোধ করিয়া সংসার-দুঃখ লাভ করিতেছে।

এই পরমাত্ম-বৈভব বা তটস্থজীব-দর্শন হইতে শ্রীভগবদ্-দর্শন পৃথক্। কল্মাষপাদের সর্ব্বত্র তটস্থদর্শন বা জীবদর্শন হইয়াছিল।

ইহাই রাক্ষস দর্শন। ইহা দিব্যসূরিগণের দিব্য-দর্শন বা সর্ব্ব বিষ্ণু-দর্শন অর্থাৎ স্বরূপশক্তি-সমন্বিত শ্রীভগবদ্দর্শন নহে। বে সর্ব্বত্র শ্রীবিষ্ণুদর্শনের কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবী চক্ষুরাততম্।"

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধর্কস্যসিৎদ্ধনম্॥"

(শ্রীঈশোপনিষৎ, ১ম মন্ত্র)

শ্রীস্বরূপশক্তি-বিলাসী ঈশ অর্থাৎ প্রভুর দ্বারা আবাস্য অর্থা সম্যগ্‌রূপে পরিব্যাপ্ত অথবা ঈশা অর্থাৎ স্বরূপশক্তির আবাস্যরূ যে দর্শন, তাহাই শ্রীভগবদ্দর্শন বা দিব্যদর্শন। রাজা কল্মাষপা সর্ব্বত্র জীবদর্শন করিতে গিয়া জীবসমূহের আপাত রক্ষকে অভিনয় করিয়া পরে তাহাদেরই ভক্ষক হইয়াছিল; এজন্যই ইহা নাম 'রাক্ষস-দর্শন'। যুগমানবের সঙ্কেতধ্বনিটি (slogan) এই-

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

এইরূপ তথাকথিত জীবপ্রেম (?) বা সর্ব্বত্র জীবদর্শ করিয়াও যুগমানব জীবের ভক্ষক হইতেছে। কারণ, ভগবদ্দর্শ ব্যতীত জীবের নিজের বাঁচিবার ও অন্যকে বাঁচাইবার অন্য কো পথ নাই। সুদাসপুত্র রাজা সৌদাস কোন সময়ে মৃগয়া করিতে করিতে কোন এক রাক্ষসকে বধ করেন, ইহাতে উক্ত রাক্ষসে ভ্রাতা ভ্রাতৃবধ-প্রতীকারবাসনায় রাজা সৌদাসের অনিষ্ট-চিন্ত

করিয়া তাহার প্রাসাদে পাচকরূপে অবস্থান করিতে লাগিল। একদিন কুল গুরু বশিষ্ঠ রাজগৃহে আগমন করিলে উক্ত পাচকরূপী রাক্ষসটী বশিষ্ঠ মুনিকে নরমাংস রন্ধন-পূর্ব্বক প্রদান করে। যোগ-বিভূতিশালী বশিষ্ঠ দিব্যদৃষ্টিতে অভক্ষ্য-দ্রব্য পরিবেশিত হইতেছে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে 'নরমাংসভোজী রাক্ষস হও" বলিয়া রাজাকে অভিশাপ প্রদান করেন ; কিন্তু বশিষ্ঠ কিছুকাল পরে উক্ত কার্য্য রাক্ষসের, পরন্তু রাজার নহে—ইহা জানিতে পারেন। রাজা সৌদাস জলাঞ্জলি-গ্রহণপূর্ব্বক গুরু বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। ইহাতে রাজমহিষী মদয়ন্তী রাজাকে নিবারণ করেন। তখন রাজা সৌদাস দশদিক্, আকাশ, পৃথিবী **সকল স্থানই জীবময় দর্শন** করিয়া জীবগণের বিনাশ হইবে ভাবিয়া সেই মন্ত্রপূত জলাঞ্জলি নিজ-পদদ্বয়ে নিক্ষেপ করেন। ইহাতে সৌদাসের পদদ্বয় কাল্মষতা অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণতা-প্রাপ্ত হয় এবং তিনি বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস-ভাবাপন্ন হন। সৌদাস পত্নীরূপ মিত্রের বাক্য গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার অপর নাম 'মিত্রসহ' হয়। রাজা সৌদাসের সর্ব্বত্র জীবময় দর্শন-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উক্তি আছে,—

"বারিতো মদয়ন্ত্যাপো রুশতীঃ পাদয়োর্জহৌ।
দিশঃ খমবনীং **সর্ব্বং পশ্যন্ জীবময়ং** নৃপঃ॥"

(শ্রীভাঃ ৯।৯।২৪)

যে রাজা সৌদাস সর্ব্বত্র জীব দর্শন করিয়া জীবের অনিষ্টা-শঙ্কায় নিজ পদদ্বয়ে সেই অনিষ্ট বরণ করিয়াছিলেন, সেই

কল্মাষপাদই রাক্ষস-ভাবাপন্ন হইয়া অন্য এক বনবাসী ব্রাহ্মণ তাঁহার সাধ্বী পত্নীর মনোরঞ্জন-কার্য্য হইতে বলপ্রয়োগে গ্র করিয়া ব্যাঘ্রের পশুভক্ষণের ন্যায় ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিয়াছিলে অতএব জীবদর্শন ব্যাপারটী রাক্ষস-দর্শনমাত্র; তাহা মৃত্যুর নামান্তর। জীবদর্শনের দ্বারা মর-জগৎ অমৃতত্ব লাভ করিতে পা না। স্বরূপ-শক্তির অন্তর্গতরূপে যে দর্শন, যাহা ভগবদ্দর্শ বৈষ্ণবদর্শন বা তদীয়দর্শন, তদ্দ্বারাই জীব এই মরজগতে অবস্থা করিয়াও অমর হইতে পারে।

এই তদীয়-দর্শন বা বৈষ্ণব-দর্শন দুই প্রকার—(১) বিধিমা আনন্দনিধি শ্রীনারায়ণের সঙ্গে সম্বন্ধিতরূপে বিশ্বকে দর্শন। বিধি পথে এইরূপ তদীয়রূপে অর্থাৎ শ্রীভগবানের সহিত সম্পর্ক-যুক্তরূ দর্শন করিবার আগ্রহ থাকিলে জীব মরজগৎ হইতে অমৃতের যা হইতে পারে, প্রাকৃতের মধ্যে থাকিয়াও অপ্রাকৃতের সংস্পর্শ লা করিতে পারে। তখন, আর জড় আকার হইতে ভয় হয় না "আকারদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি। যথাহের্মনসঃ ক্ষো স্তথা তস্যাকৃতেরপি॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মাঃ ৮।২৫) অর্থাৎ 'যের সর্প দেখিলে মনে ভয় উপস্থিত হয়, তদ্রূপ উহার আকৃতি দেখিলে (অর্থাৎ রজ্জু-প্রভৃতি সর্পাকার বস্তু দর্শন করিলেও) মনে ভ উপস্থিত হইয়া থাকে। স্ত্রীগণের ও বিষয়িগণের আকার হইতে তদ্রূপ ভীত হইতে হইবে।' —সাধক জীবগণের জন্য এই সতর্কতাবাণী, তাহাতে কেবল নিষেধসূচক (negative) উপদে মাত্র আছে। ইহাতে অন্বয়মুখে (positive) উপদেশ নাই

সর্পের আকার-বিশিষ্ট রজ্জু দেখিয়া কেবল ভীত থাকিলে সর্পের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। প্রচলিত কথায় বলে—'দেখা সাপে খায় না, লেখা সাপে খায়।' চাঁদ-সদাগরের পুত্র লখিন্দরের দৃষ্টান্ত কিংবা মহারাজ পরীক্ষিতের লীলাভিনয় ইহার সত্যতা প্রচার করিতেছে। স্থূল আকারে ভীত হইলে সূক্ষ্ম আকার প্রচ্ছন্নভাবে গ্রাস করিয়া থাকে। তদীয়-দর্শনের মধ্যে কোন প্রকার ভোগ্য-আকার-দর্শনের অবকাশ নাই। শ্রীভগবদ্-ভজনোন্মুখ ও শ্রীভগবদ্ভজন-প্রবিষ্ট, উভয়েই যখন তদীয়-দর্শনে আগ্রহযুক্ত ও অভিনিবিষ্ট হন, তখন আর জড়-আকার-দর্শন নাই। তদীয় দর্শন নিরাকার-দর্শন নহে বা কল্মাষপাদের ন্যায় জীবাকার-দর্শনও নহে, তাহা শ্রীভগবদ্-বৈভবদর্শন। বিধিপথে মহাপুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধ-যুক্তরূপে দর্শনে আগ্রহ ও রুচি এবং রাগপথে মৈত্রী। বিধিমার্গে শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার সহিত সংযুক্তরূপে দর্শনে আগ্রহ থাকিবে; রাগমার্গে আগ্রহ ত থাকিবেই, তদ্ব্যতীত অভিনিবেশও থাকিবে। শ্রীভগবদ্-বৈভব-স্ফূর্তিতে কেবলমাত্র আদর নহে, পরন্তু দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতির অনুগত-রূপে শুদ্ধ-বন্ধুত্বাদিভাবে পরিদর্শন হইয়া থাকে।

এই প্রপঞ্চে থাকিয়াও প্রপঞ্চাতীত থাকিবার, সংসারীর অভিনয় করিয়াও সংসারাতীত হইবার, মর জগতে বাস করিয়াও অমর হইবার কৌশল কেবলমাত্র আকার-দর্শনে ভীত হওয়া নহে, পরন্তু প্রপঞ্চের সহিত অনাসক্ত থাকিয়া তদীয়-দর্শনে অভিনিবিষ্ট থাকা। তদীয়-দর্শন প্রবল না হইলে বিচ্ছিন্ন বা অনাসক্ত হওয়া যায় না।

গৃহস্থগণ দুই প্রকার। যাঁহারা কর্ম্ম-মিশ্র অর্চ্চনময়ী ভ
যাজন করেন, তাঁহারা একপ্রকার; আর যাঁহারা কেবল-অর্চ্চন
ভক্তি যাজন করেন, তাঁহারা অন্য প্রকার। কেবল-অর্চ্চন
ভক্তির যাজকগণ শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীপদাঙ্করেণুগণের অনুক
কারী। তাঁহারাই শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ন্যায় বলি
পারেন,—'যে দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভা
তখন আর পুত্রকন্যারূপ 'আকার'-দর্শন হয় না, জড়-জগ
প্রকৃতি-পুরুষ দর্শন হয় না। তখন পুত্রকন্যার আকার-দর্শন
হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের কোন বিশিষ্ট সেবাধিকারী বা সেবা
কারিণী তদীয় বস্তুরূপে দর্শন হইয়া থাকে। সুতরাং, জড়াকা
দর্শনজনিত যে ভয়, তাহা তাঁহাদিগের চতুঃসীমানায় উপস্থি
হইতে পারে না এবং তাঁহাদের প্রতি 'আকারদপি ভেতব্যম্'—
অনুশাসনবাক্যও প্রযুক্ত হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু নিম্নলিখিত বাক্যটীতে এই জ
নাম-রূপ-গুণ-ক্রিয়া ও জড়-পরিকর-সমন্বিত বিশ্বে থাকিয়াও কির
বিশ্বাতীত ও প্রপঞ্চাতীত থাকা যায়, বাঁচিতে পারা যায়, তাহ
সুবৈজ্ঞানিক কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন,—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

(শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।১২৫)

এই শ্লোকটীর একটী নিখুঁত পদ্যানুবাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপা
এইরূপ করিয়াছেন,—

"আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।"

বিষয়ান্ (বিষয়-সমূহকে) যথার্হম্ (যথোপযোগী অর্থাৎ শ্রীভগবানের সেবার পক্ষে যতটুকু উপযোগী বা অনুকূল ততটুকু) উপযুঞ্জতঃ (উপভোগকারী) অনাসক্তস্য [জনস্য] (জড়াসক্তি-বিহীন ব্যক্তির) কৃষ্ণ সম্বন্ধে (কৃষ্ণ-বিষয়ে) নির্ব্বন্ধঃ (প্রযত্ন, আগ্রহ বা অভিনিবেশ) যুক্তং বৈরাগ্যম্ (শুদ্ধভক্তি-যোগযুক্তি বৈরাগ্য) [বিশিষ্ট-রাগ বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়)।

বিষয়ের জড়াকার বা ভোগ্যাকার-দর্শনেই ভীতির উদয় হয়। ঈশ অর্থাৎ প্রভু পরমেশ্বর হইতে অপেত অর্থাৎ সম্বন্ধরহিত বা বিচ্যুত ব্যক্তির কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ বা অভিনিবেশের অভাবজনিত যে দ্বিতীয়াভিনিবেশ, বা অদ্বিতীয় পরতত্ত্ব শ্রীভগবানের শ্রীপাদ-পদ্মের আকার ব্যতীত যে অন্য দ্বিতীয় বস্তুর আকারদর্শন, তাহা হইতেই ভয় উপস্থিত হয়। স্বরূপের অস্ফূর্ত্তি হইতেই দ্বিতীয়া-ভিনিবেশের উদয় হয়। সেই স্বরূপের অস্ফূর্ত্তিই অস্মৃতি অর্থাৎ আগ্রহ, অভিনিবেশ বা নির্ব্বন্ধ-রাহিত্য। সম্বন্ধ-রহিত অর্থাৎ নির্ব্বন্ধযুক্ত ব্যক্তির নিকট "বিষয়সমূহ সকলি মাধব" অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তির অদ্বিতীয় ভোক্তৃতত্ত্ব শ্রীভগবদ্-বিগ্রহরূপে দর্শন—সবিলাস-দর্শন। পূর্ণ-সনাতন-পরমানন্দ-লক্ষণময় পরতত্ত্বরূপ সম্বন্ধী বস্তুর দর্শন; তথায় বিষয়ের কোন জড়াকার-দর্শন নাই।

'নির্ব্বন্ধ'-শব্দের অর্থ এখানে নিয়ম নহে। 'নির্ব্বন্ধ'-শব্দের অর্থ—আগ্রহ বা অভিনিবেশ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—স্বরূপ-

শক্তির অন্তর্গতরূপে যে দর্শনে বা "শ্রীমাধ্বদর্শনের" মধ্যে বি
মার্গে আনন্দনিধি শ্রীনারায়ণের সঙ্গে যুক্তরূপে দর্শনে আ
থাকিবে; আর রাগমার্গে আগ্রহ ত' থাকিবেই অভিনিবে
থাকিবে। এই অভিনিবেশই শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দের অবিস্মৃ
আর ইহার বিপরীতভাবই ঈশহইতে অপেতাবস্থা বা ঈশবিমুখ
অস্মৃতি বা স্বরূপের অস্ফূর্তি।

'যথার্হ'-শব্দের দ্বারা যথা+অর্হ অর্থাৎ যতটুকু শ্রীভগ
ভজনের উপযোগী, ভক্তির প্রগতির সাহায্যকারী যতটুকু মা
(?) সঙ্গে স্পর্শ থাকিবে, ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে! এইভাবে ক
কামিনী, প্রতিষ্ঠা বা বিষয়ের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হই
কনক, কামিনী প্রতিষ্ঠাদি-বিষয়ের আকার দেখিয়া শ্রীমাধ
সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি ভীত হন না! শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপা
যে, প্রতিষ্ঠার আকার দেখিয়া ভয়ে পলায়ন-লীলা বা ভগ
শ্রীগৌরসুন্দরের যে 'স্ত্রী-গান'-শ্রবণ বা বিষয়ীর আকার দ
করিয়া ভীতির লীলা-প্রভৃতি—তাহা একাধারে তাঁহাদের দৈন
বিপ্রলম্ভ এবং বদ্ধজীবের প্রতি শিক্ষা ও শাসন-লীলা প্র
করিতেছে। প্রতিষ্ঠার ভয়ে যিনি অত্যন্ত ভীত, তিনি কি ক
বহু শিষ্য, শ্রীগোপাল প্রকট করিয়া মহাড়ম্বরে মহোৎসব,
স্থাপন, মথুরার শ্রেষ্ঠি-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে শ্রীগোপা
সেবার্থ নানাভাবে অর্থাদি-গ্রহণ ও আড়ম্বরের সহিত সেবা স্থা
করেন? আর শ্রীগৌরসুন্দরই বা শ্রীজগন্নাথের দর্শন-কা
উৎকলবাসিনী জনৈকা স্ত্রীর নিজ স্কন্ধের উপর পদস্থাপনপূ

শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে আর্ত্তি দেখিয়া নিজ-সেবক শ্রীগোবিন্দের প্রতি উক্ত স্ত্রী-মূর্ত্তিকে বাধা-প্রদানে নিষেধ করেন কেন ? তখন কি শ্রীগৌরসুন্দর 'স্ত্রী'-আকার হইতে ভীত হইবার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন ? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু তখন শ্রীজগন্নাথের দর্শনের দ্বারা শ্রীজগন্নাথের সেবা-সুখ-বিধানহেতু সেই স্ত্রী-মূর্ত্তি-ধারিণীকে 'অপ্রাকৃত কাষ্ণ' জ্ঞানই করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণসেবকের স্ত্রী-পুরুষাদি' আকার-দর্শনে নিষেধ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই স্ত্রী-মূর্ত্তি-ধারিণীর প্রেমার্ত্তি-দর্শনে দৈন্যভরে বলিয়াছিলেন,—

"এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা।
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে, তাহা নাহি জানে ॥
অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার বা হয় ॥
পূর্ব্বে আমি যবে কৈলুঁ জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথ দেখি—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন।
যাঁহা তাঁহা দেখি সর্ব্বত্র মুরলীবদন ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৪।২৮-৩২)

এইস্থানে স্ত্রী-আকার-দর্শন, এমন কি, স্পর্শে পর্য্যন্ত কোন-রূপ ভীতি-প্রচারের লীলা নাই। এস্থানে শ্রীগোবিন্দের প্রতি "গোবিন্দ আজ রাখিলা জীবন। স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।৮৫)— এইরূপ কোন উক্তি নাই,

বরং শ্রীগোবিন্দের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"আদিবস্যা
স্ত্রীরে না কর বর্জ্জন। করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন॥" (শ্রী
১৪।২৬)। অতএব শ্রীজগন্নাথের সহিত সেবা-সংযুক্তরূপে
বিষয়-দর্শন, তাহা সকলই মাধব-দর্শন ; তথায় বিষয়ের জড়া
দর্শন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে শ্রীমাধবে
সংযুক্ত-স্বরূপে প্রকাশিত দেখিলেন, তখন তাঁহাকে আর বি
দর্শন করিলেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে
নিত্যকাল 'বিষয়ী'ই দর্শন করিতেন, তবে তিনি স্বয়ং বিষয়ীর
গ্রহণ করিতেন না ; বা নিজজনগণকে বিষয়ীর অন্ন-দ্রব্য-গ্র
প্রশ্রয় দিতেন না। মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র অত্যন্ত দৈন্যার্ত্তি
শ্রীমন্মহাপ্রভুকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীসার্ব্বভৌমের নিকট বলি
ছিলেন,—

"অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্ সংবীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মামু
মদেকবর্জ্জং কৃপয়িষ্যতীতি নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ॥"

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক ৮।৭

অদর্শনীয় নীচজাতি-সকলকে দর্শন দিতেছেন, তথা
আমাকে দর্শন দিবেন না! আমাকে বিনা সকল জীবকে কৃ
করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া কি শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন

যিনি 'মহাবদান্য-শিরোমণি', তিনি কেবল বিষয়ীর আ
বা নাম বর্জ্জন করিয়া সকলকে উদ্ধার করিবেন? যদি শ্রীমন্মহাপ্র
শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে 'রাজা' বা 'বিষয়ী'-মাত্র বলিয়া কখনও স্বীকার
করিতেন, তবে কি তাঁহার 'মহাবদান্য' নামে কলঙ্ক হইত না

তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বিষয়ী'কে কুবিষয়ী বা পতিতকে পতিতই রাখেন নাই। তিনি তাঁহাদিগকে মহাভাগবত করিয়াছেন।

মায়ার প্রতি রাগ ও বিদ্বেষ থাকাকাল পর্য্যন্ত শ্রীহরিসম্বন্ধ নাই, জানিতে হইবে। সর্ব্বত্র অভীষ্টদেবের সহিত সম্পর্করূপে দর্শনই 'যুক্তবৈরাগ্য'। ভগবৎসম্বন্ধ-দর্শনকারীর দর্শনে অশ্রদ্ধা বা অনাদর প্রদর্শন করিলে অপরাধ অবশ্যম্ভাবী। উচ্চ অধিকারী কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা তাঁহার কৃপাশক্তি-সঞ্চারিত চিত্তবৃত্তিতে অনুগমন না করিয়া তৎপ্রতি কটাক্ষ বা তাঁহার অনুকরণ উভয়ই অপরাধ আনয়ন করেন।

"অধিকারি-বৈষ্ণবের না বুঝি' ব্যবহার।
যে জন নিন্দয়ে, তা'র নাহিক নিস্তার॥"
"'কৃষ্ণকৃপায়ে সে ইহা জানিবারে পারে।
এসব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে'॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৯।৩৮৭, ৩৮৯)

শ্রীরায়রামানন্দ প্রভুর দেবদাসীতে শ্রীকৃষ্ণভোগ্যা শ্রীব্রজ-গোপীর দর্শন অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর রাজকুমারে শ্রীনন্দকুমার-দর্শনের অনুকরণ যদি সাধক জীব করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহা 'যথার্হ'-পদবাচ্য হইবে না এবং সেই আনুকরণিকের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে সহজ অনুরাগ হয় নাই, সেইরূপ ব্যক্তি যদি শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের অনুকরণ করেন, তবে শ্রীগোপীনাথ সেই অনুকরণকারীর জন্য ক্ষীর চুরি করিবেন না। শ্রীশ্রীল গৌর-

কিশোর-দাস বাবাজী মহারাজ কুলিয়া নবদ্বীপের কোন ধর্ম্মশাল
শ্রীরাধাকুণ্ড-দর্শনে বাস করিয়াছিলেন; উহার অনুকরণ করি
বিষ্ঠা-কুণ্ডেই বাস হইবে। আবার, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্র
সেই দর্শন বা দৃশ্য বস্তুতে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিলে অপরাধপ
নিমজ্জিত হইতে হইবে।

আমাদিগকে বাঁচিতে হইলে সর্ব্বপাত্রে, সর্ব্বকালে
সর্ব্বস্থানে শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধিরূপে দর্শন ব্যতীত আর অন্য উপ
নাই। এই দর্শন আরোপ বা কল্পনামাত্র নহে; ইহা যখন বা
ও সহজভাবে প্রকাশিত হয়, তখনই আমরা মৃত্যু হইতে অমৃতে
সন্ধান প্রাপ্ত হই। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ বিভিন্ন স্তরের সাধক
সিদ্ধে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী
দুই প্রকার সাধক ও দুই প্রকার সিদ্ধের শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ
বাস্তব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধকের মধ্যে দুই প্রক
ভেদ; যথা—লৌকিক শ্রদ্ধাযুক্ত সাধক, যাঁহারা বর্ণাশ্রমে অব
থাকিয়া কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চনকারী বা কনিষ্ঠ-ভাগবত; আর দ্বিত
প্রকার—শাস্ত্রীয়-নির্গুণ-শ্রদ্ধাযুক্ত সাধক। তাঁহারা কেবল-অর্চ্চনম
ভক্তির অনুষ্ঠানপর। এই পর্য্যন্ত বৈধমার্গের সাধক। সিদ্ধে
মধ্যে জাতরতি বা মধ্যম মহাভাগবত; আর পরমসিদ্ধ
উত্তমোত্তম মহাভাগবত।

লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত সাধক বা প্রথমোপাসকগণের পক্ষে সর্ব
ভূতে আদর একান্ত বিহিত। তাঁহারা সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠা
জানিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য আদর করিবেন। 'সর্ব্বভূ

পরমাত্মা বিরাজমান'—এই বিচার লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির বিচার বা ধারণা। তাহার ঊর্দ্ধে শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা বা নির্গুণা শ্রদ্ধা। 'শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিত আছেন'—ইহা অপেক্ষাও নির্গুণ শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকগণের যে সর্ব্বত্র শ্রীভগবদ্‌বৈভব-স্ফূর্ত্তির আরম্ভ, তাহা আরও অনেক বড় কথা। নির্গুণা-শ্রদ্ধা উদিত হইলে সর্ব্বত্র শ্রীইষ্টদেবের অর্থাৎ চিদ্‌বিলাসী শ্রীভগবানের বৈভব-দর্শন-আরম্ভ হয়; তাহা কেবল অন্তর্য্যামি-দর্শন নহে। অতএব লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি যে ভাবে ভূতাদর করেন, শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি ঠিক্ সেইভাবে করেন না। লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত সাধক সর্ব্বভূতে অন্তর্যামি দর্শনের বিচার গ্রহণ করিয়া তৎসম্বন্ধে সর্ব্বভূতের আদর করেন; আর শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকের সর্ব্বত্র চিদ্‌বিলাসী ইষ্টদেবের বৈভব-দর্শন আরম্ভ হয়। তাঁহারা শ্রীভগবদ-বৈভব-দৃষ্টিতে শ্রীভগবৎ-পার্ষদগণের ভাব বা রতির অনুসরণ করিয়া সর্ব্বত্র ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। সিদ্ধগণের সর্ব্বভূতাদরের মধ্যে ইষ্টদেবের দর্শনটী পাকা হইয়া গিয়াছে। ইহাই সাধক ও সিদ্ধের মধ্যে বৈশিষ্ট্য। জাতভাব অর্থাৎ মধ্যম মহাভাগবতগণের দর্শনে অহিংসা অর্থাৎ ক্ষান্তি, উপশম অর্থাৎ জড়দর্শন বা দৃশ্যদর্শনশূন্যতা স্বভাবরূপে পরিণত হয়। অহিংসারূপ ক্ষান্তি ও উপশমরূপ দৃশ্যদর্শন-শূন্যতা নিষেধ সূচক ভাব; কিন্তু অন্বয়ভাবে এই অহিংসা মৈত্রী অর্থাৎ অভীষ্টদেবের নিজজনরূপে দর্শন এবং উপশম বা জড়দর্শন শূন্যতা নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ শ্রীভগবৎ-স্মৃতি বা অভিনিবেশরূপে প্রকাশিত হয়। পরমসিদ্ধ

উত্তমোত্তম মহাভাগবতগণ যেই স্তরে আছেন, সেই স্তরে তাঁহা সর্ব্ব ভূতে শ্রীভগবানের আবির্ভাব দর্শন করেন। (১) উত্তমো ভাগবত স্থাবরজঙ্গমাদি সর্ব্ব ভূতে অভীষ্ট শ্রীভগবদ্-ভাব অর্থা শ্রীভগবানের আবির্ভাবদর্শনরূপ বহিঃসাক্ষাৎকার করেন এ নিজের মধ্যে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ইষ্টদেবের লীলা-পরিকরগণকে দর্শ করেন। ইহাই তাঁহাদের অন্তঃসাক্ষাৎকার। (২) উত্তমো মহাভাগবত ইষ্টদেবের প্রতি নিজের রতি হইতে আরম্ভ করি অধিরূঢ় মহাভাব পর্য্যন্ত ভাবে সর্ব্বভূতকে বিভাবিত দর্শন করে এবং স্বচিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীইষ্টদেবের অবতারের আশ্রয়বিগ্রহরূ ভূতসমূহকে দর্শন করেন। উত্তম মহাভাগবতের প্রতি কে অজ্ঞতাক্রমে শত্রুতাচরণ করিলেও সেই শত্রুর প্রতি অথ শ্রীভগবদ্-বিদ্বেষী বা শ্রীভাগবত-বিদ্বেষীর প্রতি ইষ্টদেবেরই স্ফূ হয়। আর, মধ্যম-মহাভাগবতের বিদ্বেষীর ব্যবহারে চি অনভিনিবেশরূপ উপেক্ষার উদয় হয়। উত্তম মহাভাগবত শ্রীশু দেবের কংসের প্রতি 'ভোজকুল-কুলাঙ্গার' রূপে উক্তি বা শ্রীউদ্ধবে ভক্তিবিদ্বেষী ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের বন্দনা একই তাৎপর্য্যপর শ্রীশুকদেবের শ্রীভগবদ্-বিদ্বেষীর প্রতি শাসন ও উদ্ধবের ভক্ত বিদ্বেষীর প্রতি বন্দন—উভয়েরই মধ্যে ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধক ও সিদ্ধগণের মধ্যে এই চারিভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ দৃষ্ট হয়। লৌকিকশ্রদ্ধালু প্রথমোপাসক সাধকের নির্ব্বন্ধ অনেক সময়েই আরোপ-বিচার-মূলক হইয়া থাকে; কখন কখন

নির্ব্বন্ধাভাস হয়। ইহা প্রকৃত-প্রস্তাবে নির্ব্বন্ধ নহে। সশ্রদ্ধ-সাধক হইতে নির্ব্বন্ধ অর্থাৎ আগ্রহ বা অভিনিবেশ আরম্ভ হয়। বিধিমার্গে আগ্রহ-আকারে ও রাগমার্গে মৈত্রী বা অভিনিবেশাকারে প্রকাশিত হয়। এই অভিনিবেশ বা শ্রীভগবদ্‌বৈভব-স্ফূর্ত্তি কেবলমাত্র আদর নহে, কিন্তু শ্রীভগবৎ-পার্ষদগণের ভাব ও রতির অনুসরণ করিবার আগ্রহরূপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এই অভি-নিবেশ সিদ্ধগণের মধ্যে পরিপক্ক দশা-প্রাপ্ত হয়। তখন জড়-বস্তুর প্রতি রাগ ও দ্বেষ নিবৃত্তির জন্য পৃথক্‌ চেষ্টা করিতে হয় না। উহা অতি স্বাভাবিক হইয়া পড়ে এবং অহিংসারূপ ক্ষান্তি কেবল ব্যতিরেক ভাব প্রকাশ না করিয়া মৈত্রীরূপ অন্বয়ভাবে প্রকাশিত হয় অর্থাৎ সর্ব্বভূতকে অভীষ্টদেবের নিজজনরূপে দর্শন হয়। সেই দর্শনের মধ্যে যে জড়দৃশ্যাকার-দর্শন নাই— ইহা বলাই বাহুল্য। তখন সেই উপরম বা উপশম কেবলমাত্র ব্যতিরেকভাবে না হইয়া নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ শ্রীভগবৎ স্মৃতিরূপ নির্ব্বন্ধ বা অভিনিবেশ-রূপে বাস্তব অন্বয়ভাবে প্রকাশিত হয়। পরমসিদ্ধগণে তাহা আরও উন্নত হইয়া সর্ব্বভূতে নিজের অভীষ্ট শ্রীভগবানের আবির্ভাব-দর্শন এবং সর্ব্বভূতকে নিজের ভাবে বিভাবিত দর্শন ও ভূতসমূহকে স্ব-চিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীভগবদবতারের আশ্রয়-বিগ্রহরূপে দর্শন করায়। মহতের কৃপাবলে এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ বা অভি-নিবেশে যখন জীব অভিসিবিষ্ট হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তখন তিনি মর-জগতে থাকিয়াও অমর হন। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে প্রলয়-প্রাপ্ত হউক, জগতে যে কোন

পরিবর্ত্তন, সংঘর্ষ বা অরিষ্ট উপস্থিত হউক, তিনি তাঁহার নি
সহচর প্রাণকোটি-সর্ব্বস্ব প্রেষ্ঠ ইষ্ট-বস্তুর চিদ্‌-বিলাসে মগ্ন থাকি
বিলাসী শ্রীভগবানের বিলাসসুখ উৎপাদন করেন। তাঁহার হৃ
দৈন্যসমুদ্রে সর্ব্বদা প্লাবিত থাকে। তিনি প্রতিপদে পরানন্দ
সুধিতে নিমজ্জিত থাকিয়া তাঁহার ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান-সা
সন্তরণ-সেবায় অভিনিবিষ্ট থাকেন। ভাষা এই অবস্থাকে ব
করিতে পারে না। মেধা, অনুমান বা কল্পনার দ্বারা ই
উপলব্ধি হয় না। দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, দম্ভ বা প্রতিষ্ঠা বর্জ
আনুষঙ্গিক স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হয়। তিনি উত্তম হইয়াও আপনা
অধমাধম জ্ঞান করেন।

"উত্তম হঞা বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান॥"

* * *

"প্রেমের স্বভাব, যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ'॥"

* * *

"অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্য ভক্তি-দান।
আপনারে করে সংসারী জীব-অভিমান॥"

* * *

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন!
দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন!"

* * *

"গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন॥"

—:*:—

"অকাল-ভেকে সর্ব্বনাশ"

'চাঁদ-বাউল' নামে পরিচয়-প্রদানকারী শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ উৎকট উচ্ছ্বাসপরায়ণ ধর্ম্মোন্মত্ত অর্থাৎ শান্তিকামী বাতুল বা বাউল ব্যক্তিগণের বহির্ম্মুখ চিত্তবৃত্তির উদ্দাম-গতি ফিরাইয়া তাহাদিগকে অধিকারানুযায়ী ক্রমপন্থায় চলিবার বাস্তবোপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

"কেন ভেকের প্রয়াস ?
হয় অকাল-ভেকে সর্ব্বনাশ।
হ'লে চিত্তশুদ্ধি, তত্ত্ববুদ্ধি,
ভেক আপনি এসে' হয় প্রকাশ।"

* * *

"যতদিন হৃদয়-শোধন নয়,
ঘর ছাড়লে পরে 'মর্কট-বৈরাগী' তা'রে কয় ;
হৃদয়-দোষে, রিপুর বশে, পদে পদে তা'র পতন।"

(বাউল-সঙ্গীত—১১, ৯)

'অকাল-ভেক' বলিতে অধিকারী না হইয়া গৃহত্যাগের চিহ্ন-ধারণ বা অভিনয়। অধিকারগত ধর্ম্ম স্বীকার করিলে মঙ্গলের

পথে অগ্রসর হওয়া যায়। প্রপঞ্চের ত্রিতাপ-ক্লেশ, বহির্ম্মুখ গৃহে নানাপ্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা ও জঞ্জাল প্রত্যক্ষ করিয়া শান্তিকামীগণের প্রথমমুখে সংসার ও গৃহ পরিত্যাগ করিবার সাময়িক উন্মাদনা উচ্ছ্বাসের উদয় হয়। যেরূপ হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হই মনুষ্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয় এই দেহকেও পরিত্যাগ করিয়া জ্বা জুড়াইবার জন্য আত্মহত্যায় প্রয়াসী হয়, কিন্তু সেই উন্মাদনা মধ্যে বুঝিতে পারে না যে, একটী দেহ কেন, ঐরূপ শতশত দে যদি কেহ আত্মহত্যার দ্বারা বিনাশ করে, তথাপি বাসনা নি না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই সে প্রাপঞ্চিক ক্লেশ হইতে উদ্ধার ক করিতে পারিবে না : সেরূপ বহির্ম্মুখ গৃহের দাবানলে দগ্ধ শা কামী ব্যক্তিও মনে করে যে, গৃহত্যাগ করিলেই বুঝি, সে জ্বা যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, শান্তিলাভ করিতে পারি বস্তুতঃ যে-পর্য্যন্ত একমাত্র পরা শান্তির মূল উৎসের শ্রীপাদ রতির উদয় না হইবে, সে-পর্য্যন্ত শতশত বার গৃহত্যাগ বৈরাগ্যের চিহ্নাদি ধারণ করিয়াও মনুষ্য প্রকৃত শান্তির অধি হইতে পারিবে না।

যদ্রূপ স্বরূপসিদ্ধি-লাভের পর দেহত্যাগ না হওয়া প কৃত্রিম-ভাবে শতশত বার আত্মহত্যা করিলেও পুনঃপুনঃ বা ময়কোষরূপ বিভিন্ন দেহই গ্রহণ করিতে হয়, তদ্রূপ কৃত্রিমপ শতশত বার গৃহত্যাগ বা বৈরাগ্যের লিঙ্গ ধারণ করিলেও স্বরূপ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবকে পুনঃপুনঃ দেহরূপ-গৃহে প্রবেশ করি হইবে। তাই শ্রীউদ্ধব-গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন। ১১।১৭।৪৩ ,—

"গৃহং শরীরং মানুষ্যম্"

হর্ম্ম্যাদি গৃহ নহে, মনুষ্য-শরীরই গৃহ। ভগবদাবেশ ব্যতীত শরীরের প্রতি অভিনবেশ অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি কেহ ত্যাগ করিতে পারে না; সুতরাং শান্তিকামী বা মুক্তিকামী যে অকালে গৃহত্যাগ করিয়া বন-জঙ্গলাদি আশ্রয় করে এবং তথায় ইতর-বাসনায় মত্ত থাকে, তাহা এক বহির্ম্মুখ গৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আরও অধিকতর অস্বাভাবিক বহির্ম্মুখ গৃহান্তরে প্রবেশমাত্র। এইরূপ কৃত্রিমপন্থা অবলম্বন করিলে নানাবিধ পাপ ও উৎপাত অনিবার্য্য হয়; অনেক সময় তাহা হইতে ভক্তিবাধক অনেক অপরাধেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন যে, ভাব বা রতির উদয় না হইলে কখনও স্থায়ী বৈরাগ্যের উদয় হইতে পারে না। সুতরাং তৎপূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিলে সাধকের পতন ও জগজ্জঞ্জাল অবশ্যম্ভাবী। তিনি শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে (৫।২) এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে স্বাভাবিক অরুচি হইলে 'বিরক্তি' বলা যায়। ভাব উদিত হইলে বিরক্তি প্রবল হয়। জাতভাব পুরুষের ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি হইয়া উঠে। সেই সেই ইন্দ্রিয়ার্থ যদি ভগবদ্বিষয়ক হয়, তবে তাহাতে যথেষ্ট প্রীতি হয়। বিরক্ত (বিরকৎ) বাবাজী বলিয়া একটী শ্রেণী লক্ষিত হয়; তাঁহারা ভেকধারণপূর্ব্বক আপনাদিগকে 'বিরক্ত' মনে করেন। 'বিরক্ত'

বলিয়া পরিচয় দিলেই বিরক্ত হয়, এরূপ নয়। যদি ভাবোদয়
ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া থাকে,
তাঁহাদের ভেক গ্রহণ করা অবৈধ। ভেকের অর্থ এই
ভাবক্রমে যখন বিরক্তি উদিত হয়, তখন সকলের পক্ষে স
সুবিধাকর হয় না। যাঁহাদের পক্ষে ভজন সম্বন্ধে অনুকূল হয়
তাঁহারা অভাব খর্ব্ব করিয়া সামান্য ক্ষুদ্র বসন, কন্থা, করঙ্গ প্র
ব্যবহার করিয়া ভিক্ষার দ্বারা শ্রীমহাপ্রসাদ সেবন করিয়া থাকে
এরূপ ব্যবহার ক্রমেই স্বতঃ হইয়া পড়ে। এই পরিবর্ত্তনটী
শ্রীগুরুদেবের নিকট অধিকার-বিচারপূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্র-স
বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তখনই প্রকৃত ভেক হইয়া থাকে।
বর্ত্তমান প্রথা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক হইয়াছে। অনেকে জাতভ
হওয়া দূরে থাকুক, বৈধ-ভক্তিতে পরিনিষ্ঠিত না হইয়াই ক্ষ
বৈরাগ্যক্রমে বা যথেচ্ছাচার করিয়াও জীবনযাত্রার সুবিধ
জন্য ভেক গ্রহণ করেন। স্ত্রী-পুরুষের কলহক্রমে, সাংসারি
ক্লেশবশতঃ, বিবাহের অভাবে, বেশ্যাদিগের ব্যবসা
অবসানে, কোন মাদকদ্রব্যের বশ্যতা-দ্বারা বা অবিবে
পূর্ব্বক যে তাৎকালিক সংসারবৈরাগ্য উদিত হয়, তাহার না
ক্ষণ-বৈরাগ্য। সেই ক্ষণ-বৈরাগ্যবশতঃ নবীন পুরুষগণ সহ
কোন বাবাজীর নিকট বা গোস্বামীর নিকট গমন করিয়া যৎকিঞ্চি
অর্থ প্রদান করিয়া কৌপীন ও বহির্ব্বাস গ্রহণ করেন
তাহাতে ফল এই হয় যে, অত্যল্পকালেই সেই বৈরাগ্য বিগত হ
এবং তদাশ্রিত পুরুষ বা স্ত্রী ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া কোনপ্রকার অবৈ

সংসার পত্তন করেন, অথবা গোপনে গোপনে কদাচার করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করেন। তাঁহার পরমার্থ কিছুমাত্র হয় না। **এই-প্রকার অবৈধ-ভেকের পর্ব্বটী একেবারে উঠাইয়া না দিলে আর বৈষ্ণবজগতের কোনপ্রকার মঙ্গল হইবে না।** পূর্ব্বে **বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিচারে অবৈধ-বৈরাগ্যকে জন্মনাশ-কার্য্যরূপ পাপ** বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই অবৈধ বৈরাগ্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম গত সন্ন্যাসাশ্রমাশ্রিত পাপকার্য্য। এক্ষণে যে অবৈধ-বৈরাগ্যের বিচার করা গেল তাহা **ভক্তজীবনগত মহদপরাধ-বিশেষ।**

'বৈষ্ণব বৈরাগী' বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তন্মধ্যে ভক্তি-জনিত বৈরাগ্য অতি অল্পলোকের হইয়া থাকে। তাঁহাদের চরণে সর্ব্বদা দণ্ডবৎ প্রণাম করি। অবৈধ-বৈরাগিগণ নিম্নলিখিত চারি-শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ঃ—(১) মর্কট-বৈরাগী, (২) কপট-বৈরাগী, (৩) অস্থির-বৈরাগী ও (৪) ঔপাধিক-বৈরাগী।

বৈরাগ্য হয় নাই, অথচ বৈরাগীদিগের ন্যায় সাজ সাজিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু অদান্ত-ইন্দ্রিয়-দ্বারা সর্ব্বদা অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়—এই স্থলে যে বৈরাগ্যলিঙ্গ ধারণ করে, তাহাকে মহাপ্রভু 'মর্কট-বৈরাগী' বলিয়াছেন,—

"ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"
"প্রভু কহে— 'মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ২।১২০, ১২৪)

মহোৎসবাদিতে বৈষ্ণবদিগের সহিত ভোজন চলিবে, আপাততঃ যে উপদ্রবই করি, মরণসময়ে বৈষ্ণবগণ সংকার করি গৃহিগণ আদরপূর্ব্বক ভোজন এবং গাঁজা-তামাকাদি অনর্থ-জন্য অর্থ দিবে, এই ভরসায় যে-সকল ধূর্ত্তলোক ভেক গ্রহণ তাহাদিগকে 'কপট-বৈরাগী' বলে।

শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় আপনাকে উদ্দেশ করিয়া বৈরাগীকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

'হইয়া মায়ার দাস, করি' নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে কপট-বৈষ্ণববেশে,
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে॥

কলহ, ক্লেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটনক্রমে ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়; তদ্দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা লয়, তাহারা অস্থির-বৈরাগী। তাহাদের বৈরাগ্য থাকে তাহারা অতি শীঘ্রই কপট-বৈরাগী হইয়া পড়ে।

শ্রীল-ঠাকুর-মহাশয় অস্থির ও ঔপাধিক বৈরাগীকে দিয়াছেন,—

'ওরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গ-চরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুঃখে, ডুবি' গৃহ-বিষকূপে,
দগ্ধ হৈল এ পাঁচ পরাণ॥
তাপত্রয়-বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
দেহ সদা হয় অচেতন।

রিপুবশেন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাশরিল,
বিমুখ হইল হেন ধন ॥'

যাহারা মাদকদ্রব্যের বশীভূত হইয়া সংসারে অযোগ্য হয়, নেশার সময়ে একপ্রকার ঔপাধিক হরিভক্তি প্রকাশ করিবার অভ্যাস করে অথবা অভ্যস্ত রতি-দ্বারা ভক্তি-লক্ষণ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে, অথবা জড়রতির আশ্রয়ে শুদ্ধরতির সাধন-চেষ্টা করে, তাহারা বৈরাগ্যলিঙ্গ ধারণপূর্ব্বক ঔপাধিক বৈরাগী হয়।

এই সমস্ত বৈরাগ্য তুচ্ছ, দুষ্ট ও জীবের অমঙ্গলসাধক। **ভক্তি হইতে যে বিরক্তি হয়, তাহাই ভক্তজীবনের সৌন্দর্য্য। বৈরাগ্য করিয়া যে ভক্তির অন্বেষণ করা, তাহা অনৈসর্গিক ও প্রায়ই অমঙ্গলজনক।** যথার্থ বিরক্তি জাত-ভাব পুরুষ বা স্ত্রী-দিগের অলঙ্কারবিশেষ, এইমাত্র জানিতে হইবে। তাহাকে ভক্তির অঙ্গ বলা যাইবে না, কিন্তু ভক্তির অনুভাবস্বরূপ বলা যাইবে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের অন্যত্র (১।৭) আরও বলিয়াছেন,—

"শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে প্রেমপ্রাপ্তির প্রতিকূল শুষ্ক-বৈরাগ্য-ত্যাগ ও তৎপ্রাপ্তির অনুকূল যুক্তবৈরাগ্যের স্থিতি শিক্ষা দিয়াছেন ; যথা,—

'যুক্তবৈরাগ্যস্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্কবৈরাগ্যজ্ঞান সব নিষেধিল ॥'

যুক্তি ও যুক্তির অনুকূল বেদবাক্যের লক্ষণা-দ্বারা কতকগুলি ব্যক্তি মনে স্থির করেন যে, 'আমি ব্রহ্ম বটে, কিন্তু প্রপঞ্চজড়িত

হইয়া ব্রহ্মানুভব হইতে দূরে পড়িয়াছি। প্রপঞ্চ হইতে হইবার উপায় কি? মানবদেহটা ত' প্রপঞ্চ, গৃহ প্রপঞ্চ, প্রপঞ্চ, আহারাদি প্রপঞ্চ, সকলই প্রপঞ্চ। কি করিয়া প্রাপঞ্চিক উৎপাত হইতে উদ্ধার হই?'—এই ভাবনায় ব্যস্ত দেহকে বিভূতি ইত্যাদি মাখাইয়া কৌপীনাদি-দ্বারা আচ্ছা করেন। শুষ্ক দ্রব্যাদি খাইয়া স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া আপন মুমুক্ষু বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য গৃহাদি ত্যাগপূর্ব্বক বনে করেন বা মঠে বাস করেন। তাহা করিয়া কি লাভ হইবে, ভাল করিয়া না বুঝিয়া যে হরিসম্বন্ধদ্বারা উদ্ধার হওয়া যায়, তদ্বি উদাসীন হইয়া শুষ্কজ্ঞানমাত্র ভাবনা করিতে থাকেন। পা গেল, পুণ্যও গেল; আমি ও আমার সকলই গেল বটে, কিন্তু লাভ হইল, তাহা বুঝিলেন না।

তাহা না করিয়া যদি তিনি দেহে, গেহে, ভোজনে, শ কালে, দিক্‌সমূহে হরিসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহার অনুশীলন ক ক্রমশঃ ভক্তিবৃদ্ধি করিতেন, তবে চরমফল যে প্রেম, তাহা অ লাভ করিতেন। এইরূপ বৈরাগ্যের নাম 'ফল্গুবৈরাগ্য'। তাহা নিষেধ করিয়া শ্রীসনাতনকে যুক্তবৈরাগ্য শিক্ষা দিয়াছেন দাস গোস্বামীকেও সেই শিক্ষা দিয়াছেন,—

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা॥

অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৩৭-৩৯)

স্বচ্ছন্দে দিনযাপনমানসে গৃহে স্ত্রীপুত্রের সহিত অনাসক্তভাবে বিষয় স্বীকার করিয়া **অন্তর-নিষ্ঠার সহিত ভজন করিতে পারিলে ক্রমে প্রপঞ্চ খসিয়া পড়ে।** আত্মা ভক্তিবলে বলীয়ান্ হইয়া ভগবৎসম্বন্ধে স্থিত হন। নতুবা **মুমুক্ষু হইয়া ক্রমত্যাগ করিলে মর্কট-বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে কদর্য্য করিয়া ফেলে।** 'যথা-যোগ্য বিষয় স্বীকার কর',—এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য বিষয় গ্রহণ করা উচিত নয়, **কেবল আত্মার কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-স্থাপনের জন্য যতটা বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা কর।** আত্মপ্রসাদ-ফল দিয়া বিষয় স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত আত্মাকে ছাড়িয়া দিবে। দেহ, গেহ, কৃষ্ণার্চ্চনার উপকরণ, সমাজ--সকলই যুক্তবৈরাগ্যের উপকরণ হইতে পারে। কেবল সাধকের অন্তরনিষ্ঠা হইলে সব লাভ হয়। বাহ্যনিষ্ঠা কেবল লোকব্যবহারমাত্র। **অন্তরনিষ্ঠা নিষ্কপটভাবে হইলে ভববন্ধ ও প্রপঞ্চসম্বন্ধ সত্বরেই তিরোহিত হয়।"**

অকাল-ভেক বা অনধিকারীর গৃহত্যাগ-প্রবৃত্তির নিন্দা করিয়া শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্তি প্রবল থাকাকালে কিরূপে ক্রমপথে চলিতে হইবে, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি এতৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"অপক্ক-সিদ্ধান্ত কতিপয় ব্যক্তির বিবেচনায় ভক্তিসাধনের

আবশ্যকতা নাই। হয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মজীবন বা একেবারে প্রে
ভক্তির কৃত্রিম লক্ষণই তাহাদের ভাল লাগে। আমরা ভ
উপদেশে দেখিতেছি, ক্রম-সোপানই ভাল ও নিশ্চয় অর্থজন
আদৌ ধর্ম্মজীবনে বর্ণাশ্রমের নিষ্ঠা, পরে উন্নতিক্রমে বৈধভক্তি
অবশ্য হইবে এবং অবশেষে প্রেমভক্তিতে জীবনের সম্পূ
হইবে। অধিকার-উন্নতির স্থলে কিছু কিছু আকারের অ
পরিবর্ত্তন হয়।" (চৈঃ শিঃ ১

"যে পর্য্যন্ত বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্তি প্রবল, সে পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গ
কৃষ্ণসংসারে সমস্ত প্রবৃত্তি নিরপরাধের সহিত চালিত কর
নিতান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্তির আশ্রয়ে সেই প্রবৃত্তি অতি
কালের মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া অন্তর্ম্মুখ হইয়া যায়। প্রবৃত্তি য
পূর্ণরূপে অন্তর্ম্মুখী হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জ
তৎপূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশ
গৃহস্থ-অবস্থাটী জীবের আত্মতত্ত্ব উদিত করিবার ও শিক্ষা করি
চতুষ্পাঠী-বিশেষ। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করি
পারে।" (জৈবধর্ম্ম, ৭ম অধ্যায়, ১১৯ পৃষ্ঠা)

* * *

"গৃহত্যাগি-ভক্তের অধিকার-লক্ষণে আদৌ স্ত্রীসঙ্গস্পৃ
শূন্যতা, সর্ব্বজীবে পূর্ণ-দয়া, অর্থব্যবহারে তুচ্ছজ্ঞান, কে
গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহজন্য অভাবকালে যত্ন, কৃষ্ণে শুদ্ধা র
বহির্ম্মুখসঙ্গে তুচ্ছজ্ঞান, মান-অপমানে সমবুদ্ধি, বহ্বারম্ভে স্পৃ
শূন্যতা, জীবনে-মরণে রাগদ্বেশ-রাহিত্য।" (ঐ ১১৯-২০ পৃ

*   *   *

"এই লক্ষণ-সকল যে গৃহস্থভক্তের উপস্থিত হয়, তিনি আর কর্ম্মক্ষম থাকেন না ; সুতরাং তিনি গৃহত্যাগী হইয়া পড়েন। এরূপ নিরপেক্ষ ভক্ত বিরল। জন্মের মধ্যে যদি কখনও এরূপ একটী ভক্তের সঙ্গ হয়, তাহা হইলেও সৌভাগ্য।" (ঐ ১২০ পৃঃ)

*   *   *

"যথার্থ নিরপেক্ষতা দৃঢ় : আর কোন সময়ে ভঙ্গ হয় না। কৃত্রিম নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার আশা, ধূর্ত্ততা ও শাঠ্য হইতে প্রকাশ পায়। 'নিরপেক্ষ গৃহত্যাগি ভক্তের সম্মান পাইব'—এই আশায় কৃত্রিম অধিকার কেহ কেহ প্রকাশ করেন। সেটা নিরর্থক ও অত্যন্ত অমঙ্গলজনক। গৃহত্যাগ করিবামাত্র অধিকার-লক্ষণ আর দৃষ্ট হয় না। তখন দৌরাত্ম্য আসিয়া উপস্থিত হয়।

*   *   *

দৃঢ়রূপে গৃহস্পৃহা দূর হইলে বনেই থাকুন বা গৃহমধ্যেই থাকুন, নিরপেক্ষ অকিঞ্চন ভক্ত জগৎ পবিত্র করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ ভিক্ষাশ্রমলিঙ্গদ্বারা পরিচিত হইবার জন্য কৌপীন ও কন্থা গ্রহণ করেন।" (ঐ ১২১ পৃঃ)

*   *   *

"জগতে ভিক্ষাশ্রমী বলিয়া পরিচিত হইলে আর আত্মীয়-পরিবারগণ সম্বন্ধ রাখিবে না, সহজে ছাড়িয়া দিবে এবং নিজেও আর গৃহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিবে না। সহজ নিরপেক্ষ প্রবৃত্তির সহিত লোকাশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হইবে। পরিপক্ক-

নিরপেক্ষ গৃহত্যাগি-ভক্তের জন্য বেষাশ্রয় কোন কার্য্যের নাই; কিন্তু কাহারও কাহারও পক্ষে বেষাশ্রয় একটু কার্য্য করে। জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্') ভা ৪।২৯।৪৭। এই লক্ষণযুক্ত ভক্তের বেষাশ্রয় নাই। লোকাপেক্ষা পর্য্যন্ত তাঁর প্রয়োজন।

* * *

আদৌ গুরুদেব দেখিবেন যে, শিষ্য উপযুক্ত পাত্র কি গৃহস্থ-ভক্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তির বলে শমদমাদি ব্রহ্মস্বভাব করিয়াছেন কিনা? স্ত্রীসঙ্গস্পৃহাশূন্য হইয়াছেন কিনা? পিপাসা ও ভাল খাওয়া-পরার বাঞ্ছা নির্ম্মূল হইয়াছে কি কিছুদিন শিষ্যকে নিজের নিকট রাখিয়া ভালরূপে পরী করিবেন। যখন উপযুক্ত পাত্র বলিয়া জানিবেন, তখন ত্রি শ্রমের বেষ দিবেন। তৎপূর্ব্বে কোন প্রকারেই দিবেন না অনুপযুক্ত পাত্রে ভেক দিলে গুরু অবশ্য পতিত হইবেন।"

(ঐ ১২১ পৃ

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই সকল উপদেশ যে বর্ণে সত্য, তাহা বহু শাস্ত্রোপদেশ এবং পূর্ব্ব ও আধুনিক শত দৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। প্রমাণচক্র-চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবত (৭।১১।৩১-৩৪) স্বয়ং শ্রীনারদ ধর্ম্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠিরকে উপদেশ করিয়াছেন,—

"প্রায়ঃ স্বভাববিহিতো নৃণাং ধর্ম্মো যুগে যুগে।
বেদদৃগ্ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ শর্ম্মকৃৎ॥

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ॥
উপ্যমানং মুহুঃ ক্ষেত্রং স্বয়ং নির্বীর্য্যতামিয়াৎ।
ন কল্পতে পুনঃ সূত্যা উপ্তং বীজঞ্চ নশ্যতি॥
এবং কামাশয়ং চিত্তং কামানামতিসেবয়া।
বিরজ্যেত যথা রাজন্নাগ্নিবৎ কামবিন্দুভিঃ॥"

হে রাজন্! বেদদৃক্ মহানুভবগণ যুগে যুগে স্বভাববিহিত-ধর্ম্মকেই ইহলোকে ও পরলোকে মনুষ্যগণের মঙ্গলকর বলিয়াছেন। স্বভাবকৃত বৃত্তির সহিত বর্ত্তমান স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ধীরে ধীরে অর্থাৎ ক্রমপন্থায় বা বহু জন্মান্তর পরে নিজ স্বভাবজাত কর্ম্মনিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হে রাজন্! যেরূপ পুনঃ পুনঃ বীজ-বপনে ক্ষেত্র নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে এবং পুনরায় শস্য-উৎপাদনে অসমর্থ হয়; যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘৃতবিন্দুসমূহের দ্বারা নির্ব্বাপিত হয় না, কিন্তু প্রচুর-ঘৃত-নিক্ষেপফলে নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ উৎকট-ভোগ-বাসনাযুক্ত পুরুষের অকস্মাৎ কামত্যাগ অসম্ভব-হেতু ঐরূপ ব্যক্তি বেদোক্ত নিয়মে বহু প্রকারে কাম ভোগ করিতে করিতে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা যখন বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া কামভোগের দোষগুলি উপলব্ধি করিতে পারে, তখন যযাতি-সৌভরি-প্রভৃতি ব্যক্তিগণের ন্যায় ভোগদ্বারা বাসনা ক্ষয় করিয়া ধীরে ধীরে বিরাগ লাভ করে।

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, বেদ—বিষ্ণুময়, সুতরাং শ্রীবিষ্ণুর

সহিত পরম্পরাক্রম-সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় জীবের মঙ্গল হইতে পারে। যাঁহারা মহতের বিশেষ কৃপালাভ করে নাই অথচ যাঁহাদের উৎকট-ভোগবাসনাও আগ্নেয়গিরি-গহ্বরস্থ প্রচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় অন্তরে পূর্ণমাত্রায় লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে ক্রমপন্থা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মসন্ন্যাসী বা জ্ঞানসন্ন্যাসী ত' দূরের কথা, ভক্তি-সন্ন্যাসী বা বর্ণাশ্রমত্যাগী বাবাজী সাজাইয়া দিলেও তাঁহাদের উৎকট-ভোগাগ্নির অগ্ন্যুৎপাত নিজেদের ও জগতের সমূহ অমঙ্গল বিধান করে।

মহতের নিকট শ্রীহরিনাম-প্রাপ্তির অভিনয়, দীক্ষার অভিনয়, মহতের সেবার অভিনয়, বহুকাল মঠাদিতে বাসের অভিনয় করিলেই যে কেহ মহতের কৃপায় অভিষিক্ত হইয়াছেন,—একথা বলা যায় না। কার্য্য দেখিয়া কারণ নিরূপিত হয়—ইহাই বৈজ্ঞানিক নিয়ম। মহতের কৃপা বা সঙ্গ লাভ হইলে সেই রং অর্থাৎ সেইরূপ আবেশ বা চিত্তবৃত্তির স্ফুরণ হইবে। যদি মহতের ন্যায় আবেশ ও অভিনিবেশ প্রকৃতপ্রস্তাবে চিত্তে উদিত না হয় অথচ বাহ্য-বেশের অভিনয়ে মহতের কৃপালাভের সর্ব্বপ্রকার সমাবেশ দেখা যায়, তাহা হইলে উহা বায়সের ময়ূরপুচ্ছ-ধারণের ন্যায় বৃথা নাট্যমাত্র।

এইরূপ বহু ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—যাহারা মহতের নিকট আসিবার অভিনয় করিয়া হৃদয়ে উৎকট ভোগ-বাসনার আগ্নেয়-পর্ব্বত পোষণ করিয়াছে। ইহারা প্রতিষ্ঠাশার বশবর্ত্তী হইয়া বৈরাগ্যের লিঙ্গধারণপূর্ব্বক মহতের অবৈধ অনুকরণ

করিয়া অপরাধ করিতে করিতে বিতাড়িত হইয়াছে। আনুগত্যের ছলনা কিছুদিনের মধ্যেই স্বতন্ত্রতা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা, গুরুগিরি করিবার আশায় জগদ্বঞ্চনা-প্রভৃতি কার্য্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। অন্যের কি কথা, স্বয়ং মহাভাগবত-শিরোমণি শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর আনুগত্যের ছলনা করিয়া এরূপ বহুব্যক্তি আনুকরণিক বৈরাগ্যের অভিনয় দেখাইয়া অপরাধী ও চিরতরে ভ্রষ্ট হইয়াছে। তৎপরে শত শত অকাল-ভেকধারী, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির দৃশ্যও জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা প্রত্যক্ষই প্রমাণিত হইতেছে, যাঁহারা মহতের বিশেষ-কৃপা প্রাপ্ত হন নাই অথচ শাস্ত্রানুমোদিত ক্রমপথেও বিচরণ করিতে শিক্ষা করেন নাই, তাঁহাদের অকালভেক সর্ব্বতোভাবে অহিতকারক।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিতিকালেও অনধিকারী কৃত্রিমভাবে অকালে বৈরাগ্যলিঙ্গ প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী সাজিলে কি হইবে? তাঁহাদের হৃদয়ে উৎকট ভোগবাসনা অচিরেই বা কোন সুযোগ বা ইন্ধন পাইলেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তখন যে গৃহ অর্থাৎ গৃহের মূল গৃহিণীকে তাঁহারা নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই যোষিৎরূপি মায়া কখনও অগম্যা স্ত্রী, কখনও অগম্য পুরুষ, এমন কি, পশ্বাদি-রূপেও তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের সর্বনাশ সাধন করে। পশু হইতেও তাঁহাদের মধ্যে অধিকতর নিন্দনীয় পাপকার্য্য ও অপরাধসমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাঁহাদের সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত (৫।২৬।২০-২১) ভয়াবহ নরকের ব্যবস্থা করিয়াছেন,—

"যস্ত্বিহ বা অগম্যাং স্ত্রিয়ং পুরুষোঽগম্যং বা পুরুষং যোষিদভিগচ্ছতি, তাবমুত্র কশয়া তাড়য়ন্তস্তিগ্ময়া শূর্ম্ম্যা লোহময্যা পুরুষমালিঙ্গয়ন্তি স্ত্রিয়ঞ্চ পুরুষরূপয়া শূর্ম্ম্যা।

যস্ত্বিহ বৈ সর্ব্বাভিগমস্তমমুত্র নিরয়ে বর্ত্তমানং বজ্রকণ্টকশাল্মলীমারোপ্য নিষ্কর্ষন্তি ॥"

ইহলোকে যে ব্যক্তি অগম্যা স্ত্রীতে, কিংবা যে স্ত্রী অগম্য-পুরুষে অভিগমন করে, পরকালে যমদূতগণ সেই পুরুষ বা স্ত্রীকে 'তপ্তশূর্ম্মী'নামক নরকে লইয়া গিয়া কশাঘাত করে এবং পুরুষকে তপ্ত-লৌহময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি ও স্ত্রীকে তদ্রূপ পুরুষ-মূর্ত্তি-দ্বারা আলিঙ্গন করায়।

যে ব্যক্তি ইহলোকে পশ্বাদিতেও অভিগমন করে, পরকালে যমকিঙ্করগণ তাহাকে 'বজ্রকণ্টকশাল্মলী'-নামক নরকে নিক্ষেপ করে। ঐ নিরয়ে এক শাল্মলীবৃক্ষ আছে ; উহার কণ্টক বজ্রতুল্য ; যমদূতগণ পাপীকে উহার উপর চড়াইয়া টানিতে থাকে।

ইহাদের জন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উপদেশ দিয়াছেন ;—

"যতদিন হৃদয়-শোধন নয়,
ঘর ছাড়্‌লে পরে 'মর্কট-বৈরাগী' তা'রে কয় ;
হৃদয়-দোষে, রিপুর বশে পদে পদে তা'র পতন ॥

* * *

ঘরে বসে' পাকাও নিজের মন,
আর সকলদিন কর হরির নাম-সংকীর্ত্তন ;
তবে চাঁদ-বাউলের সঙ্গে শেষে কর্‌বি সংসার বিসর্জ্জন ॥

*　　*　　*

জীবের এই অপরাধ শীঘ্র কর দূর ;
যজি' গৃহীর ধর্ম্ম, সু-স্বধর্ম্ম, শুদ্ধ কর অন্তঃপুর ॥
ন্যাসি-মান-আশা ত্যজি', দীনভাবে কৃষ্ণ ভজি',
স্বভাবগত ধর্ম্ম যজি', নাশ' দোষাঙ্কুর ;
তবে কৃষ্ণ পা'বে, দুঃখ-যা'বে, হ'বে তুমি সুচতুর ॥

*　　*　　*

ভেক ধরি' চেষ্টা ক'রে,　　ভেকের জ্বালায় শেষে মরে,
নেড়ানেড়ী ছড়াছড়ি, আখড়া বেঁধে বাস ;
অকাল কুষ্মাণ্ড, যত ভণ্ড,　　কর্‌ছে জীবের সর্ব্বনাশ ॥
শুক, নারদ, চতুঃসন,　　ভেকের অধিকারী হ'ন,
তাঁ'দের সমান পার্‌লে হ'তে ভেকে কর্‌বে আশ ;
বল তেমন বুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, ক'জন ধরায় কর্‌ছে বাস ?
আত্মানাত্ম-সুবিবেকে,　　প্রেমলতায় চিত্ত-ভেকে,
ভজন-সাধন-বারিসেকে করহ উল্লাস ;
চাঁদ-বাউল বলে, এমন হ'লে, হ'তে পার্‌বে' 'কৃষ্ণদাস' ॥"
(বাউল-সঙ্গীত—৯, ১০, ১১)

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিচার-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন (চৈঃ শিঃ ২।৪),—"ব্রাহ্মণস্বভাব ব্যক্তিগণের ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার। গৃহস্থাশ্রমে সর্ব্ববর্ণের অধিকার। মানবজাতি সাধারণতঃ গৃহস্থ। কেহ কেহ বিশেষ অধিকার লাভ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সংখ্যা অতি

অল্প।" অতএব পশুপ্রবৃত্তির ব্যক্তিগণ বা রজস্তমোগুণাক্রান্ত রিপুতাড়িত ব্যক্তিগণের জন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ; বানপ্রস্থাশ্রম বা সন্ন্যাসাশ্রম নহে, বর্ণাশ্রমত্যাগের পর যে ভেকধারণ, তাহা ত' দূরের কথা।

কেহ কেহ মনে করেন—'শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের যুগে নেড়ানেড়ীর ছড়াছড়ি হইয়াছিল, এইজন্যই তিনি অকাল-ভেকের এত নিন্দা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী যুগে সেইরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পরিত্যাগরূপ ভেকপ্রথার পরিবর্ত্তে শুদ্ধবর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া কর্ম্মার্পণরূপ ভাগবতধর্ম্ম যাজনের উপদেশ প্রচারিত হইয়াছে। স্ব-স্ব যোগ্যতানুসারে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী বর্ণাশ্রমে থাকিয়া শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষবিধানে যত্নবান্ হইয়াছেন ; ইহাই ক্রমপথ বা অধিকারানুযায়ী ব্যবস্থা। যদি পতনের আশঙ্কায় সকলেই গৃহস্থ হইয়া পড়েন, তবে গৃহব্রত-ধর্ম্মেরই প্রসার হইবে ও বহির্ম্মুখ-গৃহান্ধকূপমণ্ডূক হইয়াই দুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবন যাপন করিবেন. কেহই অকিঞ্চন ও ত্যাগী হইয়া নিরপেক্ষভাবে সত্যকথা প্রচার বা সার্ব্বকালিক ভগবৎসুখানু-সন্ধানময় আদর্শ সেবাচেষ্টা প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। গৃহিগণ স্ব-স্ব ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। তাঁহাদের পশ্চাদাকর্ষণ আছে। তাঁহাদের দ্বারা কোনদিনই লোককল্যাণকর মহৎ কার্য্য হইতে পারে না। আর কোন প্রতিষ্ঠানও ত্যাগী ব্যক্তি না হইলে চলিতে পারে না। সকলে যদি স্ব-স্ব স্ত্রীপুত্রের সেবা লইয়া গৃহের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, তবে সাধারণের উপকার বা

জগন্মঙ্গলকর কোন কার্য্যই হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গ সকলেই গৃহত্যাগী। দ্বিতীয়তঃ শ্রীমদ্ভাগবতের (১।৫।১৭-১৯) উপদেশেও দৃষ্ট হয়,—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥
তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীরংহসা॥
ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজে-
ন্মুকুন্দসেব্যান্যবদঙ্গ সংসৃতিম্।
স্মরন্ মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুন-
র্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ॥"

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির শ্রীচরণকমল ভজন করিতে করিতে অসিদ্ধাবস্থায়ও যদি ভজন হইতে কোন প্রকারে ভ্রষ্ট অথবা মৃত্যু হয়, তথাপি কোন অমঙ্গল-আশঙ্কা করিতে হইবে না। বর্ণাশ্রম-ত্যাগফলে যদি নীচজাতিতেও জন্মগ্রহণ হয়, তাহা হইলেও কোন অমঙ্গল হয় না। শ্রীহরির ভজনরহিত ব্যক্তির ভক্তিশূন্য স্বধর্ম্ম-পালন-দ্বারা কোন্ প্রয়োজনই বা সিদ্ধ হইতে পারে? "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" এই শ্রুতির প্রমাণবলে স্বধর্ম্মরূপ

কর্ম্ম হইতে পিতৃলোক-প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিলেও কুত্রাপি যাহা পাওয়া যায় না, তাহারই নিমিত্ত বিবেকী ব্যক্তি প্রকৃষ্টরূপে যত্ন করিবেন ; কেননা, গভীর বেগশালী কালের প্রভাবে দুঃখ যেমন বিনা যত্নেই লাভ হয়, তদ্রূপ বিষয়সুখও নিজকৃত পূর্ব্ব-কর্ম্মফলেই স্বর্গ নরকাদি সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। স্বধর্ম্মরূপ কর্ম্মদ্বারা যে অর্থ বা ফল, তাহা – অর্থাভাস, অর্থ নহে ; সেইজন্য ঐহিক নশ্বর ফললাভার্থ কর্ম্ম করা অনুচিত। অহো! কর্ম্মী জনাদির ন্যায় শ্রীমুকুন্দের পাদপদ্ম-সেবী ব্যক্তি কখনও কোন কারণে কুযোনিপ্রাপ্ত হইলেও কর্ম্মফলভোগময় সংসারে নিশ্চয়ই ভ্রমণ করেন না। কেননা, রসস্বরূপ ভগবানে আগ্রহপরায়ণ রসিক ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ শ্রীভগবৎ পাদপদ্মের আলিঙ্গন স্মরণ করিয়া তাহা আর পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করেন না।

শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা হইলে কর্ম্মকাণ্ডে বর্ণাশ্রম পালনের আন্তরিক উৎসাহ অথবা 'বর্ণাশ্রমের অপালনে দোষ হইবে', এভয় থাকে না। বর্ণাশ্রমত্যাগের পর যদি কোন কারণে ভক্ত্যনুষ্ঠান না করা যায়, তাহা হইলে কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ? যদি বল—"বর্ণাশ্রম-ত্যাগে পাপ হয়, অতএব সেই বর্ণাশ্রমত্যাগী ও ভক্তির সাময়িক যাজন-ত্যাগীর পাপ-ফল নিশ্চয়ই হইবে," তদুত্তর এই যে, তাঁহার পাপ হইবে না, সুতরাং বর্ণাশ্রমত্যাগের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বা অনু-তাপেরও প্রয়োজন নাই। বর্ণাশ্রমত্যাগফলে যদি নীচজাতিতে জন্মগ্রহণও হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বজন্মে যেটুকু ভগবদুপাসনা হইয়াছে, উহার পর হইতে ভজন আরম্ভ হইবে ; নূতন করিয়া

আর আরম্ভ করিতে হইবে না। হ্লাদিনীশক্তির ভক্তিবৃত্তির সেখানে অভাব নাই ; সুতরাং কিছু ক্ষতি নাই।

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বা হ্লাদিনী-শক্তির ভক্তিবৃত্তি মহৎকৃপা ব্যতীত উদিত হয় না, সুতরাং সকলেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক হরি-তোষণ—হরিভজন বা কর্ম্মার্পণ ত্যাগ করিয়া ভক্তিজনিত বৈরাগ্যের চিহ্ন-ধারণের অধিকারী হয় না।

ভক্তিকথা-কীর্ত্তনকারী প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘ সংরক্ষণ করিতে হইলে ত্যাগী লোকেরই প্রয়োজনীয়তা আছে স্বীকার্য্য, কিন্তু কৃত্রিমপন্থী ত্যাগীর অভিনয়কারী বা অন্তরে রজস্তমোগুণোত্থ-পশুবৃত্তিযুক্ত থাকিয়া বাহ্যতঃ প্রতিষ্ঠাদিলাভার্থ বৈরাগ্যের চিহ্নধারী ব্যক্তিগণের দ্বারা যে সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান রচিত হয়, তাহাতে কোন আদর্শ-আচারময়ী শিক্ষাই কেহ লাভ করিতে পারেন না, বরং ঐ সকল আদর্শ দেখিয়া কর্ম্মিজীবগণও নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করে। অনধিকারী ত্যাগী ব্যক্তিগণের দ্বারা রচিত সঙ্ঘে বা প্রতিষ্ঠানে প্রচ্ছন্ন পাপ-কার্য্যই প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয় এবং পাপ হইতে ক্রমে ক্রমে অপরাধের সূচনা হইয়া থাকে। সেইরূপ পাপী ও অপরাধীর সঙ্ঘদ্বারা কখনই ভক্তিপ্রচার বা জগতের মঙ্গল হইতে পারে না।

তবে ইহাও নহে যে, তথাকথিত বৈধগৃহব্রত-ধর্ম্ম যাজনে কোন পাপ, অপরাধ বা পতনের আশঙ্কা নাই। প্রবৃত্তির বশে শাস্ত্রের বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলে যে-সকল ছাগধর্ম্মের আদর্শ গৃহমেধীয়জীবনে দেখা যায়, তাহাতে পাপ, পতন ও অপরাধের মাত্রা কোন অংশে কম নাই। আধুনিক কালে শাস্ত্রশাসনরহিত

কেবল আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলক যে সকল গৃহমেধীয় জীবনের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সমূহ পাপ ও অপরাধের খনি এজন্যই শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—"অকুটিল চিত্ত ব্যক্তি-গণই যযাতি-সৌভরি-প্রভৃতি ব্যক্তিগণের ন্যায় শাস্ত্রসম্মত ভোগ স্বীকার করিতে করিতে বিরাগ লাভ করিতে পারে।" আধুনিক-কালে সশস্ত্র শাসনের ভয়রহিত, অত্যন্ত স্বতন্ত্র, সর্ব্বক্ষণ ইন্দ্রিয়-চালনরূপ ছাগধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ গৃহস্থধর্ম্ম-যাজনের অভিনয়ে তথাকথিত বৈধ ও অবৈধ ভোগের চরমশিখরে উপনীত হইয়াও এবং তজ্জন্য নানাবিধ ক্লেশ, জ্বালা-যন্ত্রণা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে নিষ্পেষিত হইয়াও ভোগ হইতে নির্ব্বেদ লাভ করিতে পারে না। এইরূপ শাস্ত্র-শাসন-রহিত গৃহমেধীয় ধর্ম্মে প্রবেশ করিলে কাহারও মঙ্গল হইবে না অর্থাৎ কেহ মুক্তির দ্বার কর্ম্মার্পণরূপ ভাগবত-ধর্ম্মে প্রবেশ বা চিত্তশুদ্ধি, বৈরাগ্য বা জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অকাল-ভেকের যেরূপ নিন্দা করিয়াছেন, শাস্ত্রশাসনরহিত ছাগধর্ম্মপরায়ণ গৃহমেধীয় ধর্ম্মের তদধিক নিন্দা করিয়াছেন। গৃহমেধীয় ধর্ম্ম যাজন করিলে পতন নাই,—এরূপ কথা নহে বা 'গৃহস্থের সাত খুন মাপ' তাহাও নহে। অনুক্ষণ পতিত ব্যক্তির পুনঃ পুনঃ পতনকে যদি কেহ পতনের মধ্যে গণ্য না করেন, তাহা স্বতন্ত্র কথা। সেইরূপ অবৈধ, পতিত ও অপরাধী গৃহস্থ শাস্ত্রানুমোদিত গৃহস্থ নহে। বৈষ্ণবধর্ম্মপরায়ণ শাস্ত্রশাসনসম্মানকারী বর্ণাশ্রমী ক্রমে ক্রমে মঙ্গললাভ করিতে

পারেন। শাস্ত্র ও মহাজন অকালভেকধারীর নিন্দা করিয়া বিষ্ণু-তোষক-সদাচার-পরায়ণ বর্ণাশ্রমী হইয়া অথবা বিষ্ণুকর্ম্মার্পণপর গৃহস্থজীবন যাপন করিয়া শ্রীহরির সাম্মুখ্যলাভের কথাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় বলিতে গেলে ত্যাগি-বাউল ও গৃহি-বাউল – উভয় সাম্মুখ্যের বিপরীত পথে চলিয়া জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছে। অকালে ভেক ধারণ করিয়া অর্থাৎ অনধিকারী হইয়া ত্যাগি-বাউল সাজা যেরূপ অবৈধ পাপ ও অপরাধজনক, অনধিকারী হইয়া গৃহি-বাউল সাজা অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ সদাচারী গৃহস্থের সজ্জাগ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয়াসক্ত বা জড়াসক্ত গৃহী হইয়াও সেইরূপ অবৈধ পাপ ও অপরাধজনক। ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, কেবল বৈরাগ্যের চিহ্ন ধারণকালেই অধিকারের বিচার আছে, গার্হস্থ্যধর্ম্মে প্রবেশে অধিকার-বিচার নাই। বস্তুতঃ শত জন রঙ্‌তারাম অপেক্ষা সমাজে অবস্থানকারী একজন গৃহীর যোগ্যতার বিচার শতগুণে অধিক করিতে হইবে। রঙ্‌তারাম ন্যূনাধিক কেবল নিজের দেহটাই লইয়া বিচরণ করে ; কিন্তু গৃহীকে সমাজ, সংসার ও নানাবিধ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে প্রচুর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতে হয়। অযোগ্য, অনধিকারী ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্রের পালক ও অভিভাবক হইতে পারে না। যে গৃহী ব্যক্তি নিজের ইন্দ্রিয়গ্রামকেই স্ববশে রাখিতে পারে না, সে কি করিয়া স্ত্রী-পুত্রের বা সংসার-সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে ?

ভোগ করিতে হইলেও যোগ্যতা ও অধিকারের অনিবার্য্য

আবশ্যকতা আছে। সকলেরই ভোগ করিবার ক্ষমতা নাই। ভোগ করা দূরে থাকুক, ভোগবাসনায় চিত্ত উত্তেজিত হইবার পূর্ব্বেই অযোগ্য ব্যক্তি শত-সহস্রধার মৃত্যুদশায় পতিত হয়। সুতরাং তাহার ভোগ আর হয় না, ভোগের পরিপূর্ত্তি না হওয়ায় বাসনাও ক্ষয় হয় না এবং নির্ব্বেদও আসে না।

এজন্য যাহারা ত্যাগে ও ভোগে উভয়রাজ্যে অনধিকারী—ঠুঁটোরাম, তাহাদের হৃদয়ে যদি কোন ভাগ্যফলে অন্ততঃ নিজ অযোগ্যতার তীব্র-উপলব্ধি, আত্মধিক্কার, দৈন্য. নিজ অযোগ্যতা-জনিত অশ্রু ও অশরণ্যের একমাত্র শরণ্য হীনার্থাধিকসাধক, বাঞ্ছাতীতফলপ্রদ, মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তাটি উদিত হয় এবং তাহারা যদি হৃদয়ের সহিত অকপট অশ্রুজলে সেই দুই প্রভুর শ্রীচরণকমলে এই বলিয়া আত্মনিবেদন জানান,—

"হা গৌর-নিতাই! তোরা দু'টি ভাই,
পতিত-জনের বন্ধু।
অধম পতিত, আমি হে দুর্জ্জন,
দয়া কর কৃপাসিন্ধু॥"

—তাহা হইলে পতিতপাবন-শিরোমণি দুই ঠাকুর অযোগ্যতম পতিতাধম জীবকেও অমায়ায় কৃপা বিতরণ করিতে পারেন; তথায় কোন যোগ্যতা বা অধিকারের অপেক্ষা করে না—কোন প্রকার বাহ্য-বেশ গ্রহণেরও প্রয়োজনীয়তা হয় না। নিজের অযোগ্যতার তীব্রতম-অনুভূতি হইতে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে ক্রন্দন ও শরণা-

গতিময় চিন্তার উদয় হয় ; তাহা সর্ব্ববিধ যোগ্যতার মস্তকে নৃত্য করিয়া জীবকে কৃতার্থ করে। চিত্ত অপরাধহীন থাকিলে পতিত-জনের বন্ধু শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর তাঁহাদের নিজজনের দ্বারা আলোকী, বাচিকী ও হার্দ্দী কৃপা করিয়া জীবকে কৃতার্থ করেন।

—:*:—

শ্রদ্ধা

শ্রীহরিভজনকারীর সর্ব্বপ্রথম যোগ্যতাই— 'শ্রদ্ধা'। কোন প্রকারে কোন বিষ্ণুতীর্থে বা কোন ভক্তসজ্বারামে কৃপাপূর্ব্বক আগত বা অবস্থিত মহতের শ্রীঅঙ্গের বাতাস যদি জীবের শরীরে লাগে অর্থাৎ নিরপরাধে তাঁহার বাণী শ্রবণ, পাদস্পর্শ, সম্ভাষণাদির দ্বারা যদি সঙ্গ হয়, তবে সেই সৌভাগ্য শ্রদ্ধার উদয় করায়। সাধুমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিবার পর শ্রদ্ধা বা মহিমজ্ঞান লাভ হয়। 'ভক্তিতেই আমার নিত্যমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী, ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই করিব না' --এইরূপ দৃঢ়তার নামই 'শ্রদ্ধা'; তখন আপনা হইতেই কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি নির্ব্বেদ বা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা বা তৃপ্তি আসে। অতএব পরতত্ত্বের মহিমজ্ঞানই 'শ্রদ্ধা'।

ভক্তির মাহাত্ম্য যাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাঁহাকে কর্ম্ম জ্ঞান, বৈরাগ্য বা অভক্তির মাহাত্ম্য আকৃষ্ট করে না। ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অভক্তির প্রতি বিতৃষ্ণা আসে, ইহাই

'বৈরাগ্য'। ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত হয়।

'শ্রদ্ধা'-শব্দে 'আদর' বুঝায়। আদরহীন ভক্তিতে তত ফল হয় না; পদে পদে বিঘ্নের সম্ভাবনাও অত্যন্ত বেশী থাকে। সমস্ত অপরাধের মূলই ভগবান্, ভক্ত, ভক্তি ও তৎসম্পর্কিত বস্তুতে অনাদর। অনাদর বা শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার ও অপরাধ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। অতএব অশ্রদ্ধা ও অপরাধ একই। অপ্রাকৃত ও অসমোর্দ্ধ বস্তুর অপ্রাকৃতত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকারপূর্ব্বক নিজের সমান ভূমিকায় অবস্থিত মনে করিয়া সমালোচনা বা ছিদ্রান্বেষণ করিতে যাওয়াই অশ্রদ্ধার লক্ষণ। শ্রদ্ধা হইতেই ভক্তিতে অনুক্ষণ প্রযত্ন-শীলতা আসে, কখনও ভক্তির অনুষ্ঠানের প্রতি শৈথিল্যের উদয় হয় না। যদি কোনপ্রকার হৃদয়দৌর্ব্বল্য থাকে, পুণ্যকর্ম্মাদিতে আসক্তি থাকে, তৎপ্রতিও তখন গর্হণবৃত্তি উপস্থিত হয়।

শ্রদ্ধা 'লৌকিকী' ও 'শাস্ত্রীয়া' ভেদে দ্বিবিধা। ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তি বা তৎসম্পর্কিত বস্তুতে লোকপরম্পরায় যে আদর বা তাহাদের মহিমজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ, তাহা 'লৌকিকী শ্রদ্ধা'; আর শাস্ত্র বহির্ম্মুখ মানবজাতির জন্য যে-সকল নিত্য শাসন বিধান করিয়াছেন, তাহা পরমমঙ্গলময় বলিয়া দৃঢ়তার সহিত অবিচলিত বিশ্বাসই 'শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা'। এই শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা অনন্যা ভক্তির মূল। এই শ্রদ্ধা অপরাধের জননী অশ্রদ্ধাকে নষ্ট করে। এই শ্রদ্ধার দ্বারা ভগবত্তোষণ হয়। ভগবান্, ভক্ত ও তদ্বস্তুতে জীবের আদর দেখিলে ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। 'শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা' হইলে

পাপ থাকে না ; যদি বা দৈবাৎ পাপ উপস্থিত হয়, তাহাতে আদর থাকে না। লৌকিকী শ্রদ্ধাতেও পাপ করিতে গেলে মনে কশাঘাত লাগে ; তখন সে আর পাপ করে না, শীঘ্রই পাপ ছাড়িয়া দেয়। যাহার মনে কোনরূপ কশাঘাত লাগে না, তাহার শ্রদ্ধা-লেশও হয় নাই।

শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার উদয় হইলে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বাভাবিকভাবেই পরিত্যক্ত হয়। কৃত্রিমভাবে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ছাড়িবার প্রবৃত্তি শ্রদ্ধার লক্ষণ নহে। অন্য দেবতাকে স্বতন্ত্র-ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া বিষ্ণুর সহিত যে ভেদবুদ্ধি, তাহা পরিত্যাগ ও স্বরূপতঃ বর্ণাশ্রম ত্যাগ শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার তটস্থ লক্ষণ। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাবান্ বর্ণাশ্রম পরিত্যাগ করেন বলিয়া কোন পাপপ্রবৃত্তি পোষণ বা পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। যদি দৈবাৎ কোন পাপপ্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহা হইলে তিনি চিন্তা করেন,—'শ্রীবিষ্ণু ত' পাপ করিলে অসন্তুষ্ট হইবেন, ফলে আমার অপরাধ হইবে, ভজনোন্নতি হইবে না।' এই চিন্তা শ্রীভগবান্ই অন্তর্য্যামিসূত্রে শ্রদ্ধালুর হৃদয়ে উদয় করান ; তখন আর তাঁহার পাপানুষ্ঠানের ইচ্ছা হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—'শাস্ত্রতাৎপর্য্যে বিশ্বাসের নামই 'শ্রদ্ধা'। 'ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তির মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনকারী শাস্ত্র যাহা বলিতেছেন, তাহা আমার একান্ত নিশ্চিত মঙ্গলের জন্যই'—এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসই 'শ্রদ্ধা'। শাস্ত্র শ্রীভগবানে অনন্যা 'শরণাগতি'র কথাই বলেন। এই পৃথিবীতে কেহই দুঃখ বা বাধাপ্রাপ্ত সুখ চাহে না। এই বাধাটাই আশঙ্কা বা ভয়। এই ভয়

তথাকথিত সুখকে দুঃখে রূপান্তরিত করে। এই বিঘ্ন ও আত[ঙ্ক] দূর করিয়া শাস্ত্র অশরণকে শরণ, শোকগ্রস্তকে সান্ত্বনা ও ভীতকে আশ্বাস প্রদান করেন। শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাওয়া যাইতে পারে না; পদে পদে ভয়, বাধা ও বিঘ্ন আসিবেই। শাস্ত্র এই পরম সত্যের সন্ধান প্রদান করেন। শাস্ত্রের মাহাত্ম্য ও কার্য্যই এই যে, তাহা 'শরণাগতি'র কথা কীর্ত্তন করেন। অতএব সেই শরণাগতির শিক্ষক শাস্ত্রের বাক্যে যিনি সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁহারই শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে জানিতে হইবে। ছয়প্রকার শরণাগতির উদয়ই শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার লক্ষণ।

শ্রদ্ধা হইলে কর্ম্মকাণ্ডে বা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনে আন্তরিক উৎসাহ বা 'অপালনে দোষ হইবে', এই ভয়ও থাকে না। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন,—'বর্ণাশ্রম ধর্ম্মত্যাগও ত' পাপ। আবার বর্ণাশ্রমধর্ম্মত্যাগের পর যদি ভক্ত্যনুষ্ঠানটীও কোনক্রমে না হয়, তাহা হইলে কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না?' তদুত্তরে শাস্ত্র ও সাধুগণ বলিয়াছেন,—না। বর্ণাশ্রমধর্ম্মত্যাগের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বা অনুতাপ করিবার প্রয়োজন নাই। বর্ণাশ্রম-ত্যাগের ফলে যদি নীচ-জাতিতেও জন্মলাভ হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বজন্মে যে পর্য্যন্ত ভগবদ্-উপাসনা করা হইয়াছিল, তাহার পর হইতেই ভজন আরম্ভ হইবে, একেবারে 'কেঁচে গণ্ডূষ' করিতে হইবে না। শ্রীহ্লাদিনী-শক্তির কৃপার যে-স্থানে অভাব হইল না, সে-স্থানে ক্ষতির কিছুই নাই। শ্রীগীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সত্ত্বগুণ-সম্পর্কিত ব্রহ্মজ্ঞান-পর্য্যন্ত

পরিত্যাগের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা থাকিলে অনন্যা ভক্তি থাকিবে; অনন্যা ভক্তি থাকিলেই চিত্তকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া অভীষ্টদেবের সুখ হইতেছে কিনা—এই চিন্তা করাইবে। শ্রীভরত মহারাজ একমাত্র শ্রীনামাশ্রয় ব্যতীত অন্য কিছু করেন নাই। তিনি যজ্ঞাদি অন্য যাহা কিছু কার্য্য করিতেন, তাহাও শ্রীনামাশ্রয়েই করিতেন। ইহাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা ব্যতীত অনন্যা ভক্তি হয় না। অতএব শ্রদ্ধা অনন্যা ভক্তির বিশেষণ।

অনন্যা ভক্তি বিধি-সাপেক্ষা নহে; অগ্নির দাহনের ন্যায় তাহা স্বাভাবিকভাবেই ফল দেয়। নিরন্তর ভগবৎ-সুখানুসন্ধানমূলে যে নববিধা ভক্তি, তাহার স্বভাব এই যে, তাহা শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসিয়া 'সুখী' দেখিতে প্ররোচিত করে, শ্রীভগবান্‌কে 'যথা-সর্ব্বস্ব' বলিয়া বোধ করায়। নবধা ভক্তির গঠনেই এইরূপ ফলদানকারিণী শক্তি আছে। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার সহিত অনন্যা ভক্তিতে শীঘ্র ফল হয়। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা ব্যতীত নবধা ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে বিলম্বে ফল পাওয়া যায়। শ্রদ্ধা না থাকিলেও যাঁহারা মূর্খ ও অকুটিল, তাঁহারা ভক্তির আকার-মাত্র অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবদন্তর্গত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন। এখানে কিন্তু 'শ্রদ্ধা ও হেলার দ্বারা সমান ফল অর্থাৎ মুক্তি হয়' মনে করিয়া জানিয়া শুনিয়া হেলা করিলে মহাদৌরাত্ম্য হইয়া যাইবে। অজ্ঞাত-ভাবে হেলাপূর্ব্বক হইলেও যদি অপরাধ না থাকে, তাহা হইলেই ফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি জানিয়া

শুনিয়া হেলা করে, তবে তাহাতে ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হইবে ; যেমন, কাষ্ঠ আর্দ্র থাকিলে অগ্নির শক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়। বেণরাজের মাৎসর্য্যের অস্তিত্ব-নিবন্ধন ভগবন্নাম-উচ্চারণরূপ ভক্তির বস্তুশক্তি বাধিত হইয়াছিল।

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার লক্ষণ— জাগতিক সুখ-দুঃখে বিহ্বলতার অভাব। ভগবৎ-সুখানুসন্ধানে আবিষ্ট হইয়া, সুখ দুঃখে অবিকৃত থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহার দয়ার কথা স্মরণ করিতে হইবে। যাহার এইটুকু হয় নাই, তাহার শ্রদ্ধাও হয় নাই। শ্রদ্ধাবানের কখনও ভগবৎ-সম্বন্ধি দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ায় অনাদর উপস্থিত হয় না। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভজন করিতে করিতে অশ্রদ্ধালু হইয়া পড়িলে অপরাধ-ফলে ভজন স্থগিত হইয়া যায়। শ্রদ্ধাবান্ স্বর্ণ-লাভ-বিষয়ে সিদ্ধি-লিপ্সুর ন্যায় সিদ্ধি লাভ করা পর্য্যন্ত নিরন্তর নিরলস হইয়া অব্যাহত গতিতে মহতের অনুবর্ত্তন করেন। শ্রদ্ধালুর দম্ভ (কাপট্য), প্রতিষ্ঠাশা অর্থাৎ ইহকালে ও পরকালে কিছু আখেরের ব্যবস্থা করিয়া লইবার বুদ্ধি বা মহতের প্রতি অপরাধ থাকে না।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীচিত্রকেতুর ন্যায় শ্রীসঙ্কর্ষণের ভক্ত ও শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধালুরও যখন শ্রীশিবের চরণে অপরাধ হইয়াছিল, তখন জীবের সম্বন্ধে আর কি কথা ? বস্তুতঃ চিত্রকেতু নিজ বৈষ্ণব-স্বভাব আচ্ছন্ন রাখিয়া বৈষ্ণবের স্বরূপ না জানিবার বা অনাদর করিবার যে আকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন তৎফলে অশ্রদ্ধার আকার প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি ইহা সাধকের সতর্কতা-বিধানের জন্যই অভিনয় করিয়াছিলেন।

প্রারব্ধ-কর্ম্মফলে বা পাপ-বশে যদি শ্রদ্ধালু সাধকের বিষয়-সঙ্গ হয়, তাহা হইলে তিনি জানেন যে, নিশ্চয়ই ইষ্টদেব অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, না হইলে ঐরূপ বিষয় দিলেন কেন ? তখন তিনি মনে মনে কেবল গর্হণ বা আত্মধিক্কার করিতে থাকেন। ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান-স্মৃতি ও আত্মধিক্কার-বৃত্তি থাকিলে বিষয়-সংস্পর্শ ঘটিলেও বিষয় কিছু করিতে পারে না।

শ্রীগীতার "অপি চেৎ সুদুরাচারো"-বাক্যে সগুণা লৌকিকী শ্রদ্ধার কথাই বলা হইয়াছে। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধায় পাপপ্রবৃত্তিই থাকে না, কদাচিৎ প্রতীয়মান হইলেও তৎক্ষণাৎ তাহা নষ্ট হইয়া যায়। লৌকিকী শ্রদ্ধায়ও পাপপ্রবৃত্তি বেশীক্ষণ থাকে না, শীঘ্রই সদাচারে চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং শাস্ত্রীয়া বা স্মৃতিময়ী শ্রদ্ধা লাভ করিয়া ঐকান্তিকী ভক্তি বা শান্তি বা নিষ্ঠাতে উহা পর্য্যবসিত হয়। অতএব লৌকিকী শ্রদ্ধাও ব্যর্থ নয়, কর্ম্মজ্ঞানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লৌকিকী শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণের উদয় করায়। লৌকিক শ্রদ্ধালুর আপাত পাপাচরণ তাঁহার সাধুত্বের ব্যাঘাত করে না। রজস্তমোগুণের দেবতাকে পূজা করিলে সত্ত্বগুণের উদয় হয় না। সুতরাং লৌকিক-শ্রদ্ধালুর রজস্তমোগুণের দেবতার প্রতি স্বতন্ত্র-বুদ্ধিতে মহিমজ্ঞানের উদয় হয় না। লৌকিকী শ্রদ্ধা পূর্ণ হইলেই শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা হয়। লৌকিকী শ্রদ্ধায় ভক্ত্যঙ্গের মাহাত্ম্য সত্য কি মিথ্যা,—এইরূপ বিচার উপস্থিত হয় ; যেমন, শ্রীবিষ্ণুচরণামৃতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া প্রথমে মনে বিচার উপস্থিত হয় যে, ইহা কি সত্য ? তখন একটী যুক্তিও হৃদয়ে আসে—যদি ব্যবহারিক মণি, মন্ত্র ও ঔষধিরই

অচিন্ত্য ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে অপ্রাকৃত ভগবংসম্বন্ধি বস্তু শ্রীচরণামৃতে যে অবিচিন্ত্য প্রভাব থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? এইভাবে শ্রীচরণামৃতের প্রতি অবিশ্বাসের অংশ বিদূরিত হইয়া বিশ্বাস নিশ্চিত হয় এবং তখনই শ্রদ্ধা পূর্ণতা লাভ করে।

মহাজনগণ বলিয়াছেন—ভক্তিতে যাঁহার লৌকিকী শ্রদ্ধাও হইয়াছে, তাঁহাকেও কর্ম্মের উপদেশ দিতে হইবে না। যাঁহার শ্রদ্ধা হইয়াছে তাঁহার আর কর্ম্মের অধিকার নাই। সম্বন্ধজ্ঞানকেই 'শ্রদ্ধা' বলা যায়। কিন্তু যে অজ্ঞ, তাহার ত' সম্বন্ধজ্ঞান নাই, সুতরাং তাহার শ্রদ্ধাও নাই। এজন্য যদি স্পষ্টভাবে কোন স্থানে শ্রদ্ধা না দেখা যায়, তথায় কোন প্রাচীন সংস্কার অনুমান করিয়া হরিকথা-শ্রবণের ফলে তাহার শ্রদ্ধা হইতে পারে,—এইরূপ নির্ণয় করিয়া তাহাকে হরিকথা বলা যাইতে পারে। অনেক সাধারণ সভাসমিতিতে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিও থাকিতে পারেন,—এইরূপ অনুমান করিয়াই হরিকথা বলা হয় ; নতুবা অশ্রদ্ধালুকে হরিনামের উপদেশ করিলে অপরাধ হয়। এইরূপ কোন প্রাচীন সংস্কার কাহারও মধ্যে সুপ্ত আছে কিনা, তাহা একমাত্র প্রকৃত সাধুই বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারেন।

শ্রীভগবৎকথায় শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা থাকিলে আর কর্ম্মকাণ্ড করিতে হয় না। ভক্তিমাত্র অর্থাৎ ভক্তির আকারমাত্র দেখা গেলে অবশ্য শ্রদ্ধার দরকার নাই। যেমন, শ্রীঅজামিল পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া শব্দব্রহ্মের আকারটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ ভক্তিমাত্র করিয়াছিলেন ; এখানে শ্রদ্ধা নাই, অপরাধ ছিল না বলিয়া ফল পাইয়া গেলেন।

শ্রীকপিলদেব বলিয়াছিলেন,—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥"

(ভা ৩।২৫।২৫)

সাধুগণের প্রসঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যপ্রকাশক শুদ্ধ হৃৎকর্ণের প্রীতি-উৎপাদক যে সকল কথা শ্রুত হয়, তাহা সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির পথস্বরূপ আমাতে শ্রদ্ধা, তৎপরে ভাবভক্তি ও তৎপরে প্রেমভক্তি যথাক্রমে উদিত হয়।

এই শ্লোকে যে সাধুগণের প্রসঙ্গের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা ভজনের পূর্ব্বাঙ্গ, পরাঙ্গরূপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ সুখানুসন্ধানময় অভিনিবেশ বা আবেশের সহিত যে প্রকৃষ্ট সঙ্গ, তাহা নহে। সাধনভক্তিতে শ্রদ্ধা ও রুচির তারতম্য, আর রতি ও প্রেমে উল্লাসের তারতম্য হয়। 'ভক্তি'-শব্দে এস্থানে 'প্রেমভক্তি'। 'রতি' বা ভাবভক্তি, 'ভক্তি' বা প্রেমভক্তি ভজনের পরাঙ্গ। হৃদয় ও কর্ণের যে রসায়ন অর্থাৎ শ্রবণার্থ উৎসাহ, তাহা ভজনের পূর্ব্বাঙ্গ, ইহা ভক্তিমাত্র; তখনও অনন্যা ভক্তি আরম্ভ হয় নাই। যদি নিরন্তর প্রীতির সহিত শ্রীহরিকথা-শ্রবণের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার উদয় হয়। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার সহিত ভজন করিবার ফলে সাধ্যভক্তি 'রতি' ও 'প্রেমে'র উদয় হয়।

—:*:—

নীরাগ বক্তা অপেক্ষা নীরাগ শ্রোতা দুর্ল্লভ

জগতে বক্তার অভাব নাই; উপদেষ্টা, গুরু বা প্রভুরও দুর্ভিক্ষ নাই; কিন্তু সকলেই যেন 'সরাগ' অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি রাগ বা অভিনিবেশযুক্ত। ইহারা লোলুপ, কামী, বাক্যবাগীশ, কিন্তু আচরণহীন; ইহারা জগতের উৎপাত-সৃষ্টিকারী। নীরাগ বক্তা, নীরাগ গুরু, নীরাগ উপদেষ্টা, নীরাগ নিয়ামক, নীরাগ প্রভু জগতে অত্যন্ত দুর্ল্লভ। কোটি কোটি সংসারমুক্ত পুরুষের মধ্যে একজন নীরাগ বক্তা পাওয়া কঠিন। এজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪৮),—

"কোটি-মুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।"

নীরাগ বক্তার অভিনিবেশ ও আবেশের গতি সম্পূর্ণ অন্য দিকে। সরাগ বক্তা, সরাগ গুরু, সরাগ উপদেশকের চিত্তবৃত্তি এই দেবীধাম বা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অস্মিতায় সর্ব্বদা আবিষ্ট। তাঁহারা যত কিছু ধর্ম্মের উপদেশ বা জীবের শুভানুধ্যান করুন, তাঁহাদের মূল লক্ষ্য চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড; তাহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, না হয়, খুব বেশী মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়াই নিরস্ত হয়। সরাগ বক্তা যত কিছু বড় বড় কথা বলুন না কেন, কুকুরের লেজের ন্যায় তাঁহার মেধা জড়ের স্থিতিস্থাপকতা-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না। জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, স্ববশে থাকিয়াই হউক, অবশে থাকিয়াই

হউক. ভূলোকের অস্মিতা, অভিনিবেশ ও আবেশই তাঁহার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। সরাগ বক্তার ধর্ম্মের বক্তৃতা সময়সেবা (Time-serving) মাত্র, কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণ-তোষণ নহে।

নীরাগ বক্তার অভিনিবেশ ও আবেশ—সমস্তই গোলোকের অনুভূতিকে কেন্দ্র করিয়া। সেই দৃষ্টি-ভঙ্গী হইতেই তিনি সমস্ত মঙ্গলামঙ্গল, বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ, বাস্তবতা ও অবাস্তবতা দর্শন করেন। তাঁহার অভিনিবেশের নিকট যাহা বাস্তব, সরাগ বক্তার নিকট তাহা মৌখিক বাস্তব হইলেও কার্য্যকালে অবাস্তবরূপে প্রতিভাত। নীরাগ বক্তা তাঁহার প্রত্যেকটী কথার জন্য আত্মবলি দিতে পারেন। সরাগ বক্তা বক্তৃতামঞ্চে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটাইতে পারেন, করধ্বনির তরঙ্গায়িত রোল উঠাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার বাক্যবাগীশতার একটী শব্দের জন্য কখনও জীবনীশক্তি দান করিতে পারেন না। তাঁহার আত্মবলিদানের শক্তি নাই, মোহিনী মায়া নেপথ্য হইতে তাঁহাকে সর্ব্বদা যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার মত চালনা করিতেছে।

নীরাগ বক্তা সর্ব্বদাই সহজ-ধ্রুবানুস্মৃতিতে অভিনিবিষ্ট। লোলুপ ও কামী সরাগ বক্তার নিকট জগতের যে-কোন মায়ার নাট্য—প্রত্যেক ব্যাপারেই বড়িশের ন্যায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে বিদ্ধ করিতেছে। সে সর্ব্বদাই কষায়যুক্ত; কিন্তু নীরাগ বক্তা নির্ধূতকষায়, নিবৃত্ততর্ষ ও নিরস্তকুহক সত্যের সহজ-সমাধিতে সর্ব্বদা মগ্ন।

"তদ্ভক্তঃ সরিতাং পতিং চুলুকবৎ খদ্যোতবদ্ভাস্করং
মেরুং পশ্যতি লোষ্ট্রবৎ কিমপরং ভূমেঃ পতিং ভৃত্যবৎ ॥
চিন্তারত্নচয়ং শিলাশকলবৎ কল্পদ্রুমং কাষ্ঠবৎ
সংসারং তৃণরাশিবৎ কিমপরং দেহং নিজং ভারবৎ ॥"

(পদ্যাবলী -৫৬)

হে ভগবন্, তোমার ভক্ত জলধিকে গণ্ডূষের ন্যায়, সূর্য্যকে খদ্যোতের ন্যায়, সুমেরুকে লোষ্ট্রের ন্যায়, অপরের কি কথা, পৃথিবীপতিকে ভৃত্যের ন্যায়, চিন্তামণিরত্নসমূহকে শিলাখণ্ডের ন্যায়, কল্পতরুকে কাষ্ঠের ন্যায়, সংসারকে তৃণরাশির ন্যায়, অন্য কথা কি, নিজ দেহকে ভারের ন্যায় বোধ করেন।

সহজবৈকুণ্ঠাভিনিবেশ না হইলে কেহ বক্তা হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ-সুখানুসন্ধানে সহজাভিনিবিষ্ট মহৎই 'গৌড়ীয়'। আবেশধর্ম্ম যাঁহাতে নাই, তিনি 'গৌড়ীয়' নহেন। 'আবেশ'-ধর্ম্ম ব্যতীত শ্রীগদাধরমাদন, শ্রীরূপানন্দ-বর্দ্ধন, শ্রীসনাতন-পালন বা শ্রীরঘুনাথ সর্ব্বস্ব শ্রীগৌরসুন্দরকে পাওয়া যায় না। শ্রীগোপীজনবল্লভকে পাইবার আশা অর্থাৎ অভিনিবেশ যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই 'গৌড়ীয়'। সেই আবেশে আবিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক্। তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া জগতের স্থান, কাল ও পাত্রের দর্শন করেন, তাহা সরাগ বক্তা, সরাগ সাধক বা সরাগ ধার্ম্মিকের দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এজন্যই যুগে যুগে নীরাগবক্তৃগণ 'একটীও লোক পাইলাম না, একটীও বন্ধু হইল না',—এই বলিয়া অনেক সময় জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

পৃথিবীতে যদি কোন সুদুর্ল্লভতম বস্তু থাকে, তাহা হইল শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধান - আবেশময় 'নীরাগবক্তা'। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও দুর্ল্লভতর তাঁহার শ্রোতা। পরমেশ্বরপ্রেরিত হইয়া তাঁহার দূতরূপে দুই-একজন নীরাগবক্তা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন; কিন্তু তাঁহার বাণী শুনিবার লোক অনেক সময়ই পাওয়া যায় না। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অনেক লোকের সমাগম হইতে পারে, কিন্তু প্রায় সকলেই সাময়িক কৌতূহলের তৃপ্তি বা উচ্ছ্বাস-উন্মাদনার তরঙ্গের অবসানে নিজ-ভাগ্যদোষে অপসারিত হয়। তাই শ্রুতি বজ্রগম্ভীরস্বরে গাহিয়াছেন (কঠোপনিষৎ ১।২।৭),—

"আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥"

আত্মার স্বরূপোপদেষ্টা বক্তা দুর্ল্লভ। যদিও কখনও উপদেষ্টা লাভ হয়, কিন্তু শ্রোতা অর্থাৎ শিষ্য অতিশয় দুর্ল্লভ।

সমজাতীয় চিত্তবৃত্তি হইলেই তিনি সুহৃদ্, মিত্র বা বন্ধু হইতে পারেন। 'সু' অর্থাৎ উত্তম 'হৃদয়' অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি যাঁহার অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা অনুমত, যিনি সহৃদয়, যিনি সর্ব্বদা সহায়—তিনি 'সুহৃদ্'। উত্তম মস্তিষ্ক বা বিচারযুক্তি যাহার আছে, তিনি সুহৃদ্ বা বন্ধু নহেন। যিনি স্নেহ-বিশিষ্ট, অথবা যিনি সকল জানেন। তিনি 'মিত্র'। 'মিদ্'-ধাতুর অর্থ স্নেহ করা বা 'মী' গমন করা বা জানা অর্থে প্রযুক্ত হয়। আর যিনি স্নেহ বা প্রীতির দ্বারা চিত্তকে বন্ধন করেন, তিনি 'বন্ধু'। সুতরাং সুহৃদ্, সহৃদয়, মিত্র বা বন্ধু চিত্তবৃত্তির সমতা হইতে হয়, বিপরীত-চিত্তবৃত্তির সহিত বন্ধুতা হইতে

পারে না। চিত্তবৃত্তির পরিচয়, অভিনিবেশ ও আবেশের মধ্যে পাওয়া যায়। বিষয়ীর সহিত বিষয়ীর বন্ধুতা হয়, বিরাগীর সহিত বা চিদ্বিলাসীর সহিত জড়বিষয়ী বা জড়বিলাসীর বন্ধুতা হইতে পারে না। কারণ,—

"বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণী-দিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ ?"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৪৭তম অনুচ্ছেদধৃত শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-বাক্য)

বিষয়াবিষ্ট-চিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে শ্রীবিষ্ণুর সুখানুসন্ধানময় আবেশ সুদূরপরাহত ; কারণ, যে ব্যক্তি পূর্ব্বদিকে গমন করিতেছে তাহার পক্ষে পশ্চিমদিকে অবস্থিত বস্তুর প্রাপ্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুইটী বিপরীত দিক্, তদ্রূপ নীরাগ বক্তা ও সরাগ শ্রোতার মধ্যে গুরু ও শিষ্যত্ব-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। সরাগ শ্রোতা নীরাগ বক্তাকে কখনও আত্মা বা প্রেষ্ঠরূপে বরণ করিতে পারেন না। সুতরাং সরাগ শ্রোতা কখনও 'গুরুদেবতাত্মা' হইতে পারেন না, কারণ, তাঁহার অভিনিবেশের বস্তু সম্পূর্ণ পৃথক্। সরাগ শ্রোতা প্রতি-মুহূর্ত্তে জগতের মূলধন লইয়াই গুরুদেবের সহিত কষাকষি করিবে,—ইহাই বণিকের ধর্ম্ম। সরাগ শ্রোতা—আত্মঘাতী ; প্রকৃত স্বার্থ বা প্রকৃত 'আখেরে'র চিন্তা করে না। প্রতি-মুহূর্ত্তে নীরাগ বক্তার শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানময় আবেশ তীব্র হইতে তীব্রতর-গতিতে প্রকাশিত হয়। অব্যর্থকালত্ব লাভ করিয়াও প্রতি-মুহূর্ত্তে কেন আরও অধিক কৃষ্ণানুসন্ধান হইতেছে

না ?—এই আবেশ-তন্ময়তা তাঁহার চিত্তরাজ্যকে আন্দোলিত করিতে থাকে।

"গতো যামো গতৌ যামৌ গতা যামা গতং দিনম্।
হা হন্ত! কিং করিষ্যামি ন পশ্যামি হরের্মুখম্॥"

(পদ্যাবলী— ৩২০)

এই এক প্রহর গেল, এই দুই প্রহর গেল, এই তিন প্রহরও গেল, আর দিনও চলিয়া গেল ; হায়! আমি কি করিব ? তথাপি ত' শ্রীহরির শ্রীমুখকমলের সাক্ষাৎকার হইল না !!

সরাগ বক্তা—সময়-সেবক (Time-Server) ; তাহার নিকট সময়ই 'অর্থ' (Time is money)। সরাগ বক্তা দেখেন—তাঁহার বক্তৃতার প্রত্যেকটী শব্দ কতটা লোকরঞ্জন করিয়া তাহাদিগের রুধির অর্থাৎ দ্রবিণ ইন্দ্রিয়তর্পণের মাশুলরূপে আদায় করিতেছে। আর নীরাগ বক্তা প্রতি মুহূর্ত্তে চিন্তা করেন—তাঁহার প্রত্যেকটী চেষ্টা তাঁহার অভীষ্টদেবের কতটা সুখবিধান করিতেছে। তিনি অখণ্ডকালের সেবক। কালের কাল মহাকাল যাঁহার কৈঙ্কর্য্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তিনি সেই অধোক্ষজের সেবক। তাঁহার নিকট সময়ই 'পরমার্থ' অর্থাৎ তিনি অষ্টযাম অধোক্ষজের সুখানুসন্ধানে ব্যস্ত। সুতরাং উভয়ের অভিনিবেশ সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। শ্রীঅধোক্ষজ-সেবকের বন্ধু নৃলোকে দুর্ল্লভ। সেই সকল লোকোত্তর জগদ্গুরু এ-জগতে অধিক শিষ্য বা শ্রোতা প্রাপ্ত হন না। তাই তাঁহারা অধিকাংশ সময় বঞ্চনা করিয়া জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন ; কখনও বা মনের দুঃখে বনে বিচরণ

করেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"এই মত কৃষ্ণ-সুখে মাধবেন্দ্র সুখী।
সবে ভক্তি-শূন্য লোক দেখি' বড় দুঃখী॥
তা'র হিত চিন্তিতে ভাবেন নিতি নিতি।
কৃষ্ণ প্রকট হয়েন—এই তাঁ'র মতি॥
কৃষ্ণ-যাত্রা, অহোরাত্র কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন॥"

* * *

যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্ব্বলোক আনন্দিত॥

* * *

"বিষ্ণুমায়া-বশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগৎ বদ্ধ মহা তমোগুণে॥
লোক দেখি' দুঃখ ভাবে' শ্রীমাধবপুরী।
হেন নাহি, তিলার্দ্ধ সম্ভাষা যা'রে করি॥
সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ।
সেহ আপনারে মাত্র বলে 'নারায়ণ'॥
এ দুঃখে সন্ন্যাসি-সঙ্গে না কহেন কথা।
হেন স্থান নাহি, 'কৃষ্ণ-ভক্তি' শুনি যথা॥
'জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, সন্ন্যাসী' খ্যাতি যা'র।
কা'র মুখে নাহি দাস্য-মহিমা-প্রচার॥

যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে'।
তা'রা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে'॥
দেখিতে, শুনিতে দুঃখী শ্রীমাধবপুরী।
মনে মনে চিন্তে'—'বনে বাস গিয়া করি॥
লোক-মধ্যে ভ্রমি কেনে বৈষ্ণব দেখিতে।
কোথাও 'বৈষ্ণব'-নাম না শুনি জগতে॥
অতএব এ-সকল লোক-মধ্য হৈতে।
বনে যাই, যথা লোক না পাই দেখিতে॥
এতেকে সে বন ভাল এ সব হইতে।
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে॥"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৪১০-১২, ৪১৬, ৪১৯-২৮)

এইভাবে শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র সমগ্র বঙ্গদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে মাত্র একটী বন্ধু পাইয়াছিলেন ; তিনিই শ্রীঅদ্বৈতআচার্য্য। ইনিও সকল সংসার বিষ্ণুভক্তিশূন্য দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রের সহিত যখন শ্রীঅদ্বৈতের মিলন হইল, তখন,—

"অন্যোঽন্যে কৃষ্ণ-কথা-রসে দুইজন।
আপনার দেহ কা'রো না হয় স্মরণ॥"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৪৩৬)

শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরী শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যকে 'বন্ধু' বলিয়া গ্রহণ করিলেন,—

"তাঁ'র ঠাঞি উপদেশ করিলা গ্রহণ।
হেনমতে-মাধবেন্দ্র-অদ্বৈত-মিলন ॥"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৪৫০)

শ্রীল মাধবেন্দ্র পশ্চিম ভারতে ভ্রমণ-কালে আর একটী 'বন্ধু' পাইয়াছিলেন,—তিনি নিত্যানন্দপ্রভু। এই দুই বন্ধুর মিলন-প্রসঙ্গ শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"প্রেমনদী বহে দুই প্রভুর নয়নে।
পৃথিবী হইল সিক্ত ধন্য হেন মানে ॥"

* * *

"সভেই পায়েন দুঃখ দুর্জ্জন সম্ভাষিয়া।
অতএব বন সভে ভ্রমেণ দেখিয়া ॥
অন্যোঽন্যে সে-সব দুঃখের হৈল নাশ।
অন্যোঽন্যে দেখি' কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ ॥
রাত্রিদিন কেহ নাহি জানে প্রেমরসে।
কত কাল যায়, কেহ ক্ষণ নাহি বাসে ॥

* * *

মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥
মাধবেন্দ্র বোলে,—"প্রেম না দেখিলুঁ কোথা।
সেই মোর সর্ব্বতীর্থ, হেন প্রেম যথা ॥
জানিলুঁ কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ-হেন 'বন্ধু' পাইনু সংহতি ॥

*　　*　　*

এই মত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ-প্রতি।
অহর্নিশ বোলেন, করেন রতি-মতি॥
মাধবেন্দ্র-প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরু-বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়॥
এইমত অন্যোহন্যে দুই মহামতি।
কৃষ্ণপ্রেমে না জানেন কোথা দিবা-রাতি॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।১৬৪, ১৭২-৭৩,
১৭৯, ১৮:-৮৩, ১৮৭-৮৯)

এই যে শ্রীমাধবেন্দ্র-শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীনিত্যানন্দের বন্ধুত্ব, ইহার মূল-ভিত্তি কোথায়? আবেশ বা চিত্তবৃত্তির সমতাতেই এই বন্ধুত্বের আবির্ভাব। এই আবেশের তারতম্য হইতেই কে কোন্ জাতীয় মহতের বন্ধু, তাহা পরিব্যক্ত হয়। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী-পাদের শ্রীমথুরাবাসী শিষ্য জনৈক সানোড়িয়া বিপ্র আত্ম-গোপনকারী শ্রীগৌরসুন্দরে নিজ প্রভুর ন্যায় আবেশ দর্শন করিয়াই বলিয়াছিলেন,—

"কিন্তু তোমার প্রেম দেখি' মনে অনুমানি।
মাধবেন্দ্রপুরীর 'সম্বন্ধ' ধর জানি।।
কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা, যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১৭২-৭৩)

কলি যতই প্রবল হইতেছে, ততই প্রপঞ্চে হ্লাদিনীর দূত বা

মহদ্‌গণের বন্ধুর সংখ্যাও সুদুর্ল্লভ হইয়া পড়িতেছে। শ্রীগৌর-সুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত, অন্যত্র শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী, শ্রীঈশ্বর-পুরী-প্রভৃতি মহদ্‌গণ আপাত বন্ধুহীনের লীলা প্রকট করিয়াও শ্রীগৌরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অকৃত্রিম বন্ধু পাইয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তিযুগে শ্রীগোস্বামিগণও অনেক বন্ধু পাইয়াছিলেন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপ্রভু শ্রীনরোত্তমকে বন্ধুরূপে লাভ করিয়া তাঁহার দ্বারা জগতে বন্ধুর ধারা প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু—ইঁহারা পরস্পর মিত্র ছিলেন এবং ইঁহাদের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীহরিরাম আচার্য্য, শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ, শ্রীরসিক মুরারি প্রভৃতি বিপুল বন্ধুর ধারা প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অভিন্নাত্মা বন্ধু শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের কথা 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'র গীতির ঝঙ্কারে এখনও প্রত্যেকের হৃদয়তন্ত্রীতে জাগরূক রহিয়াছে। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণকে বন্ধুরূপে পাইয়াছিলেন। কিন্তু কলি যত প্রবল হইতে থাকিল, ততই শ্রীগৌরপ্রণয়ী ভক্তগণ বন্ধুহীন-জগতে অবতীর্ণ হইয়া একেশ্বর আপন-মনে শ্রীহরিভজন-লীলাকৈবল্যে আবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা খুব কম বন্ধুই পাইলেন। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ একাধিক অকৃত্রিম বন্ধু পাইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। শ্রীল গৌর-কিশোরের চতুষ্পার্শ্বে অনেক লোকই সমবেত হইতেন; কিন্তু

তাঁহারা কেহই প্রকৃত বন্ধু হ'ন নাই। কেহ আনুকরণিক, কেহ বা আত্মবঞ্চক হইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে শ্রীল গৌর-কিশোর একমাত্র বন্ধুরূপে পাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চতুষ্পার্শ্বে তাঁহার ঐশ্বর্য্য-মুগ্ধ হইয়া বহু লোক আসিয়াছিলেন; কিন্তু তিনিই বা কয়টী প্রকৃত বন্ধু পাইয়াছেন? তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন, এমন কি, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখেও অনেক সময় শুনা যাইত—"কেহ আসিল না।" অবশ্য কেহ আসুক আর না আসুক, শ্রীগোপিকা-প্রাণবন্ধু যাঁহাদের একমাত্র হৃদয়বন্ধু, তাঁহাদের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই; তাঁহারা পূর্ণতম বাস্তবসত্যের সেবক। কিন্তু যাহারা সেই সকল হ্লাদিনীর দূত-গণের 'অন্তেবাসী' হইতে পারিল না, তাহাদেরই দুর্ভাগ্যের সীমা নাই। ঘরের দ্বারে গোলোকের দূত 'মহামণি' হাতে তুলিয়া দিতে আসিলেন, দুর্ভাগা জীব তখন দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল! অপ্রাকৃত দূত দ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিয়াও জাগ্রদবস্থার কপটনিদ্রাভিনয়কে দূর করিতে পারিলেন না; তখন গোলোকের দূত 'মহারত্নের পসরা' লইয়া নিজধামে ফিরিয়া গেলেন; বিশ্ব বঞ্চিত হইল!

"বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি ন সংশয়ঃ।
বিশ্বং গৌররসে মগ্নং স্পর্শোঽপি মম নাভবৎ!!"

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত—৪৬)

আমি বঞ্চিত! বঞ্চিত!! বঞ্চিত!!! শ্রীগৌর-প্রেম-রসার্ণবে

অখিল বিশ্ব মগ্ন হইল, কিন্তু হায়! তাহাতে আমার স্পর্শমাত্রও হইল না।

"কৈর্বা সর্ব্বপুমর্থমৌলিরকৃতায়াসৈরিহাসাদিতো
নাসীদ্গৌরপদারবিন্দরজসা স্পৃষ্টে মহীমণ্ডলে।
হা হা ধিঙ্মম জীবনং ধিগপি মে বিদ্যাং ধিগপ্যাশ্রমং
যদ্দৌর্ভাগ্যভরাদহো মম ন তৎসম্বন্ধগন্ধোঽপ্যভূৎ ॥"

(ঐ—৪৭)

শ্রীগৌরপাদপদ্মপরাগে মহীমণ্ডল স্পৃষ্ট হইলে কোন্ ব্যক্তিই বা 'অসাধনে' (অনায়াসে) সর্ব্বপুরুষার্থশিরোমণি প্রেম প্রাপ্ত না হইয়াছেন? কিন্তু হায়, হায়! অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশে আমি সেই সেই প্রেমের লেশমাত্র লাভ করিতে পারিলাম না! ধিক্ আমার জীবনে, ধিক্ আমার পাণ্ডিত্যে, ধিক্ আমার আশ্রমে!

—:*:—

স্ত্রী-সম্ভাষণ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"ভোক্তা বা পুরুষাভিমানে স্বীয় ইন্দ্রিয়ভোগ্যাজ্ঞানে যোষিৎসহ বিষয়ীর যে আলাপ, তাহা স্ত্রী-সম্ভাষণ।" —(চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৪৪)

স্ত্রী-সম্ভাষণ বা স্ত্রীসঙ্গের নিন্দা শুদ্ধভক্তিশাস্ত্র কেন, সৎকর্ম্মী ও

মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের অনুশাসনেও বিশেষভাবেই দেখিতে পাওয়া যায়; তবে সংকর্ম্মী বা মায়াবাদি-সম্প্রদায় স্ত্রীসঙ্গ বা স্ত্রীসম্ভাষণ-ব্যাপারটির যেরূপ স্থূল একদেশী বিচার করিয়া থাকেন, ভক্তি-সিদ্ধান্তের বিচার সেরূপ সঙ্কীর্ণ নহে। যাঁহারা মাংসদৃক্, তাঁহারা মাংসের আকর্ষণজনিত স্থূল বা সূক্ষ্ম সঙ্গকেই "স্ত্রীসঙ্গ" বা "স্ত্রীসম্ভাষণ" বলিয়া থাকেন। ইঁহারা সেই স্থূল মাংসাকর্ষণের নিন্দা করিয়া বলিয়া থাকেন,—

"অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসঙ্কুলে স্বভাবদুর্গন্ধিবিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে মূত্রে পুরীষে ভাবিতে রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ॥"

এই জাতীয় প্রাকৃতবিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মুখে এইরূপ অনেক ছড়াও শুনিতে পাওয়া যায়,—

"দিন্‌কা মোহিনী রাত্‌কা বাঘিনী পলক পলক লহু চুষে।
দুনিয়া সব বাওরা হোকে ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।"

একখানি আধুনিক ধর্ম্মোপদেষ্টার ধর্ম্মোপদেশে উক্ত হইয়াছে—

"যে মাগ-সুখ ছেড়েছে সে সব ছেড়েছে।"

কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগের কথা ইহাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা! কিন্তু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু মনঃশিক্ষার "প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী" শ্লোকে প্রতিষ্ঠাকে কুলটা শ্বপচরমণী বলিয়াছেন। প্রতিষ্ঠাচণ্ডালিনীর সঙ্গ যে স্ত্রীসঙ্গ, ইহা সংকর্ম্মী বা মায়াবাদি-সম্প্রদায় সম্পূর্ণভাবে ধরিতে পারেন না। এজন্যই ভক্তিসিদ্ধান্তের বিচারের স্ত্রীসম্ভাষণ ও কর্ম্মি-জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের

বিচারের স্ত্রীসম্ভাষণে পার্থক্য আছে।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি প্রথম অধ্যায়ে ২৯শ সংখ্যায়—',যে স্ত্রীসঙ্গ মুনি গণে করেন নিন্দন। তাঁরাও রামের রাসে করেন স্তবন।" পদের যে সকল তথ্য গুম্ফিত করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর নিন্দাসূচক যাবতীয় শ্লোক ও উহার অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। যদিও ঐ সকল প্রমাণে কতকটা কর্ম্ম-জ্ঞানশাস্ত্রাদির মত স্থূল স্ত্রীসঙ্গাদির নিন্দা আছে, তথাপি ভক্তিপ্রতিকূল বিচারেই সেই সকল গ্রহণীয়। ভগবদ্ভক্তি হৃদয়ে উদিত হইলে একদেশী ডাঁসা বিচারে কেহ প্রধাবিত হন না, তাঁহার বিচার তখন সার্ব্ব-দেশিক হয়।

যখন ঢাকায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর কোন আদর্শবিশেষ লইয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ স্ত্রীসম্ভাষণ-সম্বন্ধে কুতর্ক উত্থাপন করিয়াছিলেন, তখন গৌড়ীয় ১১শ বর্ষ ৩৫শ সংখ্যায় এই সকল বিচার প্রকাশিত হইয়াছিল—

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য হইতে জানা যায়,—

"আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।"

অর্থাৎ সাধকব্যক্তি স্ত্রীলোক ও বিষয়ীর আকারকেও ভয় করিবেন।

এই কথার স্থূল অর্থ গ্রহণ করিলে স্বয়ং আচার্য্য-লীলা শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ও ভক্তগণের চরিত্রেই

তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। **ভোক্তৃ-অভিমানে ভোগ্যজ্ঞানে বস্তুর বহির্দ্দর্শন হইতেই দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভয়ের উৎপত্তি হয়, তাহাই প্রকৃতি-দর্শন বা বিষয়ি-দর্শন।** শ্রীমন্মহাপ্রভু হরি-সেবোন্মুখ মহারাজ প্রতাপরুদ্রকেই পরে দর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীনিবাসাচার্য্য বীরহাম্বীরের দ্বারা হরিকথা-প্রচারের সহায়তা করাইয়াছিলেন, শ্রীরসিকানন্দ প্রভু রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ ও তদীয় বিষয়ী ভ্রাতৃগণকে দর্শন ও কৃপা করিয়াছিলেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীর বিচার ও বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর বিচার সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহাই শ্রীরূপশিক্ষায় দৃষ্ট হয়,—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

যদি সন্ন্যাসীর পক্ষে বাহ্য-স্ত্রী-দর্শনই 'প্রকৃতি-সম্ভাষণ' বলিয়া বিচারিত হয় এবং সেই বিচারানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের পরম পূজ্যা, জগন্মাতা, বৃদ্ধা, তপস্বিনী শ্রীমাধবী মাতার নিকট ভিক্ষা-গ্রহণ-মাত্রকেই সন্ন্যাসি বৈষ্ণবের পক্ষে 'স্ত্রী-সম্ভাষণ' বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে **বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী শ্রীরঙ্গ-পুরীর নদীয়া-নগরে শচীমাতার নিকট ভিক্ষা-গ্রহণকে** (চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম অঃ ২৯৫-২৯৮), **কিংবা সার্ব্বভৌম-পত্নী ষাঠীর মাতা বা ষাঠীর হস্তে শ্রীপরমানন্দ পুরীর ক্রমাগত পাঁচদিন, শ্রীদামোদরস্বরূপ ও অন্যান্য আটজন সন্ন্যাসীর প্রত্যেকের দুই**

দিবস করিয়া যোলদিন ভিক্ষা-গ্রহণকে (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৯১-১৯৭) শ্রীমন্মহাপ্রভু স্ত্রী-দর্শন বা তাঁহাদের নিকট ঐরূপ ভিক্ষাগ্রহণ-মাত্রকেই 'স্ত্রী-সম্ভাষণ' বলিতেন।

যদি স্ত্রী-মূর্ত্তির নিকট অকপট ভগবৎসেবার্থ গমনমাত্রই বা তাঁহার নিকট হইতে ভগবৎ-সেবার্থ ভিক্ষাদি যাচ্ঞা মাত্রই সন্ন্যাসি-বৈষ্ণবের পক্ষে স্ত্রী সম্ভাষণের 'আইন' বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে লিপিবদ্ধ, প্রচারিত বা মহাপ্রভুর শিক্ষায় থাকিত, তাহা হইলে মহাপ্রভুর পার্ষদ, শ্রীচৈতন্য-কল্পবৃক্ষের অন্যতম শাখা * শ্রীভগবান্ আচার্য্য ছোট হরিদাসকে ডাকিয়া আনিয়া বলিতেন না,—

"মোর নামে শিখি মাহিতির ভগিনী-স্থানে গিয়া।
শুক্ল-চাউল এক মান আনহ মাগিয়া॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ২য় পঃ)

শ্রীভগবান্ আচার্য্য কি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের ধর্ম্মও কি প্রকারে তাঁহাদের স্ত্রীসম্ভাষণ হয়, তাহা জানিতেন না? স্ত্রীসম্ভাষণ অপরাধে অপরাধী ও মহাপ্রভুর অপ্রিয়ভাজন করাইবার জন্যই কি মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীভগবান্ আচার্য্য ছোট হরিদাসকে মাধবী মাতার নিকট প্রেরণের ষড়যন্ত্র

---

* ভগবান্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী।
শ্রীশিখি-মাহিতি, আর মুরারি মাহিতি॥
মাধবী দেবী—শিখি-মাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যাঁ'র নাম গণি॥

(চৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ)

করিয়াছিলেন ? আর শ্রীভগবান্ আচার্য্যের অজ্ঞতার জন্য শ্রীভগবান্ আচার্য্যকে মহাপ্রভু শাসন করিবার পরিবর্ত্তে "প্রশংসিয়া" তাঁহার ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন কেন ?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শ

সন্ন্যাসিগণ চিরদিনই গৃহস্থের গৃহ হইতে ভিক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক গৃহব্রত-সম্প্রদায়ের মঙ্গল ও সুকৃতি সাধন করেন। সন্ন্যাসিগণ যখন গৃহস্থের গৃহ হইতে ভিক্ষা করেন, তখন গৃহলক্ষ্মীগণও ভিক্ষাদি প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর গৃহস্থলীলায় শচীমাতা এবং লক্ষ্মীদেবীর সাহায্যে সন্ন্যাসিগণকে ভিক্ষা প্রদান করিতেন,—

"কোন দিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সবা' নিমন্ত্রেন প্রভু হইয়া হরিষ॥
সেইক্ষণে কহি' পাঠায়েন জননীরে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে॥
তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরম সন্তোষে।
রান্ধেন বিশেষ, তবে প্রভু আসি' বৈসে॥
সেই সব অতিথি—পরম ভাগ্যবান্।
লক্ষ্মী-নারায়ণ যারে করে অন্নদান॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪শ অঃ)

ত্রিদণ্ডি-বৈষ্ণব-যতিরাজ আচার্য শ্রীরামানুজের আদর্শ

লোক-শিক্ষক আচার্য্য শ্রীরামানুজ ত্রিদণ্ডি-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্র ও সন্ন্যাসীর বিধি জানিতেন না, এইরূপ

বলা মূর্খের পক্ষেই শোভনীয়। তিনি একসময় তাঁহার সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের সহিত 'অষ্ট-সহস্র' নামক গ্রামে তাঁহার গৃহস্থ শিষ্য শ্রীবরদাচার্য্যের পরম লাবণ্যবতী লক্ষ্মী-নাম্নী পত্নী বা নিজ শিষ্যার নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন শ্রীরামানুজ বরদাচার্য্যের গৃহে নিজ-সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের সহিত উপস্থিত হইলেন, তখন লক্ষ্মীদেবী একাকিনী ছিলেন এবং স্নান করিয়া চীরখণ্ডধারণ-পূর্ব্বক সূর্য্যের উত্তাপে বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিলেন। এজন্য লক্ষ্মীদেবী নিজগুরুর সম্মুখীন হইতে না পারিয়া করতালিধ্বনি দ্বারা ইঙ্গিত পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। যতিরাজ তৎক্ষণাৎ বহির্দ্দেশ হইতে নিজ-উত্তরীয় গৃহাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিলে **লক্ষ্মীদেবী** গাত্র আচ্ছাদন-পূর্ব্বক **গুরুদেবের সম্মুখে আগমন, গুরুদেবকে অভিবাদন, অভিভাষণ, নানা-প্রকার প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা এবং গুরুদেবের প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদানাদি করিলেন।** পরে শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া গুরু-দেবকে ভোগ দিলেন। ইহার দ্বারা কি ত্রিদণ্ডি-যতিরাজ বৈষ্ণবা-চার্য্যের স্ত্রী-সম্ভাষণ হইয়াছিল? যাঁহারা 'প্রপন্নামৃত', 'মধ্ব-দিগ্বিজয়', 'জয়তীর্থ-চরিত' প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের কৃত্য-সম্বলিত গ্রন্থাদি আলোচনা করেন নাই বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন কথার প্রকৃত খবর রাখেন না, তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত মূর্খতা-বিজড়িত সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য।

"শ্রীচৈতন্য চরিত-মহাকাব্য"

শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যের ১৩শ সর্গের ১১৭-১২২ শ্লোকে

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের শ্রীশচীমাতার সহিত আলাপ, শচীমাতাকে দর্শন ও শচীমাতার নিকট হইতে ভিক্ষাগ্রহণ-প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ আছে। 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে'র চতুর্থ অঙ্কে সন্ন্যাসী কেশব-ভারতীকে শ্রীশচীমাতার ভিক্ষাদান-প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণী

স্বয়ং নিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী বহু ত্যাগী বৈষ্ণব শিষ্য করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা তিনি জগতে প্রকৃতি-সম্ভাষণের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন কি ?

শ্রীগঙ্গামাতার দৃষ্টান্ত

গৌরপার্ষদ শ্রীঅনন্তাচার্য্যের শিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিত বা শ্রীরঘুগোপালের শিষ্যা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও পুটিয়ারাজকন্যা শ্রীগঙ্গা-মাতা। উৎকলে এই গঙ্গামাতার প্রসিদ্ধ মঠ আছে। শ্রীগঙ্গামাতা অনেক ত্যাগী শিষ্য করিয়াছিলেন। শ্রীহরিদাস পণ্ডিত শ্রীলক্ষ্মী-প্রিয়া বা শ্রীগঙ্গামাতাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া বা শ্রীগঙ্গামাতা ত্যাগি-বৈষ্ণবগণকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করিয়া প্রকৃতি-সম্ভাষণ ও মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন কি ? আজকালকার মর্কট-বৈরাগি-সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছি না।

ভোগবুদ্ধিতে পুরুষাকার-দর্শনেও স্ত্রী-দর্শন সম্ভব

কামুকগণ জগৎকেই কামিনীময় দর্শন করে। মহাপ্রভুর বিচার তাহা নহে। ভোগ-প্রবৃত্তির রুচিযুক্ত দর্শনই স্ত্রী-দর্শন, তাহা বাহ্য পুরুষাকার-দর্শনেও হইতে পারে। বৈষ্ণবগণ

সকলকে গুরুবুদ্ধিতে দর্শন করেন। শ্রীরঙ্গপুরী বা শ্রীপরমানন্দ পুরী প্রমুখ অষ্ট সন্ন্যাসীর গৃহস্থের বাড়ী হইতে পরম পূজ্যা বৈষ্ণবী-গণের হস্ত হইতে ভিক্ষা-গ্রহণে ভোগপ্রবৃত্তির রুচি ছিল না, তাহা **এক কৃষ্ণশক্তির আর এক কৃষ্ণশক্তিকে সেবাময়ী গুরুবুদ্ধিতে দর্শন।**

কৃষ্ণদাস বিপ্র ভট্টথারি-স্ত্রীলোকের প্রলোভনে পতিত হইয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে বর্জ্জন করেন। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অনুরোধে কৃষ্ণদাসকে পুনরায় সেবাধিকার প্রদান করেন। যে-ব্যক্তির 'স্ত্রীধনে' লোভ জন্মিয়াছিল, সেই ব্যক্তি বৈষ্ণবগণের দ্বারা প্রেরিত হইলেন **শচীমাতার নিকট !—**

"তবে গৌড়দেশে আইলা কালা কৃষ্ণদাস।
নবদ্বীপে গেল তেঁহ **শচী-আই-পাশ** ॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার।
দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু—**কহে সমাচার** ॥"

(চৈঃ চঃ ম ১০।৭৫-৭৬)

একবার যে ত্যাগি-বৈষ্ণবের স্ত্রীলোকের দর্শনে পতন হইয়াছে, তাঁহাকে নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ ও দামোদর একত্র যুক্তি করিয়া শচীমাতার নিকটে প্রেরণের দ্বারা কি প্রকৃতি-সম্ভাষণের সাহায্য করিয়াছিলেন ?— নিশ্চয়ই নহে ? অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসের আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীশচীমাতা প্রাকৃত বৎসলরসের ভোগ্য আশ্রয় বস্তুর ন্যায় প্রকৃতি নহেন। শ্রীশচীমাতা যেরূপ বাৎসল্যরসের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ, মাধবীমাতাও তেমনি মধুর রসের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ

শ্রীমতীর গণে গণিতা। মহাপ্রভু কোন বিধবা সুন্দরী যুবতীর বালককে স্নেহ করায় দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুর এই কার্য্যের সমালোচনা করিয়াছিলেন, সেজন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মচারী দামোদরকে শচীমাতার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন—

"প্রভু কহে,—দামোদর চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা॥"

(চৈঃ চঃ অ ৩য় পঃ)

ইহার দ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন,—অপ্রাকৃত প্রকৃতিগণ প্রাকৃত প্রকৃতি নহেন। গুরুবুদ্ধিতে দর্শন--প্রকৃতি দর্শন নহে, নতুবা একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে স্ত্রীলোকের নিকট অবস্থান স্ত্রীলোককে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মহাপ্রভু কিরূপে আদেশ করিলেন ?"

রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বারবণিতা বেনাপোলের নির্জ্জন বনে ঠাকুর হরিদাসের নিকট তিনরাত্র অবস্থান করিয়াছিল। শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস আপন মনে হরিনাম কীর্ত্তনে রত ছিলেন। ঠাকুর হরিদাসের ভজন-গৃহদ্বারে বেশ্যা সমস্ত রাত্র অতিবাহিত করিয়াছিল বলিয়া নামাচার্য্যের প্রকৃতি-সম্ভাষণ হয় নাই ; কিন্তু ছোট হরিদাসের মাধবী মাতার গৃহদ্বারে মুহূর্ত্তকাল অবস্থানের আদর্শ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারে স্ত্রী-সম্ভাষণের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অতএব বাহ্য-স্ত্রী-আকৃতি দর্শন বা তৎসমীপে অবস্থানই স্ত্রী-সম্ভাষণ নহে ; ভোক্তা বা পুরুষ অভিমানে স্বীয় ইন্দ্রিয়ভোগ্যাজ্ঞানে যোষিৎসহ বিষয়ীর যে আলাপ, তাহাই স্ত্রী-সম্ভাষণ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রীর বালিকা নারায়ণীকে আদর করিতেন, ভোজনাবশেষ প্রদান করিতেন, হরিনাম শ্রবণ করাইতেন ও কীর্ত্তন করিতে বলিতেন বলিয়া মহাপ্রভুর চরিত্রে আদর্শের ব্যাঘাত হইয়াছে, কিংবা মহাপ্রভু নদীয়ানাগর ছিলেন – এই সকল বিচার কোন শুদ্ধভক্তই করেন নাই। মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলাতেও দেখিতে পাই, মহাপ্রভু যখন দেবদাসীর মুখে গীতগোবিন্দের পদগান শুনিয়া অর্দ্ধবাহ্য-দশায় প্রেমাবেশে অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবা-বুদ্ধিতে তৎসহ মিলনার্থ ধাবিত হইয়াছিলেন, তখন গোবিন্দের মুখে 'স্ত্রীগান' শব্দ শুনিতে পাইয়া "গোবিন্দ আজ রাখিলা জীবন। স্ত্রীপরশ হইলে আমার হইত মরণ।"—(চৈঃ চঃ অ ১৩।৮৫) প্রভৃতি বাক্য বলিয়াছিলেন; কিন্তু সেই মহাপ্রভুরই আচরণে আবার দেখিতে পাওয়া যায়—শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে যখন এক উড়িয়া স্ত্রীলোক অজ্ঞাতসারে মহাপ্রভুর স্কন্ধে পদার্পণ-পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন এবং তাহা দেখিয়া গোবিন্দ ঐ স্ত্রীলোকটিকে নিবারণ করিয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু গোবিন্দকে বলিয়াছিলেন,—

'আদিবস্যা' এই স্ত্রীরে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন॥"

—(চৈঃ চঃ অ ১৪।২৬)

প্রথম আদর্শে স্ত্রী-স্পর্শের ভয়ে মহাপ্রভু যে ভাব প্রদর্শন করিলেন, দ্বিতীয় আদর্শে সেরূপ ভাব প্রদর্শন করিলেন না কেন? প্রথমটি যদি স্ত্রী-স্পর্শের আদর্শ হয়, তবে দ্বিতীয়টি কেন হইবে না?

ইহার উত্তর বাহ্য আকার দেখিয়া নির্ণয় করা যায় না। মর্কট-ধর্ম্মাবলম্বিগণ বাহ্যদৃষ্টিতে কপটতা করিয়া স্ত্রী-সম্ভাষণ পরিত্যাগ করিলেও তাঁহারা অন্তরে সর্ব্বক্ষণই স্ত্রী-সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। কপটতা বা লোকের চক্ষে ধূলি দেওয়া সাধুত্ব নহে।

নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের বেশ্যা-সহ নির্জ্জনবনে ত্রিরাত্র অবস্থানপূর্ব্বক হরিনাম-কীর্ত্তন; রায় রামানন্দের দেবদাসীগণের শৃঙ্গার-বিধান কিংবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বালিকা নারায়ণীকে আদর, উচ্ছিষ্ট-দান, সেবাগ্রহণ বা সুন্দরীর বিধবার পুত্রকে আদর; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বেষগ্রহণলীলাবিষ্কারের পরও গোলোক-প্রতীতিতে "ভক্তিভবনে" বাস, নানাপ্রকার দৈহিক পরিচর্য্যা-গ্রহণ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে "তাঁহার বৈরাগ্যের সিদ্ধি হউক"—এইরূপ আশীর্ব্বাদ, শ্রীল প্রভুপাদের ব্রহ্মচারী-লীলায় গুরুবুদ্ধিতে কৃষ্ণ-শক্তিগণকে আদর, তাঁহাদের সেবাগ্রহণ, শ্রীল ভক্তিবিনোদানু-কম্পিতা শক্তিগণের সহিত কৃষ্ণদাসদর্শনে বিশ্রব্ধ আলাপ ও অবস্থানাদির আদর্শ; আর কৃষ্ণদাসবিপ্রের ভট্টথারি-স্ত্রীর প্রলোভনে পতন বা ছোট হরিদাসের আদর্শ এক নহে। বাহ্য প্রতীতি সকলক্ষেত্রেই সমভাবে বিচার্য্য হয় না। প্রাকৃত সহজিয়া মর্কট বৈরাগী প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদী, প্রচ্ছন্নকামুক, অনর্থপ্রপীড়িত, কামক্রোধাদির কিঙ্কর কপট গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী বা বানপ্রস্থ নামধারিগণ বিশ্বকে ভোগ্য দর্শন করায় সর্ব্বক্ষণ প্রকৃতি-সম্ভাষণই করিতেছে। আবার কতকগুলি অতিমৎসর ভণ্ড, কামুক, ব্যভিচারী, লম্পট ব্যক্তিগণ নিজ ছিদ্র ঢাকিবার জন্য—"ঐ চোর, ঐ চোর"

বলিয়া প্রকৃত অকপট সাধুর নির্ম্মল চরিত্রে দোষারোপ করিবারও পাষণ্ডতা করিয়া থাকে। উহাতে প্রকৃত সাধুর মহত্ত্ব আরও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। মৎসর কামুক পাষণ্ড রামচন্দ্র খাঁ নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের সুবিমল চরিত্রে এইরূপ কলঙ্ক আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যতিরেকভাবে নামাচার্য্যের মহত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

খল প্রকৃতির ব্যক্তিগণ অনেক সময় রায় রামানন্দের দেবদাসীগণের সেবা বা মহাপ্রভুর বালিকা নারায়ণীকে আদর প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া নানাপ্রকার বাউল ও সহজিয়া-মত স্থাপন করিতে চাহে। এমন কি, কতকগুলি লম্পটচরিত্র ব্যক্তি শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর অপ্রাকৃত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর চরিত্রের সহিত মীরাবাই প্রভৃতি স্ত্রী-চরিত্রের সঙ্ঘটন করাইবার ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের চরিত্র-প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তিগণ মহাপ্রভুর বালিকা নারায়ণীকে আদর ও উচ্ছিষ্টাদি-দানে কৃপার উদাহরণকে অন্যরূপ কথায় সজ্জিত করিয়া দুষ্টমত প্রচার করিয়াছে; বস্তুতঃ শুদ্ধভক্তসমাজে এইরূপ কোন প্রকার কথার প্রচলন নাই। "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ।"

মহাভাগবত সদ্‌গুরু কর্ণে মন্ত্রপ্রদানকালে রুদ্ধগৃহে স্ত্রী বা যুবতী-বেশী শিষ্যের সহিত অবস্থান করেন। তাহাতে কি তাঁহার প্রকৃতি সম্ভাষণ হয়? যিনি বিশ্বকে কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে দর্শন করেন, তিনিই গুরু বা আচার্য্য-পদবাচ্য।

কামাদি রিপুতাড়িত ব্যক্তিগণ যে "গুরু-প্রসাদী" দুর্নৈতিক

মতের প্রচলন করিয়াছে বা বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তা-ভজা প্রভৃতি যে-সকল পাষণ্ড পাপাচারের প্রশ্রয় দিয়াছে, সদ্‌গুরুপাদপদ্মে ঐরূপ দুর্নীতি ও পাষণ্ডতার আরোপ অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তিগণের দ্বারাই সাধিত হয়। রামচন্দ্র খাঁর ন্যায় মৎসর কামিনীজিত ব্যক্তি তাহারই ন্যায় নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে কামিনীজিৎ (!!) মনে করিয়া নামাচার্য্যের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অতএব "ভোক্তা বা পুরুষাভিমানে স্বীয় ইন্দ্রিয়-ভোগ্যজ্ঞানে যোষিৎসহ বিষয়ীর যে আলাপ, তাহাই প্রকৃতি-সম্ভাষণ।"

অন্তরে সম্ভোগবাদী মর্কটবৈরাগী যদি কোন স্ত্রীলোকের দিকে বাহ্যদৃষ্টিতে দৃক্‌পাত না করে, বা অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবকের অবৈধ অনুকরণ বা প্রতিযোগিতা করিয়া প্রকৃতি-বেষ্টিত হইয়াও সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ—এইরূপ ভাব প্রদর্শন করে, তথাপি তাহাকে পুরুষাভিমানী প্রকৃতি-সম্ভাষণকারী বলিয়াই জানিতে হইবে। সে ব্যক্তি কপট, মৎসর, ভোগলোলুপ, বিরূপগ্রস্ত, অনর্থ-তাড়িত প্রাকৃত-কাম-কিঙ্কর বদ্ধজীব।

ঊর্দ্ধরেতা জগদ্‌গুরু মহাদেবের পার্ব্বতীকে ক্রোড়ে স্থাপন ও আলিঙ্গন করিয়া অবস্থান, রায় রামানন্দ ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির ন্যায় রমণীর সহিত নির্জ্জনে বাসের অবৈধ-প্রতিযোগিতা করিয়া বা তাঁহাদের চরণে অপরাধ বা তাঁহাদের চরিত্রে দোষারোপ করিয়া কেহ কোনও দিনই তাঁহাদের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাকে খর্ব্ব করিতে পারে নাই। সে দিন এক ভাগবত-বৈষ্ণব আচার্য্যবিদ্বেষী কাহাকেও

লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—শ্রীল * * প্রভুকে যদি শত শত রমণী বেষ্টিত হইয়াও থাকিতে দেখি, তাহাদের সেবা গ্রহণ করিতে দেখি, তথাপি তাঁহার নিকট আমাদের যুবতী কন্যা ভার্য্যা ও আত্মীয় স্বজনকে পাঠাইতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিব না, কারণ তাঁহার সর্ব্বত্র গুরুদর্শন, গুরুকৃষ্ণের ভোগোপকরণ-দর্শন, আত্ম-দর্শন হইয়াছে ; আর তুমি যদি বাতাহারী হইয়াও থাক, চক্ষুর্দ্বয় বন্ধ করিয়াও থাক, 'কিছু স্পর্শ করিব না, হস্ত পদাদি বাঁধিয়া রাখিব;—বল, তথাপি প্রচ্ছন্নকামুক, বিশ্বভোগাভিমানী, কপট, ভোগবাদী তোমাকে ও তোমার সমশীল ব্যক্তিগণকে কোনও দিনই বিশ্বাস করিব না। ব্রহ্মচারিলীলাভিনয়কারী শ্রীল প্রভুপাদ ভোক্তৃ-পুরুষাভিমানী-বিহীন হইয়া সর্ব্বত্র গুরুর সেবোপকরণরূপে নিখিল নারীবর্গকে দর্শন করিতেন বলিয়া তাঁহাকে অপ্রাকৃত আদর্শ-চরিত্র গুরুপাদপদ্ম বলিয়াই পূজা করিব ; কিন্তু ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসীগণ সদ্‌গৃহস্থের সজ্জাগ্রহণকারী মর্কট তোমাকে ও তোমার বন্ধুবান্ধবকে নরকযাত্রী স্ত্রীজিত ও স্ত্রীসঙ্গিগণের কবলে কবলিত বলিয়াই জানিব। তোমার দম্ভ-অহঙ্কার-মূলে গুরুদেবকে সেবা করিবার অভিনয়ও যোষিৎসঙ্গই ; কেন না, তুমি গুরুদেবের দ্বারা নিজের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বা অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিয়া লইতে চাহ। সুতরাং তোমার দৃশ্য গুরু (?) 'তোমার যোষিৎ'। তুমি ও তোমার সমশীল ব্যক্তিগণ গুরুদেবের নিকট কনক-যোষিৎ, কামিনী-যোষিৎ ও প্রতিষ্ঠা-যোষিৎ চাহিয়াছিলে। তাই বাঞ্ছাকল্প-তরু গুরুদেব তোমাদিগকে ঐসকল দিয়াই বঞ্চনা করিয়াছেন।

শ্রীগুরুদেবকে তুমি কতটা ভাল বাসিয়াছ তাহা একটি কষ্টি-পাথরে পরীক্ষিত হইয়াছে। সর্ব্ববাদিসম্মত মর্কট-যোষিৎসঙ্গীর দুঃসঙ্গকে অর্থ ও স্বার্থের জন্য রুচির সহিত বরণ করিয়া ও তাহার কবলে কবলিত হইয়া তুমি শ্রীগুরুদেবের সহিত তৎপদানুরাগী আদর্শ সুনির্ম্মল-চরিত্র বৈষ্ণবগণকে পরিত্যাগ করিয়াছ। শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাণী পরিহার করায় তোমাতে সম্পূর্ণ গুরুবিরোধ, গুরু-ভোগ ও বৈষ্ণব-বিরোধ-চেষ্টা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে।

"ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥"
(ভাঃ ৩।৩১।৩৫)

—:•:—

বঞ্চনা ও অমায়ায় কৃপা

জগদ্‌গুরু আচার্য্যবর্য্যের শ্রীমুখে যে-সকল মহাবিপ্লবকরী শ্রৌতসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা একটি বিপ্লবময়ীবাণী এই যে, পরমকৃপাময় হরি-গুরু-বৈষ্ণব একদিকে বঞ্চক আবার অন্যদিকে অমায়ায় অহৈতুক কৃপা-বিতরণকারী। শ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় গুরুপাদপদ্মের চরিতকীর্ত্তন-প্রসঙ্গে 'আমার প্রভুর কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"এক অলৌকিক কথা এই যে, শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্ম-বিরোধী ছলধর্ম্মপরায়ণ অনেকগুলি প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে) বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কুবিষয়ে প্রমত্ত ছিল। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই ; আবার তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে গ্রহণও করেন নাই। তাদৃশ ভক্তিবিরোধী কপটিগণ গৃহীত হইলে তাহাদের অপ্রাকৃত ভাগবতধর্ম্ম দেখিয়া আমরা ধন্য হইতাম। ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের লিখিত—'অমায়ায় দয়া' পাইলে বাস্তবিক তাহাদিগেরও প্রকৃত মঙ্গল হইত, বিষয় বিচ্ছিন্ন হইত, কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইত।"

শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মহাপুরুষ কাহাকেও প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রহণ করিয়াছেন কি না, তাহার স্বরূপ-লক্ষণ-বিচারে জানা যায় যে, সেইরূপ ব্যক্তির প্রকৃত আত্মমঙ্গল হইয়াছে। তিনি অপ্রাকৃত ভাগবতধর্ম্মের অনুশীলনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার বিষয় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইয়াছে।

কোন কোন ব্যক্তি নিজদিগকে সাধুর বিশেষ স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া সাধুকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন বা সাধু ঐ সকল ব্যক্তিকে তাঁহার স্নেহপাত্র বলিয়া ধারণা করাইতেছেন, ইহাই সাধুর অমায়ায় কৃপাপ্রাপ্তির স্বরূপ-লক্ষণ নহে। অপ্রাকৃত সাধুর সেবা-প্রভাবে কতটা প্রাকৃত বিষয় হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়াছি এবং

কতটা অহৈতুক কৃষ্ণসেবার পথে চলিয়াছি, তাহাই সাধুর, মহাপুরুষের বা গুরুদেবের অমায়ায় কৃপাপ্রাপ্তির কষ্টিপাথর।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ এই ভাবে মহাপ্রভুকে স্তব করিয়াছিলেন,—

"তোমার ভক্তের সঙ্গে গোষ্ঠী না করিলুঁ।
তোমার কীর্ত্তন না করিলুঁ না শুনিলুঁ॥
রাজপাত্র করি' মোরে বঞ্চনা করিলা।
তবে মোর মনুষ্য-জনম কেনে দিলা॥
যে মনুষ্যজন্ম লাগি' দেবে কাম্য করে।
হেন জন্ম দিয়াও বঞ্চিলা প্রভু, মোরে॥
এবে এই কৃপা কর' অমায়া হইয়া।
বৃক্ষমূলে পড়ি' থাকোঁ তোর নাম লৈয়া॥
হে তোমার প্রিয়পাত্র লওয়ায় তোমারে।
অবশেষপাত্র যেন হঙ তা'র দ্বারে॥"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।২৪৭-২৫১)

আচার্য্য, বৈষ্ণব ও কৃষ্ণ বঞ্চনা করেন, এই কথাটি পার্থিব চিন্তাস্রোতযুক্ত ব্যক্তির নিকট একটি মহা বিপ্লবী কথা। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহু ব্যক্তিকে ব্যবহারিক সম্মান ও স্নেহাদি প্রদর্শনে বঞ্চনা করিতেন, এই কথা এক সময়ে "গৌড়ীয়ে" প্রচারিত হওয়ায় শ্রীবৃন্দাবনের কোন এক প্রতিষ্ঠাশালী পণ্ডিত ব্যক্তি 'বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ'-পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ন্যায় মহাপুরুষকে 'বঞ্চক' বলিয়া প্রতিপন্ন

করা সর্ব্বতোভাবে বিগর্হিত ও সৎসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের চরিত্র সরলতা ও নিষ্কপটতার মূর্ত্তিমান্ আদর্শ ছিল, তাহাতে কিরূপে বঞ্চনা-বিদ্যা থাকিতে পারে?

৪র্থ বর্ষের ১১শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানু-সারে "বঞ্চক বৈষ্ণব" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে কএক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"এ আবার কেমন কথা! বৈষ্ণবও কি কখনও বঞ্চক হন? এ যে মহা-অপরাধের কথা! কানে শুন্‌তে নাই—ওঁ শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু! * * *।

বৈষ্ণব— বঞ্চক, পরম বঞ্চক। জগতে যদি কেহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বঞ্চক থাকেন, তাহা হইলে তিনি ঐ 'বৈষ্ণব'। বৈষ্ণবের ঐ বঞ্চকতা উত্তরাধিকারিসূত্রে পাওয়া বস্তু। বিষ্ণু একজন পরম বঞ্চক। ছলনাকারী বামনদেবের কথা শুনিয়াছেন ত? বিষ্ণুর এরূপ বহু বহু বঞ্চকতার উদাহরণ শাস্ত্রে আছে। ভগবানের একটি নাম—'বাঞ্ছা-কল্পতরু'। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' যাঁহারা আত্মবঞ্চিত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া-ছেন, বিষ্ণু ও বৈষ্ণব তাঁহাদিগের নিকট 'বঞ্চক'; কিন্তু আত্মবঞ্চিত ব্যক্তি বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের এই বঞ্চনাটি ধরিতে পারেন না।

শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ—ইঁহারা কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের নিকট বঞ্চক। ঠাকুর হরিদাস, রায় রামানন্দ—ইঁহারা জগতের ইন্দ্রিয়-পরায়ণ মূঢ় লোকের নিকট বঞ্চক। শ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীজীবের বৃন্দাবনে একত্র বাস- বঞ্চিত প্রাকৃত ভোগী জীবের চক্ষে তাহারই

ন্যায় সংসার পরিত্যাগ করিয়াও পুনরায় রক্তমাংসের আকর্ষণ-হেতু ভ্রাতুষ্পুত্র, জেঠাখুড়ার ন্যায় প্রতিভাত হয়। বৈষ্ণব বঞ্চক বলিয়াই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বৈষ্ণব-গার্হস্থ্য-লীলা রাজকর্ম্ম প্রভৃতি এবং প্রকৃত পরমহংস্যাধিকার প্রদর্শনের জন্য বেষাশ্রয় গ্রহণ করিবার পরে কিছুকাল হরিভজনময় গোলোক-প্রতীতিযুক্ত গৃহে অবস্থান-লীলা। বৈষ্ণব বঞ্চক বলিয়াই সহজ-পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও পরম-হংসাবধূত শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের আশ্রিতম্মন্য বঞ্চিত ব্যক্তিগণের সহিত চা'লের দর, ভুষিমালের দর, জায়গা জমিনের দর, বহির্ম্মুখ গৃহের স্ত্রী-পুত্রাদির কুশল-জিজ্ঞাসারূপ লীলা। বৈষ্ণব বঞ্চক বলিয়াই শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের কুলিয়া-নবদ্বীপের ধর্ম্মশালার সাধারণের মল-ত্যাগের স্থানে অবস্থান, কখনও ফ্রেঞ্চ্‌কাট্‌ দাড়ি, কখনও কালকস্তা পেড়ে ধুতি ও চাদর পরিধান প্রভৃতি অভিনয়। বৈষ্ণব 'বঞ্চক' বলিয়াই কুলিয়া-নবদ্বীপের নূতন চড়ায় শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহাশয়ের অর্চ্চন মার্গের কনিষ্ঠাধিকারী ব্যক্তির ন্যায় আচরণ এবং—"সংসারের জঞ্জাল্যা কাম না ছাড়ালি মোরে" অর্থাৎ হে নিত্যানন্দ, আমাকে হরিভজন করিতে আনিয়াও তুমি সংসারের স্ত্রী-পুত্রের সেবার ন্যায় বাসনমাজা, বাজার করা, ঘর পরিষ্কার করা প্রভৃতি কার্য্য ছাড়াইলে না, ইত্যাদি লীলাভিনয় **। এই মহাত্মা অনেক সময় হস্তে একটি 'হুঁকা' লইয়া ধূম্রপান (তামাকু সেবন) করিবার ভাণ দেখান, কোন সময় বা তাঁহার ভজনকুটীরের নিকটে মৎস্যের আঁইস, কাঁটা প্রভৃতি ফেলিয়া রাখেন, উদ্দেশ্য—

ইহা দেখিয়া লোকে তাঁহাকে একজন অবৈষ্ণব বা কপটবেষী-জ্ঞানে ঘৃণাপূর্ব্বক তাঁহাকে আর আদর-সম্মানাদি করিবেন না, বা তাঁহার নিকটে আসিবেন না, তিনি একান্তে হরিভজন করিতে পারিবেন। কিন্তু আত্মবঞ্চিত ব্যক্তিগণ তাঁহার এই বঞ্চনা বুঝিতে পারেন না। তাঁহার লম্বমান শ্মশ্রু প্রভৃতি দেখিয়া আত্মবঞ্চিত ব্যক্তিগণ মনে করেন, তিনি বুঝি একজন বাউল বা দরবেশ-শ্রেণীর কোন লোক হইবেন। বঞ্চিত ব্যক্তিগণ এইরূপ নানাভাবে বঞ্চিত হইয়া থাকেন।

আমাদের পরিচিত কোন ব্যক্তি আমাদের নিকট এই 'বঞ্চক বৈষ্ণবে'র কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃপা যাচ্ঞা করিতে গিয়াছিলেন। 'বঞ্চক বৈষ্ণব' তাঁহাকে কিছুতেই অমায়ায় কৃপা করিতে স্বীকৃত ছিলেন না; কিন্তু এই ব্যক্তি তাঁহার বিষয় আংশিকভাবে অবগত ছিলেন বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাকে কৃপা করিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। 'বঞ্চক' বৈষ্ণব তখন অকপট কৃপাপ্রদানে উদ্যত হইয়া বলিলেন,—"আমি তোমাকে এই ছিন্ন কৌপীন দিতেছি, গ্রহণ কর।" ঐ ব্যক্তিটি এই সরল কৃপার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন—বৈষ্ণবের নিকট হইতে বঞ্চিত হইতে; কিন্তু যখন দেখিলেন, বঞ্চক বৈষ্ণব অমায়ায় কৃপা প্রদর্শন করিতেছেন, তখন তিনি ব্যথিত হইয়া ঐ 'বঞ্চক-বৈষ্ণব'কে শেষ দণ্ডবৎ দিয়া ব্যাধভয়ে ভীত হরিণের ন্যায় কুলিয়ার নূতন চড়ার মধ্য দিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন; ভয়ে পশ্চাতে একবারও চাহিয়া দেখিলেন না, পাছে তাঁহার মৃত্যুস্বরূপ

ঐ বৈষ্ণব আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলেন ; উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে ব্যক্তি হুলোরঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চাহিয়া দেখিলেন,—পশ্চাতে কেহ তাঁহার অনুসরণ করিতেছে কি না দেখিলেন—কেহই নাই। তখন তাঁহার হৃদয়ে যেন প্রাণ আসিল, তিনি আশ্বস্ত হইলেন, হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন ** ।”

বৈষ্ণবগণ যতক্ষণ আমাদের নিকট বঞ্চক থাকেন, ততক্ষণই তাঁহারা আমাদের প্রিয় ও সম্মানভাজন হন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের জীবনে অনেক ব্যক্তির সম্বন্ধে অনেকেই এইরূপ ঘটনা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা কাহাকেও বা আলুর দর, কলার দর বলিয়া বিদায় দিয়াছেন, কাহাকেও বা তামাক দিয়া বিদায় দিয়াছেন, কাহাকেও বা উচ্চ আসন ও সম্ভাষণাদির দ্বারা বিদায় দিয়াছেন। ঐ সকল বঞ্চিত ব্যক্তি বঞ্চক বৈষ্ণবের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া মনে করিয়াছেন যে, উক্ত মহাপুরুষগণ প্রমুখ ঐরূপ সম্মানিত ব্যক্তিগণ যখন তাঁহাদিগকে সম্মানাদি করিয়া থাকেন, তখন তাঁহারা নিজেরা না জানি কত বড় ভক্ত, নিশ্চয়ই তাঁহাদের অপেক্ষাও বড়! কেহ বা মনে করিয়াছেন, আমি ব্রাহ্মণ ও গোস্বামি-বংশ (?) বলিয়াই বোধ হয় আমাকে এরূপ উচ্চ আসন ও হুঁকা দ্বারা সম্মান দিয়াছেন, সুতরাং আমি নিশ্চয়ই তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! তাঁহারা আমার শিষ্যস্থানীয় (?), আমি তাঁহাদের গুরু (?)! এইরূপ কত লোক কত ভাবে যে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার ঐ সকল বঞ্চিত ব্যক্তিদের জীবনেই দেখা গিয়াছে,

যখন ঐ বঞ্চক বৈষ্ণব বঞ্চনা পরিত্যাগ করিয়া অমায়ায় ঐসকল ব্যক্তিকে কৃপা প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন ঐসকল ব্যক্তি তাঁহাদের অঘ-বক-পূতনাসদৃশ বিদ্বেষি স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া ফেলিয়াছেন। একদিন যে-সকল বঞ্চিত ব্যক্তি 'বঞ্চক বৈষ্ণবের' আচরণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের 'ভোগা'কেই বৈষ্ণবতা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, আবার তাঁহারাই ঐসকল মহাপুরুষের সরল কৃপার কথা গ্রন্থাদিতে পড়িয়া বা তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া ঐসকল মহাপুরুষের বিরোধ করিতে ত্রুটী করেন নাই।

বিভিন্ন সময় স্বতন্ত্রচিন্তাস্রোতে ভাসমান বিভিন্ন লোককে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদানকালে শ্রীল প্রভুপাদ সেই সকল জাগতিক মহদ্‌ব্যক্তিগণের সম্মুখেই নির্ভীক কণ্ঠে বলিয়াছেন,—'আপনাদের সহিত ঐসকল মহাপুরুষের আদৌ কোন দিন সাক্ষাৎকারই হয় নাই!'—এই কথায় তাঁহারা কেহ কেহ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া বলিয়াছেন,—'আমি অমুক মহাপুরুষের নিকট গীতা পড়িয়াছি'; কেহ বা বলিয়াছেন,—'আমি তাঁহার অনেক সেবা করিয়াছি, তাঁহাদিগকে পাক করিয়া খাওয়াইয়াছি'; কেহ বা বলিয়াছিলেন,—'শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু আমার নিকট তাঁহার সমস্ত দ্রব্যাদি গচ্ছিত রাখিতেন', কেহ বা বলিয়াছেন,—'বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজকে আমি স্কন্ধে বহন করিয়াছি'—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সেই সকল মহাপুরুষের সিদ্ধান্ত ও চিত্তবৃত্তি হইতে

যাঁহাদের বিচার ও চিত্তবৃত্তি পৃথক্, তাঁহাদিগকে আচার্য্যবর্য্য নির্ভীককণ্ঠে বলিতেন,—"আপনারা সেই সকল মহাপুরুষকে দেখিতেই পা'ন নাই, সেবা করা ত' দূরের কথা।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীরূপের রসামৃতসিন্ধুর সিদ্ধান্তের পদ্যানুবাদ করিয়া বলিয়াছেন,

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি, মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া।

(চৈঃ চঃ আঃ ৮।১৮)

"অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥"

(ভাঃ ৫।৬।১৮)

ভজনশীল সকাম ভক্তদিগকে মুকুন্দ সহজে মুক্তি দান করেন, কিন্তু কখনও তাহাদিগকে ভক্তিযোগ দান করেন না।

অনেকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের ভজন করিয়া সালোক্য, সামীপ্য ও সার্ষ্টি প্রভৃতি মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু শুদ্ধভক্ত হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সমান ঐশ্বর্য্য, সমান লোকলাভ বা সমীপাবস্থান কিংবা তাঁহাদের পদবী লাভ অযাচিতভাবে আগমন করিলেও প্রেম-সেবা অর্থাৎ অপ্রাকৃত সেব্যগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত নিজ-সুখার্থ কিছুই গ্রহণ করেন না।

"আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেম-সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।২০৪)

"দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥
(ভাঃ ৩।২৯।১১২)

অর্থাৎ শুদ্ধসেবক অন্তরের অন্তস্থলের কোথায়ও হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার বিনিময়ে প্রাকৃত জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি কামনা ত' করিবেনই না, অধিক কি, হরি-গুরু-বৈষ্ণব যদি সেবাবৃত্তি পরীক্ষা ও বঞ্চনা করিবার জন্য ঐসকল সাধ্যসাধনা করিয়াও উহা প্রদান করিতে উদ্যত হন, তথাপি তাহা অন্তরের কোনস্থানে গ্রহণ করিবেন না। একমাত্র সেবা ব্যতীত শুদ্ধভক্তের আর কোন প্রার্থনীয় বস্তু নাই। তাই প্রহ্লাদের চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,-- শ্রীনৃসিংহদেব প্রহ্লাদের ঐকান্তিকী সেবায় পরমতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলে প্রহ্লাদ ভগবানের ঐরূপ বঞ্চনা হইতে সমগ্রজীব-জগৎকে সতর্ক করিবার জন্য বলিয়াছিলেন,—

"মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্ব্বরৈঃ।
তৎসঙ্গভীতো নির্ব্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ ॥"
(ভাঃ ৭।১০।২)

হে ভগবন্! স্বভাবতঃ কামাসক্ত আমাকে কামপূরক বরের দ্বারা প্রলুব্ধ ও বঞ্চিত করিবেন না। আমি কামসঙ্গ-ভীত, নির্ব্বেদপ্রাপ্ত এবং কাম হইতে মুক্তি পাইবার ইচ্ছায় আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি।

"ভৃত্যলক্ষণজিজ্ঞাসুর্ভক্তং কামেষ্বচোদয়ৎ।
ভবান্ সংসারবীজেষু হৃদয়গ্রন্থিষু প্রভো ॥"
(ভাঃ ৭।১০।৩)

হে প্রভো, আপনি ভক্তের লক্ষণ জানিবার অভিপ্রায়ে হৃদয়ের গ্রন্থি ও সংসারের বীজস্বরূপ কামে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

"নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটেত করুণাত্মতঃ।
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্॥"
(ভাঃ ৭।১০।৪)

নতুবা হে অখিল গুরো, করুণাময়, আপনি কখনই স্বভক্তকে অনর্থে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন না। আপনা হইতে যে ব্যক্তি বিষয়াদি ভোগ প্রার্থনা করে, সে আপনার ভৃত্য নহে—সে বণিক্।

"আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ॥"
(ভাঃ ৭।১০।৫)

স্বীয় প্রভুর বা গুরুর নিকট নিজের কোনপ্রকার বিষয়কামী ব্যক্তি ভৃত্য নহে এবং ভৃত্য হইতে স্বীয় প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী ঐশ্বর্য্যদাতা ব্যক্তিও 'প্রভু' নহেন।

প্রহ্লাদ মহারাজ ভৃত্য ও বণিকের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বণিক্ জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে প্রভুকে বা হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে 'খাজাঞ্চি'রূপে গ্রহণ করে, আর প্রকৃত ভৃত্য প্রভুর স্বেচ্ছাপ্রদত্ত কোন প্রকার বিষয় ও গ্রহণ করিয়া প্রভুকে খাজাঞ্চিরূপে পরিণত করেন না। ভক্তভৃত্য ও বণিক্‌ভৃত্যের এই স্থানেই পার্থক্য। ভক্তভৃত্যের অর্থাৎ আশ্রয় বিগ্রহের আনুগত্যে ভজনকারী ব্যক্তির

আদর্শ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের শ্লোকে ও সম্রাট কুলশেখরের মুকুন্দমালা-স্তোত্রের শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

কোন এক কবি বলিয়াছেন, হরিগুরুবৈষ্ণবের দ্বারা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহ দক্ষিণাবর্ত্ত-শঙ্খকে পোড়াইয়া ছাই করিয়া তদ্দ্বারা ভাতের হাঁড়ির ছেঁদা বন্ধ করিবার চেষ্টার ন্যায় মূর্খতা। ইহা ধ্রুবও বুঝিতে পারিয়া খেদের সহিত বলিয়াছিলেন—

"স্বরাজ্যং যচ্ছতো মৌঢ্যান্মানো মে ভিক্ষিতো বত।
ঈশ্বরাৎ ক্ষীণপুণ্যেন ফলীকারানিবাধনঃ॥

(ভাঃ ৪।৯।৩৫)

হায়! যেমন নির্ধনব্যক্তি চক্রবর্ত্তী ভূপতির নিকট সতুষ-তণ্ডুলকণা প্রার্থনা করে, তদ্রূপ আমিও এমন দুষ্কৃতিশালী যে শ্রীহরির নিকট অকিঞ্চিৎকর অসদ্‌বস্তু প্রার্থনা করিলাম! শ্রীহরি আমাকে সেবানন্দ প্রদান করিতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন, কিন্তু আমি মূঢ়তাবশতঃ তাঁহার নিকট মান প্রার্থনা করিয়াছি!

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বাণীর মধ্যে আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"ভোগ্য অর্থের লোভ যেন আমার নিতান্ত পরমশত্রুরও কোনদিন না ঘটে, যে সকল পাষণ্ডের অর্থলোভ আছে, অর্থাৎ যাহাদের অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহাকে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা ও কনক-কামিনীর ভোগে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা আছে, যেন সেই সকল পাষণ্ডের মুখদর্শন আমাকে জীবনের শেষ কয়টা দিন আর করিতে না হয়॥"

('পত্রাবলী' ২য় খণ্ড ৪৯ পৃষ্ঠা।)

আমাদের প্রবল দুর্ভাগ্য থাকিলেই আমরা লাভ-পূজা-

প্রতিষ্ঠাদি দ্বারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের শুদ্ধ সেবা হইতে বঞ্চিত হই। হরি-গুরু-বৈষ্ণব অনেক সময় ঐ সকল বস্তু প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া আমাদের সেবাবৃত্তির পরীক্ষা করেন। কেহ যেন মনে না করেন—হরি-গুরু-বৈষ্ণব আমাদিগকে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি প্রদান করিয়া অন্যায় কার্য্য করেন। তাঁহারা ত' দান করিবেনই। প্রকৃত দাতা ত' নিজের রুধির নিঙ্গড়াইয়া নিঙ্গড়াইয়া দান করিয়া আপনাকে বলি দেন। কিন্তু আমি কেন "দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ"। ভক্তের এই স্বরূপ-লক্ষণের কথাটি ভুলিয়া যাই? ভগবান্ চিরদিনই সেবায় প্রসন্ন হইয়া ভক্তগণকে বর দিতে উদ্যত হন, কিন্তু ভক্তভৃত্য ত' বণিকের ন্যায় কখনও সেবাব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না—ইহাও ত' শুদ্ধভক্তগণের চরিত্র সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। ইহাই ভক্তিবিজ্ঞান যে, অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তিকে সুগুপ্ত রাখিয়া অন্যান্য বস্তু দ্বারা বিপরীত বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিতে হইবে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু প্রহ্লাদ-পঞ্চরাত্রের বাক্য উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন, অপ্রাকৃত হরি-ভোগ্যবস্তু বৈষ্ণবগণকে দান করিতে হইবে, আর দ্রবিণাদি-দ্বারা কর্ম্মজড়গণকে বঞ্চনা করিতে হইবে,—

"স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ॥"
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।১০৩ সংখ্যা-ধৃত প্রহ্লাদপঞ্চরাত্র-বাক্য)

ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্ত বঞ্চনা করেন না—ইহা যাঁহারা বলেন, বা ভগবান্ ও ভক্ত বঞ্চনা করেন বলিয়া তাঁহারা জাগতিক 'জুয়া-

চোরের' ন্যায় হিংসক—এইরূপ যাঁহারা বিচার করেন, তাঁহাদের ভক্তিবিজ্ঞানে প্রবেশাধিকার নাই। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত বা গোস্বামি-সিদ্ধান্ত অথবা শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্মের কথা আলোচনা করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত মৌষল-লীলা, মহিষী-হরণাদি লীলাকে বিমুখ-বঞ্চনা বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে,—

"মৌষল-লীলা, আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার, আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥
মহিষী-হরণাদি সব—মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।১১১, ১১২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও সাত্বত শাস্ত্রসমূহ সমস্বরে জানাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম জগদ্‌গুরু শিব তাঁহার বঞ্চনাময়ী রুদ্রমূর্ত্তি প্রকট করিয়া শ্রীভগবানেরই ইচ্ছা ও আদেশানুসারে বিমুখ-বঞ্চনা করিয়া মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গি-গণকে বঞ্চনা করিয়া বিপ্রপাদোদকাদি পানলীলা, শ্রীকৃষ্ণ ভৃগু-পদচিহ্ন ধারণাদি লীলা প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ কর্ম্মসঙ্গিগণ ভগবানের ঐ সকল লীলার তাৎপর্য্য ও শিক্ষা অবধারণ করিতে পারেন নাই।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণশক্তির 'কপট কৃপা' ও 'অকপট কৃপা'—এই দুই প্রকার ভেদ ব্রহ্মসংহিতাদি গ্রন্থের বিবৃতিতে জানাইয়াছেন। মুখে অকপট কৃপা আমরা সকলেই

চাহিতে পারি, কিন্তু যদি আমাদের অন্তরে কাপট্যপূর্ণ অন্যাভিলাষ থাকে, তাহা হইলেই আমরা ফল-লাভকালে কৃষ্ণশক্তির কপট কৃপায় সমাচ্ছন্ন হই, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির দ্বারা বিমোহিত হই। তাই প্রকৃত আত্মমঙ্গলকামী আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তরের অন্তস্থল হইতে অকপটে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে নিরন্তর এই প্রার্থনাই জানাইতে হইবে যে, আমাদের যত দুর্ভাগ্য ও বিপদ্ আসুক না কেন, যেন হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কপটকৃপাদ্বারা বঞ্চিত না হই। আত্মমঙ্গল বিলম্বে আসে আসুক, তথাপি যেন তাঁহাদের "অমায়ায় দয়া" বরণ করিবার যোগ্য হইতে পারি। "অমায়ায় দয়া" আমাদের অনাদি বহির্ম্মুখদৃষ্টিতে যতই নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর হউক না কেন, আমরা যতই তাহার গ্রহণে অযোগ্য হই না কেন, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে এই প্রার্থনা যেন জন্ম জন্মান্তর পরেও সেই অমন্দোদয়া "অমায়ায় দয়া"র সহিত আমাদিগকে যথাযোগ্যভাবে সন্নিবেশিত (adjust) করিতে পারি। বহু অপার্থিব সুকৃতির ফলেই শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মের ধূলির সহিত স্বীয় চিৎসত্তাকে যথাযোগ্য সন্নিবেশিত করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়।

—:*:—

অন্তরঙ্গ

বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'অন্তরঙ্গ'শব্দটির বিশেষ প্রচলন আছে। অন্তরঙ্গ-শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ—বহিরঙ্গ। অন্তঃ+অঙ্গ= অন্তরঙ্গ অর্থাৎ নিজজন, আপনার লোক, পরমাত্মীয়। বহিঃ+ অঙ্গ=বহিরঙ্গ—অনাত্মীয় বা বাহিরের লোক। বৈষ্ণবকোষে 'অন্তরঙ্গ' শব্দের তাৎপর্য্য—স্বযূথাশ্রিত সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট, সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ; আর তদ্‌বিপরীত চিত্তবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তি—বহিরঙ্গ।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিষয় ও আশ্রয়ের সম্বন্ধ লইয়াই 'অন্তরঙ্গ' ও 'বহিরঙ্গ'-শব্দের ঐরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। বিষয়ের সহিত একান্ত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া বিষয়ের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণের জন্য সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করিয়া জীবন-ধারণই অন্তরঙ্গের একমাত্র স্বভাব। বিষয়ের সুখতাৎপর্য্যপরতা ব্যতীত পৃথগ্‌ভাবে তাঁহার কোন প্রকারই চেষ্টা বা অবস্থান নাই। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা—সকলই বিষয়ের সেবার উপকরণ, ইহা যে আশ্রয়ের স্বাভাবিক বৃত্তিরূপে অনুক্ষণ প্রকাশিত, তিনিই অন্তরঙ্গ-পদবাচ্য। এই অন্তরঙ্গতা কোন কৃত্রিম উপায়ে অর্জ্জন করা যায় না। ইহা নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ-বৃত্তি!

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীল দামোদরস্বরূপ গোস্বামি-প্রভুকে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ বা অন্তরঙ্গ বলিয়াছেন। কারণ

স্বরূপ-দামোদর মহাপ্রভুর সহিত সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ মহাপ্রভুর চিত্তবৃত্তির সহিত সম্ভোগ-চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির মিলন হইতে পারে না। যিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বক্ষণ মহাপ্রভুর সেই বিপ্রলম্ভরসের পুষ্টি করেন, তিনিই তাঁহার অন্তরঙ্গ। ইহাতে কোন বাহ্য বিচারের অবকাশ নাই। স্ত্রী বা পুরুষ, গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র—এই সকল বাহ্য পোষাকের কোনপ্রকার বিচার অন্তরঙ্গের বিচারে নাই। শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু বাহ্য-দর্শনে ত্যাগীর বেশ ধারণ করিয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুর নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে গণিত; আবার শ্রীরায় রামানন্দ বিষয়ী গৃহস্থ বা ব্রাহ্মণেতরকুলে আবির্ভূত থাকিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ ভক্ত। মাধবী মাতা বাহ্য-দর্শনে স্ত্রীলোক হইয়াও মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তের গণে গণিতা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীস্বরূপ গোস্বামি-প্রভুর কথা এইরূপ লিখিয়াছেন,—

স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।

* * *

"রাধিকার ভাব-মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর॥"

* * *

"যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীত-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর॥"

—(চৈঃ চঃ আ ৪।১০৫-১০৬, ১১০)

আবার অন্যত্র কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—

"রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥"

*　　　*　　　*

"তাঁ'র সুখ-হেতু সঙ্গে রহে দুই জনা।
কৃষ্ণরস-শ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা॥
সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়।
গৌরসুখদান-হেতু তৈছে রাম-রায়॥
পূর্ব্বে যৈছে রাধার ললিতা সহায় প্রধান।
তৈছে স্বরূপ-গোসাঞি রাখে প্রভুর প্রাণ॥
দুই জনার সৌভাগ্য কহন না যায়।
'প্রভুর অন্তরঙ্গ' বলি' যাঁরে লোকে গায়॥

—(চৈঃ চঃ অ ৬।৬, ৮-১১)

উপরি-উক্ত পদসমূহ হইতেও আমরা বুঝিতে পারি যে, বিষয়ের সুখানুসন্ধান-পরতা ও সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্টতাই অন্তরঙ্গতার লক্ষণ। যেখানে বিষয়ের সহিত আন্তরিক সমচিত্তবৃত্তি নাই, অথচ বিষয়ের সুখানুসন্ধান-চেষ্টার ছল বা অভিনয় আছে, তাহা কিন্তু অন্তরঙ্গতার লক্ষণ নহে। সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধতা ও স্বযূথাশ্রিত সমচিত্তবৃত্তিই অন্তরঙ্গতার স্বরূপলক্ষণ।

কেহ কেহ মনে করেন, যিনি বা যাঁহারা গুরুবৈষ্ণবের ইচ্ছানুরূপ বাহ্যতৎপরতা প্রদর্শন করেন, কিংবা তাঁহাদের দৈহিক পরিচর্য্যাদি করিয়া থাকেন, বা অনুক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, তাঁহারাই অন্তরঙ্গ! সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট না হইয়া আচার্য্যের

ইচ্ছানুরূপ চেষ্টার বাহ্য অভিনয় করিলেও তাঁহাকে অন্তরঙ্গ-শ্রেণীযুক্ত করা যাইতে পারে না। ভুবনপূজিতা দুর্গা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের জন্য গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ নিরন্তর চেষ্টা করিয়াও 'বহিরঙ্গা' শক্তি বা 'ছায়াশক্তি'-নামে অভিহিতা হইয়াছেন। দুর্গাদেবী কতই না কর্ম্মতৎপরতা ও বিক্রম প্রদর্শন করিয়া ভগবানের বাহ্যবপুস্বরূপ এই জগতের সেবায় নিযুক্ত আছেন; সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি কার্য্য-দ্বারা কত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত জীবের চমৎকারিতা বিধান করিতেছেন, কত অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু তিনি বহিরঙ্গা বা আবরিকা শক্তি বলিয়াই সাত্বতগণের দ্বারা অভিহিত হইয়াছেন। যাঁহারা বপুকে অধিক আদর করেন,—এরূপ চতুর্দ্দশ ভুবনের লোক কিন্তু এই বহিরঙ্গা শক্তিকেই 'অন্তরঙ্গা শক্তি' বলিয়া প্রচার এবং নিজদিগকে তাঁহার 'অন্তরঙ্গ ভক্ত' বলিয়া ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। কিন্তু একান্ত গোবিন্দ-সেবাতৎপর ব্রহ্মার বাণীতে আমরা শুনিতে পাইতেছি,—

"সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূমপি যস্য চ **চেষ্টতে** সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

(ব্রঃ সং ৪৪)

স্বরূপশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবন-পূজিতা দুর্গা। তিনি

যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকেই আমি ভজন করি।

অতএব ইচ্ছানুরূপ চেষ্টার অভিনয়মাত্রই অন্তরঙ্গ সেবা নহে, আর বিরাট্ কর্ম্মতৎপরতা বা জাড্য কোনটিই সেবার লক্ষণ নহে; সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের মনোঽভীষ্ট আচার ও প্রচারই অন্তরঙ্গ ভক্তের স্বভাব। ঠাকুর নরোত্তম শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুকে শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক অন্তরঙ্গ নিজ জন বলিয়া জানাইয়াছেন,—

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

যিনি পৃথিবীতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট স্থাপন করিয়াছেন, সেই স্বয়ং রূপগোস্বামী কবে আমাকে স্বীয় চরণ-সমীপে স্থান প্রদান করিবেন।

শ্রীরূপ মহাপ্রভুর সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট ভূতলে স্থাপন করিয়াছেন বলিয়াই তিনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ। শ্রীসনাতন-শ্রীরূপাদি গোস্বামিবৃন্দ মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-রসের পরিপোষ্টা। এই বিপ্রলম্ভরস-পরিপোষণ-সেবাই তাঁহাদের ভূতলে শ্রীচৈতন্য মনোঽভীষ্ট-স্থাপন। শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-সেবার জন্য তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ বিপ্রলম্ভই বহিরঙ্গা দৃষ্টিতে 'বৈরাগ্য' বলিয়া বিবেচিত। বস্তুতঃ বিরাগ বলিয়া কোন কথা তাঁহাদের প্রতি প্রযুক্তই হইতে পারে না। সম্ভোগ-চেষ্টা থাকিলেই তদপগমে বিরাগ-কথার সার্থকতা হয়। তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধভাবই শ্রীচৈতন্য-

মনোঽভীষ্টের সহিত একতাৎপর্য্যপর, এই জন্যই তাঁহারা অন্তরঙ্গ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রার্থনা গীতিতেও বলিয়াছেন,—

"গৌর-প্রেমরসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তাঁ'র সঙ্গ ॥"

গৌরপ্রেমরসার্ণবই বিপ্রলম্ভরস-সমুদ্র। সম্ভোগবাদে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত প্রভৃতি অভক্তি এবং মিছা ভক্তির বহুরূপী তৎপরতা অনুস্যূত রহিয়াছে। এই সকল যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তিনি শুদ্ধভক্তপদবাচ্য বা শুদ্ধবৈষ্ণব। মহাজনের ভাষায় বলিতে গেলে—

"কনক কামিনী- প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যা'রে সেইত' বৈষ্ণব।"

এইরূপ শুদ্ধভক্ত বা শুদ্ধবৈষ্ণবে যখন অপ্রাকৃত মধুর-রসগত অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরস-প্রাচুর্য্য প্রকাশিত হয়, তখনই তিনি 'অন্তরঙ্গ-ভক্ত' পদবাচ্য। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শুদ্ধভক্ত ও অন্তরঙ্গ-ভক্তের বৈশিষ্ট্য অনুভাষ্যে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"মধুর-রসে নিত্যাশ্রিত ভক্তগণই শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ সেবক। সেই শুদ্ধভক্তগণ যখন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি-বিশিষ্ট হন, তৎকালেই তাঁহারা অন্তরঙ্গ-ভক্তের আশ্রয়ে

মধুর-রসাশ্রিত হন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা'র আদিতে এই কথা পরিস্ফুট হইয়াছে—

"'গৌরাঙ্গ' বলিতে হ'বে পুলক শরীর।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর ॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি ॥"

'শুদ্ধভক্ত' ও 'অন্তরঙ্গভক্তে'র বৈশিষ্ট্য-বর্ণনে শ্রীরূপপাদ তংকৃত 'উপদেশামৃত'-গ্রন্থে সাধক জীবের ক্রমোৎকর্ষ এরূপ লিখিয়াছেন—'কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনস্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ। তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোপি সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥

যাঁহারা অন্যাভিলাষিতা শূন্য হইয়া স্বীয় শুদ্ধা কৃষ্ণানুশীলন-বৃত্তিকে কর্ম্ম বা জ্ঞানের আবরণে আবৃত করেন না, তাঁহারা শুদ্ধভক্ত ; **কেবল-মধুর-রসাশ্রিত ঐকান্তিক ভক্তগণই অন্তরঙ্গ-ভক্ত। শুদ্ধভক্ত-বিশেষই অন্তরঙ্গ-ভক্ত।"**

সাধারণ জীব অন্যাভিলাষিতা ও কর্ম্মজ্ঞানের আবরণ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তই হইতে পারে না, অন্তরঙ্গ ভক্ত হওয়া

ত' দূরের কথা। অথচ, আমরা সকলেই 'অন্তরঙ্গ ভক্ত' বলিয়া প্রচারিত হইতে উৎসুক !! কে কতটা চালাকি করিয়া অন্তরঙ্গ ভক্ত হইব, তজ্জন্য নানাপ্রকার অবৈধ প্রতিযোগিতারও আমাদের ক্রটী নাই। হরিগুরু-বৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তির সমীপে উপস্থিত হইবার জন্য আমাদের আর্ত্তি আদৌ নাই, কিন্তু 'অন্তরঙ্গ ভক্ত' বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য আমরা অধিকতর ব্যগ্র, ব্যস্ত !! ইহা এক-প্রকার সম্ভোগবাদ। এইরূপ প্রতিষ্ঠাশা অন্যাভিলাষিতামাত্র। এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তি অন্তরঙ্গ ভক্ত হওয়া দূরে থাকুক, কোটি কোটি জন্মে শুদ্ধভক্ত হইতে পারিবেন কি না সন্দেহ ; অর্থাৎ এইরূপ মিছাভক্তির প্রতিষ্ঠাশা পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই শুদ্ধভক্তপদবাচ্যই হইতে পারিবেন না। **অন্তরঙ্গা ভক্তি আশ্রয়-বিগ্রহের বিশেষ কৃপার ফল।** শ্রীল জগদানন্দ প্রেমবিবর্ত্তে জানাইয়াছেন,—

"অন্তরঙ্গ-ভক্তি মনে, দেহে কিছু নয়।
কুটিনাটি-বলে মূঢ় আচরণ হয়॥
সেই সব অসৎসঙ্গ দূরে পরিহরি'।
কৃষ্ণ ভজে শুদ্ধভক্ত সিদ্ধদেহ ধরি'॥

অধোক্ষজের পরবর্ত্তী অপ্রাকৃত বা কেবল-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্তরঙ্গ-সেবাবৃত্তি প্রকাশিত হয়। অন্তরঙ্গ ভক্তে প্রাকৃত-নিষেধক ভাবমাত্র নাই, উহাতে আছে কেবলতা অর্থাৎ মূল আশ্রয়বিগ্রহের কেবল সেবাসুখ-তাৎপর্য্যপরতা। ললিতাদি অষ্টসখীগণ, শ্রীরূপ-প্রভৃতি মঞ্জরীগণ সকলেই শ্রীবার্ষভানবীর সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্টা

ও মূল আশ্রয়-বিগ্রহের সুখতাৎপর্য্যে কেবলা রতিবিশিষ্টা বলিয়া অন্তরঙ্গ-পদবাচ্য।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু বা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় মহাপ্রভুর প্রকটকালে আবির্ভূত না হইয়াও মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গভক্ত; কেন-না, তাঁহারাও মহাপ্রভুর সমচিত্ত-বৃত্তি-বিশিষ্ট ও কেবল ভাবযুক্ত। শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামি-প্রভু শ্রীস্বরূপ ও শ্রীরূপের অন্তরঙ্গ ভক্ত। মহাপ্রভুর উচ্চারিত কাব্যপ্রকাশের "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু বুঝিতে পারিয়া "প্রিয় সোঽয়ং" শ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুর অন্তরে গমন করিবার আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সহিত এক সজাতীয়াশয়যুক্ত স্নিগ্ধভাব ও সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্টতাই শ্রীরূপের অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করিয়াছে।

"স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে।
মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে॥
স্বরূপ কহে,—যাতে জানিল তোমার মন।
তাতে জানি,—হয় তোমার কৃপার ভাজন॥
প্রভু কহে,—তারে আমি সন্তুষ্ট হঞা।
আলিঙ্গন কৈলুঁ সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিঞা॥
যোগ্যপাত্র হয় গূঢ়রস-বিবেচনে।
তুমিও কহিও তারে গূঢ়রসাখ্যানে॥"

—(চৈঃ চঃ ম ১।৭১-৭৪)

সমন্বয়বাদিগণ 'অন্তরঙ্গ'-শব্দটি মুখে উচ্চারণ করিলেও অন্তরঙ্গ-

শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে না। "শ্রীস্বরূপ-রূপের আনুগত্য ব্যতীত মহাপ্রভুর পাদপদ্ম-সেবা বা কৃষ্ণপ্রেম-লাভ হয় না,"—এই কথা শুনিলে তাহারা অট্টহাস্য করিয়া থাকে! শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা অকপটে শ্রীস্বরূপ-রূপের একান্ত পক্ষপাতী, তাঁহারাই অন্তরঙ্গ-ভক্তশ্রেণীতে গণিত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম এই জন্য স্বরূপ-রূপানুগবর অর্থাৎ শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও শ্রীরূপের অনুগতগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বৃত হন! তবে অবৈধ অনুকরণ করিয়া ইতর চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে ঐরূপ উপাধিতে ভূষিত করিলে বিষ্ঠাভোজী বায়সকে ময়ূর-পুচ্ছে সজ্জিত করিবার চেষ্টার ন্যায় হইবে।

মহাপ্রভুর প্রকটকালেও কতকগুলি ব্যক্তি শ্রীস্বরূপ-রূপের আনুগত্য স্বীকার না করিয়াও মহাপ্রভুর ভক্ত হওয়া যায়, এমন কি, অন্তরঙ্গশ্রেণীতে গণিত হওয়া যায়—এইরূপ অসচ্চিন্তাস্রোতে ধাবিত হইয়াছিলেন। উৎকলের অতিবাড়ী জগন্নাথদাসের শিষ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের মত এই যে, "জগন্নাথদাস মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন, কিন্তু শ্রীরূপ, শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামিগণ ঈর্ষাপরবশ হইয়া জগন্নাথদাসকে 'অন্তরঙ্গ ভক্ত' বলিয়া স্বীকার করেন নাই!" জগন্নাথদাসের আচার, বিচার ও সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি মহাপ্রভু বা ঠাকুর হরিদাসের চিত্তবৃত্তি হইতে যে কতটা পৃথক্ ছিল, তাহাই ঐরূপ বন্ধ্যা যুক্তির মীমাংসা করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। মহাপ্রভু ও শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণের চিত্তবৃত্তি ছিল—বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত, আর জগন্নাথদাসের চিত্তবৃত্তি

ছিল—সম্ভোগবাদে পরিপ্লুত। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃষভানুনন্দিনীর ভাব ও কান্তিতে বিভাবিত থাকিলেও আপনাকে কখনও মূল আশ্রয়-বিগ্রহ 'শ্রীরাধিকা' বলিয়া বিচার করেন নাই, তিনি আপনাকে গোপীর কিঙ্করী বলিয়াই বিচার করিয়াছেন; কিন্তু জগন্নাথদাস প্রভৃতির চরিত্র সেই আদর্শের বিপরীত। বিষ্ণুদাস কবীন্দ্র প্রভৃতি সমসাময়িক ব্যক্তিগণের চরিত্রেও স্বরূপ-রূপানুগত্য প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রমুখ রূপানুগ আচার্য্যগণ তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্যরূপ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বরূপ-রূপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভময়ী চিত্তবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিয়া সম্ভোগময় চিন্তাস্রোতে নির্জ্জন-ভজনের অভিনয়, সেবা-সঙ্কল্পের অভিনয়, আনুকরণিক প্রচারের অভিনয় ও শ্রীরূপ-রঘুনাথের গ্রন্থাদি পাঠের অভিনয় করিয়াও, এমনকি, কেহ কেহ ভক্তিবিনোদ--শ্রেষ্ঠ বা অন্তরঙ্গ প্রভৃতি বলিয়া আপনাদিগকে প্রচার করিয়াও প্রাকৃত-সহজিয়ার আদর্শ হইয়া রহিয়াছে!

শ্রীস্বরূপ ও শ্রীরূপের চিত্তবৃত্তি মহাপ্রভুর সহিত একতাৎ-পর্য্যপর ছিল বলিয়াই—

"গীত, শ্লোক, গ্রন্থ, কবিত্ব, যেই করি' আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে॥
স্বরূপ ঠাঞি উত্তরে যদি, লয় তাঁর মন।
তবে মহাপ্রভু-ঠাঞি করায় শ্রবণ॥

—(চৈঃ চঃ অ ৫।৯৫-৯৬)

যখন কোন অতিমর্ত্ত্য আচার্য্য ভগবন্মনোঽভীষ্ট ভূতলে স্থাপনার্থ গোলোক হইতে ভূলোকে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার মনোঽভীষ্টের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয় উদ্দেশ্যই থাকে। আমরা শ্রীস্বরূপ গোস্বামি-প্রভুর কড়চার বাক্য হইতে আচার্য্যলীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রেও এই সিদ্ধান্তের সাক্ষ্য পাই। যাহা মনোঽভীষ্ট পূরণের স্থূল সহায়ক বা বপুগত চেষ্টা তাহাই আচার্য্যের মনোঽভীষ্টের বহিরঙ্গ। সেই বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য আচার্য্যের যে-সকল সহায়ক স্ব-স্ব-চিত্তবৃত্তি-অনুযায়ী যোগ্যতা লইয়া উপস্থিত হন, তাঁহারা আচার্য্যের বহিরঙ্গ সেবক। অধিকার-বিশেষে সেই বহিরঙ্গ সেবকেরও প্রয়োজনীয়তা ও যোগ্যতা আছে। যেমন কোন আচার্য্য যখন ভূতলে অপ্রাকৃত ভগবৎকথামৃত বিতরণ করেন, তখন সকলেই যে তাঁহার বাণীর তাৎপর্য্য আচার্য্যের চিত্তবৃত্তির অনুগত হইয়া বুঝিতে পারেন, তাহা নহে; কেহ কেহ অর্চ্চনাদি আড়ম্বর, মঠ-মন্দিরাদির স্থৌল্যবর্দ্ধন, ভোজন-বিলাস, পাণ্ডিত্যবিলাস কিম্বা তৎপ্রতিযোগী নির্জ্জনতা, মূর্খতা, বা বিভিন্ন প্রকার সুবিধা-সংগ্রহার্থ আলস্যময় জীবন-যাপনকেও আচার্য্যের প্রচারের উদ্দেশ্য বলিয়া বরণ করিয়া লন। অনেকে মহামহোৎসবে চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়তে আকৃষ্ট হইয়া কিংবা মঠ-মন্দিরাদির উৎকৃষ্ট সৌধ দর্শন করিয়া ও নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ভক্তিমুদ্রা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্য-ধাতুযুক্ত ব্যক্তি আচার্য্যের বাণীর অন্তরে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া আড়ম্বরপূর্ণ কার্য্যেই অধিক উৎসাহবিশিষ্ট হন। আবার আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি অনাড়ম্বরময় আলস্যকেই তাঁহাদের স্বভাবগত ধাতু-অনুসারে আচার্য্যের মনোঽভীষ্ট বলিয়া বিচার করেন।

আচার্য্যের সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার সেবার্থ যে অখিল চেষ্টা, উৎসাহ, উদ্যম, তাহা কিছু আড়ম্বর বা অনাড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মতৎপরতা নহে ;, কারণ সেইরূপ তৎপরতার মধ্যে একমাত্র অদ্বিতীয় স্বরাট্-লীলা-পুরুষোত্তমের প্রকাশবিগ্রহ নিত্যসিদ্ধ অদ্বয় গুরুপাদপদ্মকেই প্রতিষ্ঠিত করিবার অখিল চেষ্টা থাকে ; নিজের কোনরূপ সুবিধাসংগ্রহ বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা পৃথগ্ভাবে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা থাকে না। যদি পৃথগ্ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠাশা বা কোনরূপ প্রচ্ছন্ন সুবিধা-সংগ্রহের জন্য উদ্যম দেখা যায় এবং ঐ উদ্যমকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে গুরুমনোঽভীষ্ট-সেবা বলিয়াই চালাইবার অভিসন্ধি থাকে, তাহা হইলে উহাকে অন্তরঙ্গসেবা বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। এমনও শুনা যায় যে, কোনপ্রকার প্রচ্ছন্ন সুবিধা-সংগ্রহের জন্য মহাপুরুষের দৈহিক সেবা কিংবা তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কোন কোন কার্য্যের জন্য তৎপরতা ও উদ্যমাদি দেখা গিয়াছে ; কিন্তু সেরূপ সেবোৎসাহের অভিনয় অকৃত্রিম বলিয়া ধরা যাইতে পারে না অর্থাৎ তাহাতে প্রচ্ছন্ন অন্যাভিলাষ আছে। শ্রীস্বরূপরূপের চিত্তবৃত্তি ঐরূপ নহে। ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া তাঁহা হইতে কিছু দোহন করিয়া লইব এবং ভাবের ঘরে চুরি করিব, বা অপরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিব, সেরূপ চিত্তবৃত্তি আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যে ভাবেই থাকুক, তাহা অকৃত্রিম সেবার লক্ষণ নহে, অন্তরঙ্গ সেবা ত' দূরের কথা !

প্রতিষ্ঠান বা Structure (বপু), যদ্দ্বারা লোকসংগ্রহ হয়, তাহা ভগবন্মনোঽভীষ্ট-প্রচারের বহিরঙ্গ। এই Structure বা

বপুর সহিত স্বভাবতঃই পণ্যনীতি বা Commercial interest আসিয়া পড়ে ও তাহা হইতেই মতভেদ বা স্বজনভেদ উপস্থিত হয়। বপু বা বহিরঙ্গে সময় সময় বঞ্চনা থাকাও কিছু অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু 'অন্তরঙ্গ প্রচার' জিনিষটা—স্বভজন-বিতরণ বা স্বাভীষ্ট-দান। এই স্বাভীষ্ট-দানের অধিকার সমচিত্ত-বৃত্তির অনুসরণ ব্যতীত অন্য উপায়ে লাভ হয় না এবং দাতাও অনেক বাজাইয়া দেখিয়া তাহা দান করিয়া থাকেন।

অনেক সময় অনেক ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রভৃতি দেখিতে আসেন, কেহ কেহ আচার্য্য-দর্শনেও আসিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা ভোক্তৃ-অভিমানে Structure বা কাঠামোকেই মঠ মনে করিয়া উহাতে কয়খানা ঘর আছে, কয়খানা পাথর লাগিয়াছে, কয়টা পায়খানা আছে, ঠাকুরের বেশভূষা কিরূপ, ঠাকুরের মূর্ত্তি কতটা অধিক বা কম চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান করে, এই সকলই মুখ্যভাবে অনুসন্ধান করেন এবং ঐরূপ বপুকেই 'মঠ' বা কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ও ধরাবাঁধা নিয়ম-কানুনকে 'মিশন' মনে করিয়া থাকেন। কেহ কেহ পক্ক কেশ, সুন্দর ও সৌম্যমূর্ত্তি প্রভৃতি দেখিয়াই আচার্য্য(?) দর্শন করিয়া যান বা তাঁহাদের ধারণানুযায়ী ছাইভস্ম-মাখা তথাকথিত সাধুর মূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া সাধুর সম্বন্ধে ডিগ্রি ডিস্‌মিস্ করিয়া থাকেন! বহিরঙ্গতায় এইরূপ যোগ্যতা স্বাভাবিক। বহিরঙ্গ-চিন্তাস্রোতে বপুর প্রতি আকর্ষণ, চেতন-বাণীর প্রতি অকৃত্রিম বা স্বাভাবিক আকৃষ্টি নাই। সে-দিন কোন মহামহোপাধ্যায় বিখ্যাত পণ্ডিত এক সংবাদপত্রে আচার্য্যের অন্তরঙ্গ বলিতে যেরূপ জড়তার

কল্পনা করিয়াছেন, সেরূপ ভ্রান্তিও বপু বা Structureএর ভোগ-পর দর্শন হইতেই হইয়া থাকে।

আচার্য্য বা মহাপুরুষের চতুর্দ্দিক্ যাঁহারা বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিবার অভিনয় করেন কিম্বা যাঁহারা মহাপুরুষের পদ-পরিচর্য্যা (?) করিয়া থাকেন বা নানাপ্রকার বপুগত সেবা করেন কিংবা হুকুম তামিল করেন, তাঁহারাই যে সকল সময় পার্ষদ বা অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিয়া গৃহীত হইবেন, তাহা নহে। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ প্রমুখ মহাপুরুষগণের পার্শ্বচর অনেক ব্যক্তি অনেক প্রকার অভিলাষ লইয়া তাঁহাদের সম্মুখীন হইতেন এবং তাঁহাদের অনেকপ্রকার সেবার অভিনয়ও করিতেন ; কিন্তু তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি ঐসকল মহাপুরুষের চিত্তবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল, ইহা তাঁহাদের নানাপ্রকার প্রচ্ছন্ন দুর্নৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও পাষণ্ডতাপূর্ণ চরিত্র হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ বৈষ্ণব-মহাজনগণের চরিত্রের আলোচনা হইতে জানা যায় যে, কত কত ব্যক্তি তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট নিত্যভোজন করিবার অভিনয় করিয়াও পাষণ্ড ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছে! বাঘ্‌নাপাড়ার কোন প্রভু-নামধারী ব্যক্তি বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ ও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবার প্রবল পিপাসার অভিনয় দেখাইয়াও তাঁহাদের চরণে ও তাঁহাদের পূর্ব্বগুরু-পাদপদ্ম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণে ভীষণ অপরাধী

পাষণ্ডী হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ কেহ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দুগ্ধ-পানের অনুকরণ, কেহ কেহ শ্রীল গৌরকিশোরের মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্ত্র-সংগ্রহে অনুকরণ করিয়া অন্তরঙ্গ ও শ্রেষ্ঠ ভক্ত হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে করিতে পাষণ্ডী ও অধঃপতিত হইয়া গিয়াছে।

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নানাপ্রকার পার্থিব সুবিধাবাদ ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা দোহন করিবার জন্যও অনেকে সাধু ও মহাপুরুষের পার্শ্বচর হইবার অভিনয় প্রদর্শন করেন। মহাপ্রভুর চরিত্রেও দেখা যায়—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণদাস বিপ্র মহাপ্রভুর সঙ্গে তীর্থযাত্রী ও কমণ্ডলু-বাহী হইয়াও—পাকাদি কার্য্যের দ্বারা মহাপ্রভুর নিত্য সেবার অভিনয় করিয়াও এবং নানাবিধ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়াও বিপ্রলম্ভবিগ্রহ মহাপ্রভুর চিত্তবৃত্তি হইতে পৃথক্ হইয়া সম্ভোগময় চিত্তবৃত্তি-প্রকাশের অভিনয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ কৃষ্ণের সেবা ছাড়িয়া গণগড্ডলিকার অনুমোদিত কৃষ্ণ দেখিবার স্পৃহা বা ভট্টথারি স্ত্রীর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইবার অভিনয় সম্ভোগময়ী চিত্তবৃত্তি—মহাপ্রভুর চিত্তবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কোথায় "কাঁহা যাঁও কাঁহা পাঙ মুরলীবদন"—এইরূপ বিপ্রলম্ভময়ী চিত্তবৃত্তি, আর কোথায় 'এটা দেখিব সেটা দেখিব' বা যোষিতের ভোক্তা হইব—এরূপ চিত্ত-বৃত্তি! কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের চিত্তবৃত্তি থাকিলে ভগবান্ বা ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবার বা তাঁহাদের নানাপ্রকার সেবায় লোকচমৎকারিণী প্রচেষ্টার অভিনয় দেখাইলেও তাহা অন্তরঙ্গ-সেবা বা সেইরূপ সেবক বা পার্শ্বচর 'অন্তরঙ্গ সেবক' বা পার্ষদ বলিয়া গণিত হইতে পারেন না॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন-রূপ-রঘুনাথ প্রভৃতিকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে 'ছেঁড়া কাঁথা' গায়ে দেওয়াইয়া, এক এক বৃক্ষের তলায় এক এক দিন শয়ন করাইয়া, গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রীদ্বয়কে শুষ্ক রুটি, চানা খাওয়াইয়া, রাজৈশ্বর্য্যে প্রতিপালিত রঘুনাথকে তৈলঙ্গী গাভীগণেরও পরিত্যক্ত পর্য্যুসিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ বা দিবসান্তে ঘোলমাত্র পান করাইয়া তাঁহাদের প্রতি অকৈতব প্রীতির যে পরিচয় দিয়াছেন এবং নিজজন বা অন্তরঙ্গ সেবক বলিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেরূপ পরিচয় কি বলভদ্র ভট্টাচার্য্য বা কৃষ্ণদাস বিপ্রের আদর্শে দেখা গিয়াছে ? কাজেই 'পার্ষদ' বা 'অন্তরঙ্গ' বলিতে সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ ব্যক্তিকেই বুঝাইবে। গুরুপাদপদ্ম যাঁহাদিগকে অধিক লুচী বা রসগোল্লা খাওয়াইয়া আদর করেন, নিজের রক্ত দান করেন, যাঁহাদের দেনা (?) পরিশোধ করেন, যাঁহাদের সংসার বৃদ্ধি করিয়া দেন, যাঁহাদিগকে অধিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা যোগাইয়া দেন, তাঁহারাই 'গুরুদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ', —ইহা আত্মমঙ্গলবিমুখ বঞ্চিত ব্যক্তিগণের বিচার। সেদিন কোন এক ব্যক্তি বলিতেছিলেন যে—যাঁহারা মহাপুরুষগণের অধিক পদ-সম্বাহন করিয়া থাকেন, কিম্বা মহাপুরুষগণের সহিত সম আসনে, সম শয্যায় বা একান্তে বাস করিতে পারেন, তাঁহারাই 'অন্তরঙ্গ পার্ষদ' ! ইহা শুনিয়া কোন এক বৈষ্ণব বন্ধু বলিলেন যে, তাহা হইলে **মশা, ছারপোকা বা মৎকুণ প্রভৃতি মহাপুরুষের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ পার্ষদ-মধ্যে পরিগণিত হয় !!** কারণ উহারা সাধু বা মহাপুরুষের

শয্যায়, এমন কি মস্তকে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদাই সাধুর সঙ্গ করিয়া থাকে এবং সাধুর শুদ্ধসাত্ত্বিক রক্ত শোষণ (?) করিয়া স্ব-স্ব শরীর পোষণ করে। সাধুর, মহাপুরুষের বা আচার্য্যের সঙ্গ, সেবা বা তাঁহার সহিত নিয়তবাসের অভিনয় করিয়া যদি আমরা সাধু বা মহাপুরুষের দ্বারা বহুরূপী লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হই, তাহা হইলে আমাদের সাধু-গুরু-সেবার অভিনয়ও মশক ও ছারপোকাকর্ত্তৃক সাধুর অঙ্গ-সেবার ন্যায় রক্ত-শোষণমাত্র। অতএব **সাধু-গুরুর পরিচর্য্যার নামে তাঁহাদের শুদ্ধসাত্ত্বিক রক্ত-শোষণের চেষ্টা এবং তাঁহাদের বঞ্চনাকেই স্নেহ মনে করার ন্যায় সর্বাপেক্ষা ভীষণতম দুর্ভাগ্য যেন আমাদিগকে সুবুদ্ধি ভ্রষ্ট না করে**—এ বিষয়ে সর্ব্বদা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিকট নিষ্কপটে প্রার্থনা জানাইয়া সতর্ক থাকিতে হইবে।

আমাদের আর একজন বৈষ্ণব-বন্ধু রহস্যচ্ছলে এক পত্রে লিখিয়াছেন—"পৃথিবীতে আমার একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, মানুষ নিজের শরীর পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে স্বীকৃত হয়, কিন্তু পয়সা দিতে স্বীকৃত হয় না। অতএব অর্থ-ত্যাগই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ত্যাগ। অর্থ-ত্যাগই প্রীতির মাপকাঠি। সুতরাং এই যুক্তির অনুসরণে যে শিষ্যকে গুরুদেব যত অধিক দ্রবিণ প্রদান করেন, সেই শিষ্য গুরুদেবের ততটা প্রেষ্ঠ বা অন্তরঙ্গ!" বৈষ্ণব-বন্ধুর এই রহস্যের প্রহেলিকা আত্মমঙ্গলের পরিভাষায় সরল করিয়া লিখিলে বলিতে হয়—যিনি যতটা গুরুদেবকে অধিক সেবক করিতে পারেন ও বঞ্চিত হইতে পারেন, তিনি ততটা গুরুদেবের অধিক প্রিয় বা অন্তরঙ্গ!

অন্তরঙ্গ অভিমানী বহিরঙ্গের চিত্তবৃত্তিতে নিজের অংশ কিছু কম হইলেই সেবার প্রতি বৈরাগ্য উপস্থিত হয় বা 'অনেক সেবা করিয়াছি, এখন পেন্সন ভোগ করা যাউক'—এইরূপ স্পৃহা উদয় হয় ; কিন্তু অন্তরঙ্গ সেবকের বিচার মহাপ্রভুর ভাষায় ও মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীরূপের ভাষায় এইরূপ দেখিতে পাই—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥
বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াম্বা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটি নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥

—ঃ০ঃ—

পর-সংশোধন ও আত্ম-সংশোধন

আমি আত্ম-সংশোধন অপেক্ষা পর-সংশোধন করিতে খুব আনন্দ পাই। বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কিন্তু তাহা নহে। যিনি যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহার চরিত্র শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় এই,—

"সবে কৃষ্ণ-ভজন করে, এই মাত্র জানে।
বৈষ্ণবের নিন্দ্য-কর্ম্ম না শুনয়ে কাণে॥"

বৈষ্ণবের কোন নিন্দ্য-কর্ম্ম নাই, তথাপি যাঁহারা আত্ম-মঙ্গল চাহেন না, আত্ম-সংশোধন চাহেন না, তাঁহারা বৈষ্ণবকে সংশোধন করিবার জন্য তাঁহার নিন্দ্য-কর্ম্মই সর্ব্বদা দর্শন ও আলোচনা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব অদোষদর্শী, আর অবৈষ্ণব দোষদর্শী—মণিময় মন্দিরে পিপীলিকার ন্যায় ছিদ্রদর্শী, তাহাদের বৃত্তি মক্ষিকাবৃত্তি। আধ্যক্ষিক ও নির্ব্বিশেষবাদিগণ জগতের নিকট খুব ভাল মানুষ সাজিয়া এই মক্ষিকাবৃত্তির অনুশীলন করিয়া থাকেন। তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

মায়াবাদি-জন কৃষ্ণেতর মন,
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।
যে ফল্গু বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী,
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব॥

নির্ব্বিশেষবাদী নিজকে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী মনে করিয়া বৈষ্ণবকে লম্পট কৃষ্ণের উপাসক, সুতরাং অসৎ বলিয়া মনে করে। আর বৈষ্ণব নিজকে অত্যন্ত পতিত পামর জানিয়া সকলের মধ্যেই কৃষ্ণের অধিষ্ঠান-দর্শনে সম্মান করেন। নির্ব্বিশেষবাদী বৈষ্ণবের ছিদ্র ও গুরুর ছিদ্র অনুসন্ধান করেন ও গুরুকে 'দোরস্ত' বা সংশোধন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। শ্রীগৌরলীলায় রামচন্দ্রপুরীর দ্বারা সেই আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। "ব্যাস ভ্রান্ত বলি' তার উঠাইল বিবাদ।" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২১) ইহাই নির্ব্বিশেষ-বাদীর বিচারধারা যে, গুরুদেব ভ্রান্ত, ব্যাস ভ্রমপ্রমাদগ্রস্ত। পাছে ব্যাসের ভ্রান্তি হয়, গুরুদেবের পতন হয়, মহাপ্রভু সন্ন্যাস হইতে ভ্রষ্ট হন,

এজন্য প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের বা বৈষ্ণবতা-লাভের পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের আদর্শ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয়। যাহারা এইরূপ শ্রেণীর আধ্যক্ষিক হইয়া নির্ব্বিশেষ-বাদের পথে চলিয়াছে, তাহারাই নিরপেক্ষতার নামে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস হইতে পতনাশঙ্কা, জিহ্বালাম্পট্য, ব্যাসের ভ্রান্তি, জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা ও শিবের পতনাশঙ্কা প্রভৃতির কথা শ্রবণ করিবার অবসর প্রদান করে ও তজ্জন্য কৌতূহল-পরায়ণ হয়।

"শ্রীচৈতন্যচরিতের উপকরণ" নামক একটি নব-প্রকাশিত পুস্তকে এই জাতীয় চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে এবং লেখক, যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন প্রকার ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা আছে, ইহা শুনিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদিগকে 'গোঁড়া' ভক্ত বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ শুদ্ধ-গোঁড়ামিই শুদ্ধ-বৈষ্ণবতা। "কি জানি হইতেও পারে গুরুদেবের পতন, থাকিতেও পারে তাঁহার দোষ, নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক না কেন।" —যখনই কাহারও এইরূপ কৌতুহল উপস্থিত হইয়াছে, তৎ-পূর্ব্বেই সেই ব্যক্তি আধ্যক্ষিকতারূপ পাষণ্ডতা ও নির্ব্বিশেষ-বাদের নফর হইয়া পতিত হইয়াছে। "গুরু লঘুও হইতে পারেন, গৌরাঙ্গ জীবও হইতে পারেন, শ্রীধাম গ্রামও হইতে পারেন, শ্রীনাম শব্দও হইতে পারেন, মহাপ্রসাদ ডা'লভাতও হইতে পারেন, শ্রীবিগ্রহ কাঠ-পাথরও হইতে পারেন, ব্যাসদেব ভ্রান্তও হইতে পারেন, উহা-দিগকে একটুক যাচাইয়া দেখাই যাউক না কেন!"—যখনই গুরুবস্তু-সমূহকে এইরূপ আধ্যক্ষিক পরীক্ষার আসামী করিবার চেষ্টা হইয়াছে,

তখনই শিষ্যের শিষ্যত্ব বা জীবের জীবত্বের ধ্বংস হইয়াছে—জীব আত্মঘাতী নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িয়াছে।

নির্ব্বিশেষবাদীদিগের আর একটি চিন্তাধারা এই যে, যদি খুব বড় বড় লোক বা কোন মহাপুরুষের একনিষ্ঠ (?) পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ পরবর্ত্তিকালে কোন মহাপুরুষের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন, তবে জানিতে হইবে সেখানে গুরুই দোষী, সেবকব্রুব দোষী নহেন ; নতুবা শ্রদ্ধা বিনষ্ট হয় কেন ? শিবপূজক কোন জগদ্বিখ্যাত আধ্যক্ষিকের যখন পরে জগদ্‌গুরু শিবের প্রতি অশ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল, তখন জগদ্‌গুরু শিবই দোষী, আধ্যক্ষিক দোষী নহেন ; কালাপাহাড় পূর্ব্বে সনাতনধর্ম্মের একনিষ্ঠ গোঁড়া ভক্ত ছিল। পরবর্ত্তি কালে সনাতন-ধর্ম্মের ধ্বংসসাধনকেই জীবনের একমাত্র ব্রত করে। সুতরাং জানিতে হইবে, সনাতন-ধর্ম্মটাই খারাপ, কালাপাহাড়ই ভাল, নতুবা তাহার অশ্রদ্ধার উদয় হয় কেন ? রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য হইয়াও যখন গুরুদেবকে অভাবগ্রস্ত বিচার করেন বা নির্ব্বিশেষবাদীর অভিনয়কারী বাউলিয়া কমলাকান্ত বিশ্বাস শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর একনিষ্ঠ সেবক হইয়াও যখন তাঁহাকে অভাবগ্রস্ত মনে করিবার অভিনয় করেন, তখন বাউলিয়ার বিচারই ঠিক, অর্থাৎ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুই অভাবগ্রস্ত ! যশোহর জিলার কোন লৌকিক গোস্বামী অপ্রাকৃত জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। যখন পরবর্ত্তিকালে তাঁহার ঠাকুরের আচরণের প্রতি শ্রদ্ধার লাঘব হইয়াছিল, তখন ঐ লৌকিক গোস্বামীর বিচারই ঠিক, ঠাকুরই বেঠিক ! জগদ্‌গুরু পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের

শিষ্যব্রুব, অথচ পূর্ব্বে একনিষ্ঠ সেবকের অভিনয়কারী কোন কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদের অশেষ প্রশংসা করিয়া পরে শ্রদ্ধাহীন হইয়া বিধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বা পূর্ব্ব শিষ্যত্বের অভিনয় করিয়া পরে শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুর নিকট উপনীত হইবার অভিনয় করিয়াছেন বা প্রাকৃত সহজিয়া নির্ব্বিশেষবাদীর কবলে কবলিত হইয়াছিলেন বলিয়া কি আমার গুরুপাদপদ্মকে হীন মনে করিয়া লঘু সম্প্রদায়কে উচ্চাসন প্রদান করিব? শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধামের সম্বন্ধে শ্রীধামবিরোধিগণের প্রমাণাবলীকে আদৌ পাত্তাই দেন নাই। ঐসকল কথা কেহ তাঁহার নিকট তুলিতেই পারিতেন না, তুলিলে তিনি যেন সিংহের ন্যায় হুঙ্কার করিয়া উঠিতেন এবং বলিতেন,—"এইগুলির উপর প্রস্রাব করিয়া ভাসাইয়া দাও।" প্রতীপ প্রিয়নাথের প্রত্যুত্তর তাহাই প্রমাণ করে। প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিচারে শ্রীল প্রভুপাদের ঐরূপ গুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠা সত্যকে ধামাচাপা দেওয়া বা উহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই, ইহাই প্রমাণ করিলেও উহাই শুদ্ধ-বৈষ্ণবতা।

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পাদপদ্মের সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা যিনি স্বীকার করেন একমাত্র তাঁহাকেই আমরা 'ভক্ত' বলিব। ইনি বড় ভক্ত, কিন্তু ভগবানের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা মানেন না, বা এত বড় ভক্ত যখন শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছেন, তখন ভগবান্‌ই খারাপ, ইহা আধ্যক্ষিক্ নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার হইতে পারে, শুদ্ধভক্তের বিচার নহে। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন,—"যে-সকল লোক আমার নিকট আসিবার অভিনয় করিয়াছে, তাহারা যদি সকলেই

আমাকে পরিত্যাগ করে, আমার প্রতি বিদ্রোহী হয়, তথাপি আমি শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছাড়িব না। হোন্‌ড়া চোন্‌ড়া লোক বা সহস্র সহস্র কপট ভক্তব্রুব আমাকে রক্ষা করিবেন না। বাস্তব সত্যই আমাকে রক্ষা করিবেন, কৃষ্ণই আমাকে রক্ষা করিবেন।" ইহাই শুদ্ধভক্তির কথা।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যাহারা শিষ্যব্রুব তাহারা শ্রীল প্রভুপাদের নিয়ামকত্ব বর্জ্জন করিয়া পরবর্ত্তিকালে কেহ বা কপট নির্জ্জনভজনানন্দী, কেহ বা গৃহব্রত, কেহ বা শিষ্য সম্প্রদায়ের নায়ক হইয়া নানাভাবে গ্রাম্য সংবাদপত্রে তথা পারমার্থিক (?) সংবাদপত্রে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বা শ্রীধামলব্ধ শ্রীল কৃষ্ণদাসবাবাজী মহাশয় তাহা করেন নাই। কেন না, তাঁহারা অন্যাভিলাষী বা আধ্যক্ষিক কোনটীই নহেন।

আমরা সত্য সত্যই হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম চাই কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণ আমাদিগের নিকট নানাপ্রকার বিভীষিকা উপস্থিত করেন। বাস্তব-সত্য এতটা ক্ষুদ্র নহে যে, ধাপ্পাবাজী, ষড়যন্ত্র, গণমত, উচ্চ-চীৎকার, কুবিষয়ী, নির্ব্বিশেষবাদী, গুরুদ্রোহি-সম্প্রদায়ের সহিত সহযোগ বা প্রাকৃত কোন বস্তুর দ্বারা তাহার গলা টিপিয়া মারা যায়। "যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।" যিনি আমার শ্রবণগুরু, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু এই অদ্বয়-তত্ত্বকে স্বীকার করেন, তিনি বৈষ্ণব ; যিনি স্বীকার করেন না, তিনি ব্রহ্মা-রুদ্রের তুল্য হইলেও তাঁহাকে বৈষ্ণব জানিব না। এজন্যই শ্রীল

ঠাকুর বৃন্দাবন গাহিয়াছেন,—

"ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধি নাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৪২)

শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিহ নাশ পায়, কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২২।৫৫)

শ্রীল রামানুজের দুইটী মূল্যবান্ উপদেশ এই :—

"Don't converse with slanderers and scandal-mongers".

"Look not upon thos wretches that insult and scandalise the Lord's servants, nor upon those tigers in human shape that have insulted their Guru."—[Golden words of Ramanuj by Srinivas Aiyenger]

[অর্থাৎ নিন্দক এবং অপবাদ-রটনাকারী ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিবে না।

যাহারা ভগবানের ভৃত্যগণকে অপমানিত ও তাঁহাদের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে, সেই সকল নীচাশয় ব্যক্তিগণের মুখদর্শন করিও না। যাহারা তাঁহাদের গুরুদেবকে অপমানিত করিয়াছে—এইরূপ মনুষ্যাকৃতি ব্যাঘ্রগুলির দিকে কখনও তাকাইবে না।]

যাহারা শোচ্যতম যোষিৎসঙ্গী, তাহারা সুনির্ম্মল বৈষ্ণবগণের

চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়া নরকের পথের যাত্রী হয়। নির্ব্বিশেষ-বাদী নিজকে ত্যাগী ও নৈতিক মনে করে; কিন্তু তাহাদের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ও দুরারোগ্য যোষিৎসঙ্গী জাগতিক কোন দুর্নৈতিক ব্যক্তিও হইতে পারে না।

আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণের নিকট নির্ব্বিশেষবাদী সুনীতি-পরায়ণ বলিয়া প্রচারিত হয়। তাহারা মুখে "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ," "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" প্রভৃতি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকে। চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের নেতৃবর্গ কামিনীকাঞ্চনের কথা শুনিলেই থুৎকার করেন। তাহাদের বিচারে নির্জ্জন মাঠের মধ্যে একাকী ষোড়শী সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া যদি কেহ অবিকৃত চিত্তে চলিয়া যাইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি যথার্থ সিদ্ধপুরুষ। ইহাই তাহাদের সিদ্ধির স্বরূপলক্ষণ, অন্যান্যগুলি তটস্থলক্ষণ! তাহাদের উপদেশে দেখিতে পাওয়া যায়—যাহারা কখনও বৈধ যোষিৎসঙ্গও করে নাই, তাহারাই পারমার্থিক 'নৈকষ্যকুলীন'! নির্ব্বিশেষবাদী তথাকথিত সুনীতি-যোষার সহিত প্রতিক্ষণে যে অবৈধ যোষিৎসঙ্গ করিয়া থাকে, তাহাতে সে নির্ম্মলতম বৈষ্ণবগণের চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিবার চেষ্টা করে। কোটি কোটি মহাবীর, কোটি কোটি সিদ্ধার্থ, কোটি কোটি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের ফল্গুত্যাগ ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের মহিমার লেশ স্পর্শ করিতে পারে না। ভক্তি এত বড় জিনিষ! নির্ব্বিশেষবাদী যোষিৎসঙ্গের নিন্দা করিয়া সর্ব্বক্ষণই অবৈধ যোষিৎসঙ্গের ধ্যান করিয়া থাকে। নির্ব্বিশেষবাদী একদিকে যেমন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, আর একদিকে তেমনই ভীষণতম প্রচ্ছন্ন যোষিৎসঙ্গী। "বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ

বৌদ্ধকে অধিক"—কবিরাজ গোস্বামীর এই বাক্যানুসারে মুখে বেদ মানিয়া ও বৌদ্ধগণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিন্দা করিয়া যাহারা নির্ব্বিশেষবাদ স্বীকার করেন, তাহারা যেমন পাষণ্ড বৌদ্ধ হইতেও অধিকতর নাস্তিক, তদ্রূপ মুখে তথাকথিত 'সুনীতি', 'সুনীতি' বলিয়া চীৎকার করিয়া যাহারা যোষিৎসঙ্গের নিন্দা করে, তাহারা অবৈধ যোষিৎসঙ্গের ধ্যান, ধারণা ও সমাধি লাভ করে এবং ঐরূপ সাধনের সিদ্ধিতে অবৈধ যোষিৎসঙ্গীর সহিত সাযুজ্য লাভ করে। ভগবদ্ভক্তগণ ঐরূপ প্রচ্ছন্ন যোষিৎসঙ্গের ধ্যান, সমাধি ও সাযুজ্য-লাভকে নরক অপেক্ষা ঘৃণা ও ভয় করেন। এই সকল নির্ব্বিশেষবাদিগণের যোষিৎসঙ্গস্পৃহা আরও প্রবলতরা ও জঘন্যতমা। ইহারাই শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায়,—

"যে ফল্গু বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী,
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
মায়াবাদী জন, কৃষ্ণেতর মন,
মুক্ত-অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।"

নির্ব্বিশেষবাদী রামচন্দ্রপুরী আত্ম-সংশোধন অপেক্ষা গুরু-গৌরাঙ্গের সংশোধনের পক্ষপাতী। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বৈষ্ণবনিন্দা করিতে করিতে এইরূপ অসুর হইয়া পড়ে যে, তখন আর তাহাদের দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। কিন্তু বৈষ্ণবের বিচার তাহা নহে। বৈষ্ণব কেবল নিজের জন্য মনঃশিক্ষা রচনা করেন। শ্রীরূপ-রঘুনাথ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ এই আদর্শই দেখাইয়াছেন। তাঁহার শিষ্যকে শাসন করিয়াছেন, বৈষ্ণবকে শাসন করেন নাই।

মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে লোকশিক্ষার্থ শাসন করিয়াছেন, শ্রীপরমানন্দ পুরী বা শ্রীস্বরূপদামোদর তাহা করেন নাই। নির্ব্বিশেষবাদী-গণ বৈষ্ণবের গুরু হইতে চাহে, আর বৈষ্ণব বৈষ্ণবের শিষ্য হইতে চাহেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন,—"ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু আমার নিত্য-সিদ্ধ গুরুদেব। তাঁহার পাদপদ্মই আমার একমাত্র জীবাতু।" আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী বলেন,—"বিল্বমঙ্গলই আমার একমাত্র গুরুপাদ-পদ্ম।" যে পাষণ্ড গুরুপাদপদ্মের সর্ব্বদা পবিত্র নির্ম্মল চরিত্রকে হিংসাবশতঃ নিন্দা করে, ঐসকল্ নরকযাত্রী পাষণ্ডের কুসিদ্ধান্ত কখনও শুনিতে হইবে না। উহাদের পাষণ্ডতায় বধির থাকিয়া শ্রীগুরুপাদ-পদ্মে আরও অচলা নিষ্ঠাযুক্ত হইতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন, "ভগবদ্ভক্ত এত বড় যে, বৈষ্ণবনিন্দকের শত শত প্রমাণাবলীর উপর প্রস্রাব করিয়া কোটি কোটি মহাসাগর সৃষ্টি করিতে পারেন। ঐসবগুলিকে সমুদ্রের অতলগর্ভে ভাসাইয়া দিয়া বৈষ্ণবপাদপদ্ম-ভেলায় ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে।" কাজেই পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রদর্শিত পথই আমাদের একমাত্র উপাস্য। পরচর্চ্চকের কোন দিন মঙ্গল হয় না, বৈষ্ণবনিন্দকের কথা দূরে থাকুক। আমি যেন কোটি কোটি জন্ম নিষ্কপট জগাই-মাধাইর দাসত্ব করিতে পারি, তথাপি আধ্যক্ষিক তথাকথিত সুনীতিবাদী, প্রচ্ছন্ন জঘন্যতম যোষিৎসঙ্গী নির্ব্বিশেষবাদিগণের মস্তকের ভূষণ না হই। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর অর্থাৎ শ্রীচরণ-রেণু-লাভের জন্য আমার কোটি কোটি জন্ম হউক, তথাপি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, প্রচ্ছন্ন যোষিৎসঙ্গী নির্ব্বিশেষবাদিগণের কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগের প্রতিষ্ঠা-শৌকরীবিষ্ঠা ভোজনে যেন আমার চিত্ত প্রলুব্ধ না হয়।

নির্ব্বিশেষবাদিগণের ধারণা—বৈষ্ণবগণ প্রাকৃত ব্যভিচারকে ব্রজপ্রেম বলেন, বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়চালনাকে "অপিচেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকের দ্বারা সমর্থন করিতে চাহে ! প্রচ্ছন্ন কামুক নির্ব্বিশেষবাদিগণ অপ্রাকৃত কামদেবের কামের উপকরণ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সিদ্ধান্ত ও সুবিচার ধারণাই করিতে পারে না। করিবেই বা কিরূপে? অপরাধে যে তাহাদের মস্তিষ্ক জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে। তাহারা আধ্যক্ষিকতা পিশাচীসঙ্গরঙ্গ ব্যতীত অধিক আর কি বুঝিবে? বদ্ধজীবের কাম—প্রেম নহে। পতনোন্মুখ বা পতিত জীবের ইন্দ্রিয়-চালনাও হরিভক্তি নহে। তবে আধ্যক্ষিকের চক্ষু ও বুদ্ধিমত্তা, বিচার-সিদ্ধান্তও সত্য নহে। তাহা আরও জঘন্য। ঐগুলি সব মনোধর্ম্ম—'এই ভাল, এই মন্দ।' উহা মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জনীয়। "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" এই কথাই সত্য।

আমি পাপী, অতিপাপী, মহাপাপী ; গুরুদেব পাপী নহেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম পাপ-পুণ্যের অতীত। তিনি পতিতপাবন। আমি আমাকে সংশোধন করিব, বৈষ্ণবকে সংশোধন করিবার জন্য দুর্ব্বুদ্ধি ও আস্পর্দ্ধা উপস্থিত না হয়। জগতে যে সকল লোক সংস্কারক বা সত্যস্থাপনকারী বলিয়া আপনাদিগকে প্রচার করিয়া গুরুবৈষ্ণবকে সংশোধন করিতে গিয়াছে, তাহারাই চিরকাল প্রচ্ছন্ন অবৈধ যোষিৎসঙ্গীর বিষ্ঠার কৃমিত্ব লাভ করিয়াছে। তাহাদের এই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। কারণ, ভক্তদ্রোহীকে কৃষ্ণ রক্ষা করেন না, কৃতঘ্নের কোথায়ও স্থান নাই।

—:০:—

প্রাকৃত-সাহজিক ও শুদ্ধবৈষ্ণব সিদ্ধান্ত

প্রাকৃত-সাহজিকতাকে বিদ্ধবৈষ্ণবতা ও অপ্রাকৃত-সাহজিকতাকে শুদ্ধবৈষ্ণবতা বলা যায়। 'বিদ্ধ' শব্দের সহিত বৈষ্ণবতা-শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত কি না, তাহাও একটি বিবেচ্য বিষয়। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সাহজিকের মধ্যে যে সুসূক্ষ্ম ভেদ আছে, তাহা একমাত্র কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ ব্যতীত অপর কেহই ধরিতে পারেন না। যেরূপ শ্রীবিষ্ণুস্বামী বা শ্রীধরস্বামিপাদের শুদ্ধাদ্বৈতবাদকে নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায় 'কেবলাদ্বৈতবাদ' বলিয়া ভ্রম করে, তদ্রূপ আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদিগণ শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তকে 'প্রাকৃত সাহজিক মত' বলিয়া অজ্ঞতা, অপরাধ বা অভিসন্ধিমূলে প্রচার করেন। আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই মহাপ্রভুর ধর্ম্মকে সহজিয়া-ধর্ম্ম বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ইহাদের ধারণা এই যে, মহাপ্রভু বৌদ্ধ-সহজিয়া-মতকেই পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক বিচারের ভাবনা দিয়া আচার ও প্রচার করিয়াছেন।

আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণ মনে করেন, শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ডা'লভাতকেই 'মহাপ্রসাদ', কর্ম্মফলবাধ্য জন্ম-মৃত্যুকেই 'আবির্ভাব-তিরোভাব-লীলা' প্রভৃতি বাগ্‌বৈখরীর দ্বারা প্রচার করিয়া লোকবঞ্চনা করেন।

গুরুবৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই, গুরুবৈষ্ণবের ভ্রম-প্রমাদ নাই। গুরুবৈষ্ণবের চরিত্রে পাপ বা কলঙ্ক নাই। যাহারা পাপ দর্শন করে, তাহারাই পাপী ; যাহারা ভ্রম দর্শন করে, তাহারাই ভ্রম-প্রমাদগ্রস্ত ;

যাহারা বৈষ্ণবের জন্মমৃত্যু দর্শন করে, তাহারাই জন্মমৃত্যুর অধীন—এইরূপ শুদ্ধ বিচারকে আধ্যক্ষিক ও নির্ব্বিবশেষবাদিগণ সত্যকে ধামাচাপা দিবার কৌশল এবং মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া স্থাপন করিবার গোঁড়ামি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

প্রাকৃত-সহজিয়া ও শুদ্ধবৈষ্ণবের সিদ্ধান্তে ভেদ এই যে, প্রাকৃত-সহজিয়া প্রাকৃত ব্যভিচারকেই ভগবদ্ভক্তি বলিয়া স্থাপন পূর্ব্বক উহার প্রশ্রয় দান করে; আর শুদ্ধবৈষ্ণবের সিদ্ধান্ত এই যে, গুরু-বৈষ্ণবের কোন দোষই নাই, দর্শনকারীরই দোষ। পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত পাঠ করিয়া আধ্যক্ষিক নির্ব্বিবশেষবাদিগণ বিচার করিয়া থাকেন,—এই দুই আচার্য্য প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম্মের সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইঁহারা ভক্তিদেবীকেই সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন, সুনীতি বা দুর্নীতিকে উচ্চাসন প্রদান করেন নাই।

"সুদুরাচারঃ পরহিংসা - পরদার - পরদ্রব্যাদিগ্রহণপরায়ণোঽপি মাং ভজতে চেৎ কীদৃগ্‌ভজনবানিত্যত আহ—অনন্যভাক্ মত্তোঽন্য-দেবতান্তরং মদ্ভক্তেরন্যৎ কদাচারে দৃষ্টে সতি কথং সাধুত্বম্? তত্রাহ—মন্তব্যো মননীয়ঃ; সাধুত্বেনৈব স জ্ঞেয় ইতি যাবৎ; মন্তব্যমিতি বিধিবাক্যং, অন্যথা প্রত্যবায়ঃ স্যাৎ; অত্র মদাজ্ঞৈব প্রমাণমিতি ভাবঃ। ননু ত্বাং ভজতে ইত্যেতদংশেন সাধুঃ পরদারাদিগ্রহণাংশে-নাসাধুশ্চ স মন্তব্যস্তত্রাহ—এবেতি। সর্ব্বেণাপ্যংশেন সাধুরেব মন্তব্যঃ, কদাপি তস্যাসাধুত্বং ন দ্রষ্টব্যমিতি ভাবঃ। সম্যগ্‌ব্যবসিতং নিশ্চয়ো যস্য সঃ। দুস্ত্যজেন স্বপাপেন নরকং তির্য্যগ্‌যোনিং বা

যামি ঐকান্তিকং শ্রীকৃষ্ণভজনন্তু নৈব জিহাসামীতি স শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥"

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদকৃতা টীকা—গীঃ ৯।৩০)

"ভক্তির উন্নতি-সোপানারূঢ় জীবদিগের ব্যবসায়—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তাহাতে যদিও উক্ত ঘটনা-ক্রমে দুরাচার এমন কি, সুদুরাচার (পরহিংসা, পরদ্রব্য-হরণ, পরদারধর্ষণ, যাহাতে ভক্তের সহজে রুচি হইতে পারে না, তাহা) কদাচিৎ লক্ষিত হয়, তাহাও অবিলম্বে যাইবে এবং তদ্দ্বারা প্রবলপ্রবৃত্তিরূপা মদ্ভক্তি দূষিত হয় না,—ইহাই জানিবে। কোন কোন পরমভক্তের পূর্ব্বে মৎস্যাদিভোজন এবং পূর্ব্বসংগৃহীত পরদার-সঙ্গাদি লক্ষ্য করিয়াও তাহাদিগকে 'অসাধু' মনে করিবে না।" (শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত রসিকরঞ্জনভাষ্য—গীঃ ৯।৩০)

শ্রীগীতা বা শ্রীমহাজনের এই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত কখনই প্রাকৃতসহজিয়াবাদকে সমর্থন করেন নাই। প্রাকৃত সহজিয়াবাদ দুর্নীতিকেই 'ভক্তি' বলে, আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদিগণ সুনীতিকেই 'ভক্তি' বলিয়া থাকেন ; আর শুদ্ধভক্ত প্রাকৃত-সহজিয়াগণের দুর্নীতি ও নির্ব্বিশেষবাদিগণের সুনীতি—উভয়ের প্রশংসাই পরিত্যাগ করিয়া অধোক্ষজ কৃষ্ণে শরণাগতিকেই ভক্তি বলিয়া থাকেন। আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে সুনীতি + ভক্তি = 'ভক্তি'। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ বলেন, ভক্তি—সম্পূর্ণা, নিরপেক্ষা, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রা। ভক্তির সহিত সুনীতি বা দুর্নীতি যোগ বা বিয়োগ করিয়া ভক্তির অস্তিত্ব রাখিতে হইলে উহাকে 'মায়াই' বলা হয়। **ভক্তির সহিত আর**

কিছুই যোগ বা বিয়োগ করা চলে না, অর্থাৎ ভক্তি + সুনীতি = 'ভক্তি' বলা যেরূপ অপসিদ্ধান্ত, ভক্তি—সুনীতি = 'অভক্তি' বলাও তেমনি অপসিদ্ধান্ত। এজন্য শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে ভক্তের কোন দোষই নাই।

'বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
বিনোদসেবক, না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি॥'

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের মূলমহাজন শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু এই জন্যই বলিয়াছেন,—

"দৃষ্টৈঃ স্বভাব-জনিতৈর্ব্বপুষশ্চ দোষৈ
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদবুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥"

(উপদেশামৃত ৬ষ্ঠ শ্লোক)

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—

"শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত তাঁর স্বাভাবিক দোষ।
আর তাঁর দেহ-দোষে না করিহ রোষ॥
প্রাকৃত দর্শনে দোষ যদি দৃষ্ট হয়।
দর্শনেতে অপরাধ জানিবে নিশ্চয়॥
হীন-অধিকারী হ'য়ে, মহতের দোষ।
সিদ্ধভক্তে হীন জ্ঞানে না পাবে সন্তোষ॥

ব্রহ্মদ্রব গঙ্গোদক-প্রবাহে যখন।
বুদ্‌বুদফেন-পঙ্ক জলের মিলন॥
অন্য জল গঙ্গালাভে হেয় কভু নয়।
তদ্রূপ ভক্তের মল কভু নাহি রয়॥

সাধু-দোষদ্রষ্টা যেই কৃষ্ণ-আজ্ঞা ত্যজি।
গর্ব্বে ভক্তিভ্রষ্টা হৈয়া মরে অধো মজি॥"

"ভজনবিজ্ঞ ভক্তে দুরাচার থাকিলে তদ্দ্রষ্টা তাঁহাকে দেখিয়া অপরাধী হন। তজ্জন্য প্রাকৃত দৃষ্টির পরিমাণমতে ভক্তদর্শন করিতে নিষেধ। **তাদৃশ দুরাচারে অবস্থান, অনন্যভক্তির বিনাশ-কারক নহে; পরন্তু অল্পবুদ্ধি দ্রষ্টার চক্ষে বিশেষ অপকারক।** যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্যভজন দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহাভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন। * * *

শৌক্রজাতি-মদোন্মত্ত হইয়া ও সিদ্ধভক্তের আচার বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিলে ভক্তি থাকিতে পারে না। জাতরুচি সিদ্ধমহাত্মগণের আচরণ না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে 'পতিত' মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। যেহেতু সিদ্ধমহাত্মা বৈষ্ণবগুরুগণের ব্যবহারাবলীতে কটাক্ষ এবং তাহাদিগকে হীনজ্ঞানে কখনই জীবের কোন মঙ্গল হয় না। সুতরাং প্রাকৃত দৃষ্টিতে সিদ্ধভক্তকে কেবল বদ্ধ প্রাকৃত জীবগণের শিষ্য মনে করিয়া সৎপথে আনয়নের চেষ্টাই বৈষ্ণবাপরাধ। অজাতরতি-সাধক ও সিদ্ধভক্তে ভেদ আছে জানিয়া এক ব্যক্তিকে শিষ্য ও অপর ব্যক্তিকে গুরু জানিতে হইবে।

গুরুকে উপদেশ দিতে হইবে না, শিষ্যের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে না, ইহাই বিবেচ্য।

(শ্রীল প্রভুপাদের অনুবৃত্তি)

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই প্রাকৃত-সাহজিক-সিদ্ধান্ত নহে। "যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্যভজনে দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহাভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন।" —এই উক্তি দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ প্রাকৃত দুরাচারকে 'সাধুতা' বা প্রাকৃত ব্যভিচারকে 'কৃষ্ণপ্রেম' বলিয়া স্থাপন করেন নাই।

সাধক ও সিদ্ধ দুই প্রকার ব্যক্তির সম্বন্ধেই দুরাচার-দর্শনের যে নিষেধবাক্য আছে, তদ্দারা প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ সমর্থিত হয় নাই। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে কি প্রাকৃত দুরাচারকে বৈষ্ণবতা বলিয়া স্থাপনের প্রসঙ্গ আছে?

বৈষ্ণবের তিন প্রকার কথা লইয়া দুষ্ট লোকে বিদ্বেষপূর্ব্বক আলোচনা করিতে পারে। (ক) শুদ্ধভক্তির উদয় হইবার পূর্ব্বে সেই ব্যক্তির যে সকল দোষ ছিল, তাহা দুষ্ট লোকের এক প্রকারে আলোচ্য হয়। (খ) ভক্তির উদয় হইলে দোষসমূহ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। বিনষ্ট হইতে হইতে যে-কিছু কাল অতিবাহিত হয়, সেই সময়ে তাঁহার অবশিষ্ট দোষের বিষয়ে দুষ্ট লোকে দ্বিতীয় প্রকারে আলোচনা করিয়া থাকে। (গ) দুষ্ট লোকের তৃতীয় প্রকারে আলোচ্য বিষয় এই যে, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের দোষে স্পৃহা না থাকিলেও কখনও দৈবাৎ

যদি কোন নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়। সেই দোষ বৈষ্ণবে কখনই স্থায়ী হয় না। তথাপি দুষ্ট লোকে ঐ দোষের আলোচনা করিয়া ভীষণ বৈষ্ণব-নিন্দার দোষে পতিত হয়।" (সজ্জনতোষণী)

"বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের দোষের স্পৃহা না থাকিলেও কখনও যদি দৈবাৎ নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়।" —এইরূপ উক্তি করায় শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি "নিষিদ্ধাচারকে" "বিশুদ্ধ বৈষ্ণবতা" বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন?

"বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥
অজ্ঞানে বা হয় যদি 'পাপ' উপস্থিত।
কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত॥

(চৈঃ চঃ ম ২২।১৩৭-১৩৮)

"স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ॥
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥"

(ভাঃ ১১।৫।৩৮)

যিনি অন্যভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং হরির পাদমূল ভজন করেন, সেই **কৃষ্ণপ্রিয় ব্যক্তির যদি কখনও বিকর্ম্ম (পাপ)** কোন প্রকারে **উৎপতিত হয়,** পরমেশ্বর হরি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট থাকিয়া সেই পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

যিনি বৈদিক বিধিগত ধর্ম্মসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চন

হইয়া ভজন করেন, তাঁহার স্বভাবতঃ কোন নিষিদ্ধ-পাপাচারে মতি হয় না, **যদি কোন কারণেও পাপ উপস্থিত হয়** অর্থাৎ কৃত হইয়া পড়ে, কৃষ্ণ তাঁহাকে কোন প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া শুদ্ধ করিয়া লন।"

(চৈঃ চঃ অমৃতপ্রবাহভাষ্য ম ২২।১৩৭-৩৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই সকল সিদ্ধান্ত কি প্রাকৃত-সাহজিক সিদ্ধান্ত? সাধকের পক্ষেই যখন ঐ সকল উক্তি প্রযোজ্য হইয়াছে, তখন সিদ্ধগণের কথা আর কি? সিদ্ধগণের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বলিয়াছেন,—

"বিষ্ণুতত্ত্ব যেন অবিজ্ঞাত বেদ-বাণী।
এইমত বৈষ্ণবেরো তত্ত্ব নাহি জানি॥
সিদ্ধ বৈষ্ণবের অতি বিষম ব্যবহার।
না বুঝি' নিন্দিয়া মরে সকল সংসার॥
অবোধ অগম্য অধিকারীর ব্যবহার।
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর॥
অধিকারি-বৈষ্ণবের না বুঝি' ব্যবহার।
যে জন নিন্দয়ে, তা'র নাহিক নিস্তার॥
অধমজনের যে আচার যেন ধর্ম্ম।
অধিকারিবৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম॥
কৃষ্ণ-কৃপায়ে সে ইহা জানিবারে পারে।
এসব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে॥
সবে ইথে দেখি এক মহাপ্রতিকার।
সবারে করিব স্তুতি বিনয়-ব্যবহার॥

অজ্ঞ হই' লইবেক কৃষ্ণের শরণ ॥
সাবধানে শুনিবেক মহান্তবচন ॥
তবে কৃষ্ণ তা'রে দেন হেন দিব্যমতি।
সর্ব্বত্র নিস্তার পায়, না ঠেকয়ে কতি ॥"

(চৈঃ ভাঃ অ ৯ অধ্যায়)

এই সকল উক্তির দ্বারা কি শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন প্রাকৃত পাপ, ব্যভিচার, দুর্নীতি প্রভৃতিকে অপ্রাকৃত শুদ্ধবৈষ্ণবতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন? বা বৈষ্ণবের পাপাচার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন? ঠাকুর বৃন্দাবনের সিদ্ধান্ত এই যে, বৈষ্ণবে পাপ, দুরাচার বা কোন-প্রকার দোষই নাই। যাহারা বৈষ্ণবের ঐ সকল দোষ দর্শন করে, তাহারাই পাপী, ব্যভিচারী ও দোষী।

"ইহাতে যে দোষ দেখে, তাহার সে দোষ।"

(চৈঃ ভাঃ আ ১।১০৯)

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এই মাত্র বললেন,—মহাভাগবতের বিষম ব্যবহার অবোধ ও অগম্য। ইহা ব্যতীত আর বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত কিছুই নাই।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়ে জগদ্‌গুরু ব্রহ্মার আচরণ দর্শনে বিদ্রূপফলে ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধ দেবতা-গণের অসুর-যোনিতে জন্মগ্রহণ বা শ্রীমদ্ভাগবতে চিত্রকেতুর জগদ্‌গুরু শিবকে স্ত্রীসঙ্গী-কল্পনা-জনিত অপরাধ-লীলায় বৃত্রাসুররূপে জন্মগ্রহণ বা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন নিজ গুরুপাদপদ্ম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে যে নিম্নলিখিত উক্তি করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পাপ বা দুরাচারকেই কি

ভগবদ্ভক্তিরূপে স্থাপন বা শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাপ ও দুরাচারকে পরোক্ষ-ভাবে স্বীকার করিয়াছেন ?

"মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥
গৃহ্লীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্ বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্॥"

(চৈঃ ভাঃ অ ৬।১২৩-১২৪)

শ্রীনিত্যানন্দ যবনীর পাণিই গ্রহণ করুন, অথবা শৌণ্ডিকালয়েই প্রবেশ করুন, তথাপি তাঁহার শ্রীচরণ-কমল ব্রহ্মার বন্দনীয়।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের এই সকল উক্তি গুরুপাদপদ্মের দুরাচার সমর্থনের জন্য নহে বা গুরুদেব যবনী অপহরণকারী মদ্যপায়ী হইয়াছেন এইরূপ স্বীকার উক্তিও নহে। ইহার দ্বারা আধ্যক্ষিক নিত্যানন্দবিদ্বেষি-সম্প্রদায় মনে করিতে পারে যে, জগদ্গুরু ব্রহ্মা বা শ্রীনিত্যানন্দ নিশ্চয়ই দুরাচারী ছিলেন। যেমন প্রাকৃত-সহজিয়াগণ এখনও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর "মৎস্য খাও মাংস খাও কেমত সন্ন্যাসী" প্রভৃতি উক্তি পাঠ করিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিশ্চয়ই মৎস্য-মাংস ভোজন করিতেন, নতুবা শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এরূপ উক্তি করিলেন কেন ?

যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা ও অনন্যভজনকারী নহেন, তিনি প্রথমেই গুরু হইতে পারেন না ; আর যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ অনন্যভজনকারী গুরুদেব, সেই গুরুতত্ত্বও শ্রীনিত্যানন্দ ভিন্ন আর কিছুই নহেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' লিখিয়াছেন,—

"শ্রীগুরুতত্ত্ব—নিত্যানন্দ ; সেই কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহকে যে পাষণ্ডী বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করে ; সেই পাষণ্ডীর সঙ্গিগণের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখা ভগবদ্ভক্তের কর্ত্তব্য নহে। অসৎসঙ্গ-প্রভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেবাধিকার শ্লথ হইয়া পড়ে, সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন-কলেবর শ্রীগুরুদেবের স্মৃতি যাহাতে বিপর্য্যস্ত না হয় তদ্রূপ বিচারে ইহকালে ও পরকালে অবস্থিতি হওয়া আবশ্যক। যাহারা পরমার্থকে প্রাকৃত প্রয়োজনে পরিণত করে তাহারা ভোগের দাস, ভক্ত নহে। ভক্তব্রুব ও ভক্ত—সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্ম্মবিশিষ্ট। তজ্জন্য অসৎ-সঙ্গিগণকে পরমার্থ-সম্মিলনের সদস্য জ্ঞান করা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা ; সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে জীব পরমার্থ বঞ্চিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশবিগ্রহ নিত্যানন্দকে ও তদভিন্ন-প্রকাশ শ্রীগুরুদেবকে পৃথক্ জ্ঞান করে। তাহাদের গৌরসুন্দরের সেবা লাভ কখনও হয় না। তাহারা নিত্যকাল গুরুদ্রোহী হইয়া দুর্ভোগী হইয়া পড়ে।

অধুনাতন শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিরোধী কৈতবপূর্ণ ভক্তব্রুব সম্প্রদায় যে পথে চলিতেছেন, তদ্দারা তাঁহারা অমঙ্গল আবাহন করিবেন। তজ্জন্য ভক্তগণ তাঁহাদের ভাবী-অমঙ্গল দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত।"

নির্ব্বিশেষবাদিগণের চিন্তাধারা এই যে, শুদ্ধবৈষ্ণবগণ লাম্পট্য ও ব্যভিচারের প্রশ্রয়-দাতা কিংবা শ্রীযামুনাচার্য্য ও "প্রপন্নামৃত" গ্রন্থে ভট্টনারায়ণের (শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর পূর্ব্ব নাম) তথাকথিত দুরাচারের কথা লিখিত আছে বলিয়া, শ্রীরামানুজাচার্য্য সেই শ্রীল ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুকে তাঁহাদের নিত্য সিদ্ধ গুরুপাদপদ্ম ও বৈজয়ন্তীবন-

মালার অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছেন বলিয়া অথবা শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি আচার্য্যবর্গ শ্রীবিল্বমঙ্গলকে গুরুপাদপদ্ম বা শ্রীবিল্বমঙ্গলদেব শ্রীচিন্তামণিকে শিক্ষাগুরু বলিয়া বরণ করিয়াছেন বলিয়া নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলিয়া থাকেন, "বৈষ্ণবগণ ব্যভিচারকেই 'ভক্তি' বলে, কামকে 'অপ্রাকৃত প্রেম' বলিয়া আখ্যা দেয়।" আবার কোন কোন নির্ব্বিশেষবাদী বলেন,—"যখন বৈষ্ণবগণের লেখনীর মধ্যেই তাঁহাদিগের গুরুবর্গের পাপ ও ব্যভিচারের (?) কথা স্বীকৃত হইয়াছে, তখন তাঁহাদের গুরুবর্গ যে পাপী ও দুরাচারী, ইহা তাঁহারা নিজেরাই প্রমাণ করিয়াছেন।" প্রকৃতপক্ষে আমরা গুরুবর্গে কোন পাপ বা দুরাচার কখনই স্বীকার করি না। গুরুপাদপদ্ম সর্ব্বদা পবিত্রতম। তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় উক্তি, তথাকথিত প্রমাণ ও ঘটনা সর্ব্বৈব মিথ্যা, মনঃকল্পিত ও দুরভিসন্ধিমূলক। আমরা সুদৃঢ় বিশ্বাস করি ও জানি যে, গুরুবর্গ জাগতিক কোন পাপ বা দুরাচারে কখনও প্রবেশ করেন নাই, করিতে পারে না। যাহারা গুরুপাদপদ্মে পাপাদির আরোপ করে, তাহারা হয় ভ্রান্ত, নয় অন্যাভিলাষী। তবে জগতের যে সমস্ত লোক গুরুবর্গে কোন পাপ বা দুর্নীতির কার্য্য আধ্যক্ষিক বিচারবুদ্ধিতে যখন লক্ষ্য করে, তখন তাহাদের দিক্ হইতে বিষয়টী বুঝিবার সুবিধার জন্য এই ভাবে বিষয়টী বর্ণিত হয় মাত্র এবং তৎসম্বন্ধীয় ভক্তিসিদ্ধান্ত আলোচিত হয়, জানিতে হইবে। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত এই যে, গুরুবর্গে কোন পাপ বা দুরাচার আদৌ নাই, পূর্ব্বে ছিল না, এখনও নাই, পরেও কোনও সময় থাকিতে পারে না। গুরুদেব পূর্ব্বে পতিত বা পতনোন্মুখ জীব

নহেন। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি আচার্য্যগণ পূর্ব্বে পতিত ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ জগদ্গুরু। 'পাছে ব্যাস ভ্রান্ত হন—গুরুদেব হয়ত পতিতও হইয়া যাইতে পারেন'—এইরূপ বিচারের আসামী গুরুদেব নহেন। তবে আধ্যক্ষিকগণ যে ভ্রমপ্রমাদ-গ্রস্ত দৃষ্টিতে তথাকথিত দুরাচার দর্শন করে, তাহা তাহাদের দর্শনে ভ্রান্তি এবং ঐরূপ তথাকথিত সুদুরাচারের দ্বারাও "প্রবল-প্রবৃত্তি-রূপ মদ্ভক্তি দূষিত হয় না।" (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

অতএব কোনরূপেই গুরুবর্গের পাপ বা সুদুরাচারের অস্তিত্বও কল্পিত হয় নাই—কোনভাবেই প্রাকৃত কামকে অপ্রাকৃত ব্রজপ্রেম বলা হয় নাই। যেস্থানে প্রাকৃত কামের অস্তিত্বই নাই, তথায় উহা বলা হইয়াছে।—এইরূপ অভিসন্ধিমূলক নিজের কথা অপরের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা শশশৃঙ্গবৎ নিরর্থক।

নির্ব্বিশেষবাদিগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা গুরুমারা বিদ্যায় পারদর্শী, তাঁহারা ভক্তিসিদ্ধান্ত মাপিয়া ফেলিয়াছেন—এইরূপ বিশ্বাসে বিশ্বাসী। কাজেই তাঁহারা আধ্যক্ষিকতা-বলে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত ও প্রাকৃত-সহজিয়াসিদ্ধান্তের মধ্যে সুসূক্ষ্ম পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। পৃথিবীতে শতকরা প্রায় শত জনই নির্ব্বিশেষ-বাদী আধ্যক্ষিক আছে বলিয়া আমরা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তকে বিপর্য্যস্ত করিব না। যেখানে সমস্ত শাস্ত্র ও শ্রীরূপাদি গুরুবর্গের বাণী সমস্বরে "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" গান করিয়াছেন, সেখানে নির্ব্বি-শেষবাদীর প্রজল্পে আমরা কিছুতেই কর্ণপাত করিব না।

শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় বলিতেন যে, শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-

বিনোদ ও শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, বরং বৈষ্ণবাপরাধহীন প্রাকৃত-সহজিয়া ভাল, তথাপি আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদী ভাল নহে। প্রাকৃতসহজিয়া আত্মবৃত্তি ভক্তির ধ্বংসকারী নহে, তাহাদিগকে বিপথগামী বলা যায় ; কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদী আত্মবৃত্তির ধ্বংসকারী। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ করিলে এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়।

—০—

শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি হইতে আমি কতটা দূরে !

গৌরজন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ একটি কথা প্রায় সকল সময়ই বলিতেন যে, আমাদিগকে শ্রীরূপানুগবর গুরুবর্গের চিত্তবৃত্তির সহিত dove-tailed (খাপে খাপে মিলিত) হইতে হইবে। যে শিষ্যের চিত্তবৃত্তি শ্রীগুরুদেবের চিত্তবৃত্তির সহিত যতটা খাপে খাপে মিলিয়াছে, তিনি শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের সহিত ততটা সংলগ্ন, তিনি শ্রীগুরুদেবের ততটা অন্তরঙ্গ, তিনি শ্রীগুরুদেবের ততটা প্রেষ্ঠ। এইরূপ শ্রীগুরুদেব ও শ্রীশিষ্যদেবের মধ্যে বাহ্যদৃষ্টিতে দেশ-কাল-পাত্র-গত ব্যবধান দৃষ্ট হইলেও সেই শিষ্যদেব শ্রীগুরুদেবেরই নিত্য পার্শ্বচর বা পার্শ্ববর্ত্তি-ভৃত্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান করিতেন ; তাঁহার

সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট অন্তরঙ্গ ও শ্রেষ্ঠ শ্রীরূপ, শ্রীসনাতনাদি ভৃত্যবর্গ বহুশত মাইল ব্যবধানে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানপূর্ব্বক ভজন করিতেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাহ্যদৃষ্টিতে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী প্রভুর নিকট হইতে বহু দূরে অবস্থানের লীলা প্রকাশ করিতেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুর নিকটে সর্ব্বক্ষণ বসিয়া থাকিতেন না। শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় জানা যায়—"**শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্মবিরোধী ছলধর্ম্ম-পরায়ণ অনেকগুলি প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝিয়া সর্বদা তাঁহাকে** (শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে) **বেষ্টন করিয়া থাকিত** এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর **স্নেহ-পাত্র** জ্ঞান করিয়া **কুবিষয়েই প্রমত্ত** থাকিত। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে **প্রকাশ্যভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই,** আবার তাহাদিগকে কোন-প্রকারে গ্রহণও করেন নাই।"—(শ্রীসজ্জনতোষণী ১৯শ খণ্ড, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা)

শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ প্রশংসিত "অন্তরঙ্গ" নামক 'গৌড়ীয়ের একটি প্রবন্ধ হইতেও জানা যায় যে, মশা, ছারপোকা, মৎকুন প্রভৃতি মহাপুরুষের শ্রীঅঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকটস্থ প্রদেশে থাকিবার অভিনয় করে: কিন্তু উহাদের চিত্তবৃত্তি মহাপুরুষগণের সহিত সমান হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদের রক্ত (?) শোষণ করাই উহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন হয়। অতএব গুরু, সাধু বা বৈষ্ণবের 'সঙ্গ' অর্থে—তাঁহাদের সহিত সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্টতা। এই বৃত্তি যাহাতে যতটা অধিক, তিনি গুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মের সহিত ততটা সংশ্লিষ্ট।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকট-লীলা-কালে হরিকথা-কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সহিত যোগযুক্ত রাখিবার জন্য, তাঁহার কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীপদকমলের সঙ্গ-দানের নিমিত্ত নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। আবার অপ্রকট-লীলা বিস্তার করিয়া তাঁহার বিরহ-স্মৃতির মধ্য দিয়া আরও অধিকতর গাঢ়ভাবে তাঁহার সেবোন্মুখ ভক্তগণকে সঙ্গ-দানের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার 'প্রকট' ও 'অপ্রকট' উভয় লীলায়ই কখনও তাঁহার সম্মুখে আমার জড়পিণ্ডকে অবস্থিত, কখনও বা এই জড়পিণ্ডকে দূরে সংস্থাপিত করিবার অভিনয় করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সঙ্গ হইতে বিযুক্তই রহিয়াছি। কারণ, তাঁহার ও তাঁহার নিষ্কপট ভৃত্য-বর্গের চিত্তবৃত্তির সহিত আমার চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ পৃথক্। আমি আমাকে সেইরূপ মহাপুরুষের "স্নেহপাত্র জ্ঞান" করিয়াও এইপর্য্যন্ত "কুবিষয়েই প্রমত্ত" রহিয়াছি ও হইতেছি।

শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি তাঁহার বাণীর মধ্যে সম্প্রকাশিত। তিনি তাঁহার এক পত্রে কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। * * **আপনি অভিগমনের পরিবর্ত্তে অনুকরণাদির** সাহায্যে অনুসরণ-পদ্ধতি ত্যাগ করিয়াছেন। **আমাদের নিকট Return Journey Ticket-holder এর কোন দ্রব্য নাই ;** কেন না কৃষ্ণেতর **পদার্থমাত্রকেই আমরা ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া জানি।** তদ্বিপরীত **বিচারপরায়ণ** জনগণেরই দুর্ভাগ্যক্রমে **সন্দেহের উৎপত্তি** এবং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার অভাব। আমরা জানি—**সেবানুকূল কার্য্যসমূহ** ভোগী **কর্ম্মকাণ্ডীয় ফল প্রার্থনা**

মাত্র নহে বা জ্ঞানীর নিজের অপস্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে **নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান নহে।** জিজ্ঞাসু ও ভক্তি-প্রার্থীর ঔষধের প্রতি কিছু শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। জড়দ্রব্যগুণে যে শক্তি নিহিত আছে, **সেই প্রকার দুর্ব্বলা শক্তি আত্মজগৎকে স্পর্শ করিতে পারেনা।"**
—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ২য় খণ্ড, ১৩৩ পৃঃ)

আমি মুখে যতই শ্রীল প্রভুপাদের জয়গানের অভিনয় করিয়াছি এবং শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট লীলায় তাঁহার প্রতি আমার ভক্তির মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া অভিমান করিতেছি, কার্য্যতঃ কিন্তু আমার হৃদয়ে তাঁহার প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি বিদূরিত হয় নাই, তাঁহার অতিমর্ত্ত্যত্বের প্রতি এখনও সংশয় যায় নাই। যেহেতু আমার চিত্তবৃত্তিতে Return Journeyর Ticket-holder-এর বৃত্তিগুলি পূর্ণভাবে ছিল এবং এখনও আছে। এইজন্যই অভিগমনের পরিবর্ত্তে কেবল অনুকরণই হইয়াছে। আমি আধ্যক্ষিকতাবশে সন্দেহবাদী হইয়াছি। আমাতে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার অকপট চিত্তবৃত্তি প্রকাশিত হয় নাই, তাই সেবানুকূল কার্য্য-সমূহকে ভোগী কর্ম্মকাণ্ডীর ফলপ্রার্থনা বা জ্ঞানীর নিজের অপস্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে নির্ভেদব্রহ্মানু-সন্ধানের ব্যাপারের মত মনে করিয়াছি। "আমি যখন সেবা করিতেছি, তখন তাহার মাশুল বা শুল্কস্বরূপ কেনই বা কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশা হইতে বঞ্চিত হইব ? —ইহাই আমার চিত্তবৃত্তি। আমি যদি প্রকৃত প্রস্তাবে জিজ্ঞাসু ও ভক্তিপ্রার্থী হইতাম, তাহা হইলে ঔষধের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকিত। আমি মনে করিতেছি অগ্নিকে স্পর্শ করিলে তখন তখনই

যেইরূপ হস্ত দগ্ধ হয়, সেবার অভিনয় করিলে তখন তখনই কেন আমার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে না? কিন্তু এইরূপ চিত্তবৃত্তি শ্রীল প্রভুপাদ বা শ্রীরূপানুগ-গণের চিত্তবৃত্তি নহে। তাহা আমরা তাঁহাদের বাণী হইতেই লক্ষ্য করিয়াছি।

আমার চিত্তবৃত্তি এই যে, আমি যে-কোন রূপই হই না কেন, আমি যখন শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণের অভিনয় করিয়াছি, কিংবা তাঁহার সম্মুখেও বহুবার উপবেশন বা তাঁহার কিছু সেবা করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছি, তখন আমি কি তাঁহার চিত্তবৃত্তি বা অভীষ্ট অন্যান্য সতীর্থগণ অপেক্ষা কম বুঝি? কেবল একজনই শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি বুঝিতে পারেন—এইরূপ কথা আমি মানিব কেন? কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি অন্যরূপ। তিনি বলেন,—

"যিনি অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানের অপব্যবহার করিবার মানসে কপটতার বশবর্ত্তী হইয়া গৌড়ীয়মঠের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাঁহার সহিত গৌড়ীয়মঠের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বা নাই। যেইরূপ যাত্রার দলের অভিনয়ে বাস্তব সত্যের অভাব লক্ষিত হয়, তদ্রূপ। যেইরূপ কৃত্রিম স্বর্ণ স্বর্ণের স্থান অধিকার করিতে পারে না, তদ্রূপ কপটতাময়ী ভক্তির আবরণ কখনই শুদ্ধভক্তির সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না! অভক্তগণের ধারণা—প্রয়োজনতত্ত্বে ত্রিবর্গসেবা বা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম অথবা মুক্তি-প্রার্থনা! গৌড়ীয়মঠ ভক্তিপথের পথিক হওয়ায় ঐরূপ অপস্বার্থ-বিশিষ্ট কাপট্য গৌড়ীয়মঠে থাকিতে পারে না। **দীক্ষার অভিনয় ও দিব্যজ্ঞানলাভ—এক নহে।"**—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, প্রথম খণ্ড, ৫৯ পৃঃ)

"দীক্ষার অভিনয় ও দিব্যজ্ঞান—এক নহে"—ইহা শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও সদ্‌যুক্তির খাতিরে মুখে স্বীকার করিলেও, কিংবা কোন কোন সময় কপট দৈন্যভরে 'আমি শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য হইতে পারি নাই'—ইহা অপরের নিকট মুখে বলিয়া নিজের শত শত ছিদ্রের উপর একটা আপাত চূণকাম করিলেও যখনই কোন শুভানুধ্যায়ী বান্ধব বা গুরুস্থানীয় বৈষ্ণব আমাকে আমার মঙ্গলের জন্য ইহা জানাইয়া দেন, তখন আমি নিজেকে 'বড় আমি' মনে করিয়া বৈষ্ণবকে ভ্রান্ত, মৎসর, হিংসক-বিচারে তাঁহাকে আক্রমণ করি। আমার দোষগুলি তাঁহারই স্কন্ধে আরও পল্লবিত করিয়া চাপাইয়া থাকি এবং আমার ছিদ্রগুলি আরও বিস্তৃত করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করি। এইখানেই শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমার চিত্তবৃত্তির তফাৎ। শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি এই—

"পর স্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্ম-সংশোধন করিবেন,—ইহাই আমার উপদেশ। শিক্ষার্থীগণ ও শিষ্য-গণের যে সমালোচনার জন্য আমি বাধ্য হই, সেইরূপ হাঙ্গামার কার্য্যে আপনি কেন দৌড়াইয়া যান?"

—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ২য় খণ্ড, ১০৬ পৃ:)

বৈষ্ণবকে শিক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে অভিন্ন বিচার না করায় এবং মর্ত্ত্যবুদ্ধিবশতঃ শিক্ষাগুরুর সহিত আমার সমবুদ্ধি হওয়ায় বৈষ্ণবকে আমার বান্ধব, শাসকরূপে বরণ করিতে ইচ্ছুক হই না। এক কথায় আমার আনুগত্যময়ী চিত্তবৃত্তি নাই, প্রভুত্বময়ী বা সম্ভোগময়ী চিত্তবৃত্তিই আছে। গুরু ও বৈষ্ণব

শিক্ষার্থী ও শিষ্যতুল্য আমার সমালোচনা করেন বলিয়া আমি তাঁহাদের হস্ত হইতে সেই অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া গুরুবৈষ্ণবের উপর নিক্ষেপ করিতে চাহি ! এইখানেই শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমার চিত্তবৃত্তির পার্থক্য।

আমি আমার ঐরূপ আচার ও বিচার সমর্থন-কল্পে বলিয়া থাকি—"আমি যাহাদিগকে আদর্শ মনে করিতাম, পরবর্ত্তিকালে তাহাদের মধ্যে আবিষ্কৃত ছিদ্রসমূহই আমাকে এইরূপ পরের স্বভাব গর্হণ করিতে শিক্ষা দিয়াছে।" কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তিতে বিন্দুমাত্রও এইরূপ আত্মহত্যাকারক নির্ব্বিশেষ-বিচার দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার বাণীতে আমরা এইরূপ দেখিতে পাই—

"আপনার সহিত আমার মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি * * * **কতিপয় ব্যক্তির প্রাকৃত-দোষ ও প্রাকৃত দুর্ব্বলতা দেখিয়া গড্ডলিকা-প্রবাহ-ন্যায়াবলম্বনে ভাসিয়া যাইতে চাহেন, আমি কিন্তু সেই প্রতিকূল বিষয়গুলিকে বহুমানন করিতে প্রস্তুত নহি।** আমি শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২৩শ অধ্যায়ের ভিক্ষুগীতি পাঠ-কালে আশ্বস্ত হইয়াছি যে, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতাগুণসম্পন্ন হইয়া সকল ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিব, তাহাতে চঞ্চল আপনি বলেন,—**যাঁহাদিগকে আপনি আদর্শ জানিয়াছেন, তাঁহাদের ছিদ্র ও দোষ আপনাকে বিপথগামী করিয়াছে। আমি বলি,—আমাদের মনোনিগ্রহ করিলেই সকল প্রতিকূল বিষয়ের তীব্র বেগ আমরা সহ্য করিতে পারিব, সকলই আমার মনের দোষ, জগতে কেহই আমার অমঙ্গল করিতে**

পারে না।" শ্রীল বংশীদাস বাবাজী নিজেকে গৌর-নিত্যানন্দের ভৃত্য জানিয়া সকলই তাঁহার উপাস্যের দাসেরই দোষ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমার সেইদিন কবে হইবে—যেইদিন আমি এই কথা বুঝিতে পারিব ; আপনার আশীর্ব্বাদে আমি যেন বুঝিতে পারি—আমি প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ দিলাম। এই বিচার যেন উত্তরোত্তর প্রবল হতে থাকে।" —(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ২য় খণ্ড, ৯৩-৯৪ পৃঃ)

অনেক সময় মনে করি, শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন প্রকৃতির ও চিত্তবৃত্তির লোককে আশ্রয় দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের চিত্তবৃত্তিতে যখন সুষ্ঠু সেবোন্মুখতা প্রকাশিত হইতে দেখা যায় নাই তখন শ্রীল প্রভুপাদের শক্তির কিছু অভাব ছিল, কিংবা তিনি কোন জাগতিক লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বহু অযোগ্য শিষ্য করিয়াছিলেন। আবার কখনও বা মনে করি, এইরূপ কথা বাহিরে প্রকাশ করিলে আমাকে লোকে 'গুরুনিন্দুক' বলিবে, সুতরাং ইহা অন্তরে গোপন করিয়া চিজ্জড়-সমন্বয়বাদিগণের ন্যায় 'শ্রীল প্রভুপাদের নিকট দীক্ষামন্ত্রাদি গ্রহণের অভিনয়কারি-মাত্রেই শ্রীল প্রভুপাদের নিজ-জন বা শ্রীল প্রভুপাদের সেবক'—এইরূপ কথা প্রচার করিয়া 'তুম্‌ভী চুপ, হাম্‌ভী চুপ"—এই নীতি অবলম্বনে সকলের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করা যাউক। এইখানেই শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তির সহিত আমার চিত্তবৃত্তির আকাশ-পাতাল প্রভেদ। শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি তাঁহার ভাষায় এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে—

"যে-সকল অনভিজ্ঞ-জন **'মহাভাগবতের মহাবদান্য-লীলা** ধারণা করিতে অসমর্থ, সেই সকল অবিবেচক বলিয়া থাকে যে,

গৌরসুন্দরের আশ্রিত কালাকৃষ্ণদাস কেন ভট্টথারিগণের স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়াছিল ? কেন ছোট হরিদাস গৌরসেবার ছলনায় ভক্তের আদর্শ অনুসরণ না করিয়া ইতর চেষ্টাযুক্ত হইয়াছিল ? কেন রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্র পুরীর আনুগত্য পরিহার করিয়াছিল? অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর কতিপয় সন্তানব্রুব, বীরভদ্রপ্রভুর কতিপয় শিষ্যব্রুব কেন স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াছিল ? অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রকৃত সত্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারগত বিচারকে দূষিত করিয়া যে সকল কথা প্রচার করে, তাহা অনভিজ্ঞ জনগণের আদরের বস্তু হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেই নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্য বা তদাশ্রিত মহাভাগবতগণের লোকাতীত মহাবদান্য-লীলার তাৎপর্য্যের মধ্যে যখন প্রবিষ্ট হইবে, তখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, **অযোগ্য আপামর সর্ব্বসাধারণকে মঙ্গলপথের সুযোগ প্রদান** করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য, 'জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ যে কৃষ্ণদাস'—এই কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণদাস্য তাৎকালিক ভোগসাম্মুখ্যক্রমে বিপর্য্যস্তভাবে যে কৃষ্ণ-বৈমুখ্যরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা অনধিকার রাজ্যের প্রত্যক্ষজ্ঞানের নিন্দনীয় ব্যাপার হইলেও তাহাতে 'অপিচেৎ সুদুরাচারো' শ্লোকের তাৎপর্য্য লঙ্ঘিত হয় না। **'মহাভাগবত জানেন, সকলেই তাঁহার গুরু। তজ্জন্য মহাভাগবতই একমাত্র জগদ্‌গুরু।"**

—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড, ৫৭-৫৮ পৃঃ)

আমার চিত্তবৃত্তিতে আমি আমার শিক্ষাগুরুবর্গকেও আমার শুশ্রূষাকারী সেবক, না হয় আমারই সমান বলিয়া মনে করি। কিন্তু

শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তিতে দেখা যায়, তিনি তাঁহার শিষ্যগণকেও তাঁহার শুশ্রূষাকারী বিচার করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে গুরুরূপে দর্শন করেন।

"সেই নরোত্তমের ভক্তনরগণ বৈষ্ণব, সুতরাং তাঁহারাই আমার গুরুরূপে বহুমূর্ত্তিতে প্রকটমান। **অদ্বয়ভাবে তাঁহারাই আমার গুরুবর্গ ও শিক্ষকবৃন্দ, ব্যতিরেকভাবে তাঁহারাই তাঁহাদের ভজনোপযোগী সময়ে মাদৃশ নরাধমের প্রলপিত-বাক্য-শ্রবণে ব্যস্ত।** তাঁহাদের সহিতই আমি শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রুতবাণী একযোগে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করিতেছি। **জগৎকে কিছু শিক্ষা দিবার ধৃষ্টতা আমার নাই;** কেন না, বিষ্ণু-বৈষ্ণবতত্ত্ব নিত্যবৈশিষ্ট্যময় বা নিত্যভেদযুক্ত হইয়াও অচিন্ত্যভাবে অভিন্ন।" —(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী প্রথম খণ্ড, ১৭-১৮ পৃঃ)

আমি নিজেকে একজন "co-ordinate authority" (সমকক্ষ শাসক) মনে করি এবং সেইরূপ চিত্তবৃত্তি হইতেই "হাম্ বড়া বাহাদুর" বা "বড় আমি" বিচার আমাকে দীক্ষা-শিক্ষা বা শ্রবণ-গুরুবর্গের ছিদ্র (?) অন্বেষণে নিযুক্ত করিয়া আমাকে নির্বিশেষবাদী করিয়া দেয়। তাই মনোধর্ম্ম বশে আমি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শ্রীগুরুর পরিবর্ত্তন করিবার যোগ্য-পাত্র-বিচারে নিজেকে 'অসদ্‌গুরু পরিত্যাগকারী বাহাদুর' অভিমান করিতে করিতে নির্ব্বিশেষবাদের অতল গর্ত্তে পতিত হই।

আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদিগণের স্বভাবই এই যে, তাহারা গুরু-বর্গের ছিদ্রানুসন্ধিৎসু। অসুরমোহানবতার আচার্য্য শঙ্কর 'জগদ্‌গুরু ব্যাসদেবকে পাছে লোকে ভ্রান্ত মনে করে,'—এই আশঙ্কায় বিবর্ত্ত-

বাদই ব্যাসদেবের মনোঽভীষ্ট, শক্তিপরিণামবাদ তাঁহার সিদ্ধান্ত নহে, —এইরূপ কল্পনা করিতে ধাবিত হইয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য নিজ পরমগুরু গৌড়পাদের কারিকা-অবলম্বনে তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য রচনা করিয়া সেই ভাষ্যে গৌড়পাদের রচিত সাংখ্যকারিকার মতবাদে দোষ, অর্থাৎ নিজ আচার্য্যেরই দোষানুসন্ধান করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদী রামচন্দ্রপুরীর চিত্তবৃত্তিও তাহাই। শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীশ্রীধরস্বামীকে মায়াবাদী' বা শ্রীশ্রীধরের শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকায় ছিদ্র আছে বিচার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উল্লাসভরে তাহা বলিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই নির্ব্বিশেষ-চিন্তা-স্রোতের প্রশ্রয় দেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের "কৃষ্ণলীলামৃত" গ্রন্থের ছিদ্রানুসন্ধান করেন নাই। কাব্যপ্রকাশের বিশিষ্ট অধ্যাপক, 'সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ', রঘুনাথোপাসক 'পরমবৈষ্ণব' বলিয়া খ্যাত, অষ্টপ্রহর রামনামজপকারী, এমন কি, বৈষ্ণব-সেবক হইলেও রামদাস বিশ্বাসের নির্ব্বিশেষবাদকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন দিনও প্রশ্রয় দেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ বা রূপানুগবরগণের চিত্তবৃত্তিতেও এইরূপ বিচারই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। যাহারা অন্তরে মুমুক্ষু হইয়া বিদ্যা ও সুনীতির গর্ব্বে গর্ব্বিত এবং বৈষ্ণবকে সুনীতি ও দুর্নীতির গর্ত্তে টানিয়া আনিবার জন্য ব্যস্ত, তাহারা নির্ব্বিশেষবাদী। তাহাদের বাহ্য আড়ম্বর দেখিয়া আমার চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু শ্রীরূপানুগ-গণ তাহাদিগকে কোন পাত্তাই দেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"অতিরিক্ত অর্থ ও বাহাদুরীর গরম ভগবদ্ভক্তের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। তাহা হইলেই লংঘন-

জনিত অসুবিধাই হইতে পারে। আপনি আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আমার চিত্ত কোনদিন 'হামবড়া বাহাদুর' হইবার দিকে ধাবিত না হয়। * * *

একদিন শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তিনি স্বামী মানেন না এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতে খুব মজবুত বলিয়াছিলেন। এইরূপ মনোভাব পোষণ করিতে বল্লভাচার্য্যকে শ্রীমন্মহাপ্রভু উৎসাহ দেন নাই। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী আমাদের ন্যায় মূঢ় ব্যক্তিকে 'প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাশ্বপচরমণী' ইত্যাদি শ্লোক শিক্ষা দিয়াছেন। —(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ৩য় খণ্ড, ৪০ পৃঃ)

শ্রীল প্রভুপাদ তথাকথিত দুর্নীতি ও সুনীতি-সম্বন্ধেও আমার চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলিয়াছেন—

'Ethical principles or moral rules (জাগতিক নীতিসমূহ) জড়বিচারে প্রপঞ্চে সর্ব্বোত্তম, এ বিষয়ে আমার মতান্তর নাই। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমা সর্ব্বাপেক্ষা বড় উপাদেয় বলিয়া তাহার তুলনায় moral rules (নৈতিক নিয়ম-সমূহ) কৃষ্ণ অপেক্ষা বড় বা উপাদেয় নহে। * * * তাঁহারা অপ্রাকৃত পারকীয় বিচারাশ্রিত নিষ্কপট প্রেমিক ভক্তগণকে less ethical (কম নৈতিক) মনে করিতে পারেন; কিন্তু হরিপ্রীতির এমন একটী অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, তাহার নিকট পরমোপাদেয় moral standard (নৈতিক আদর্শ বা পরিমাণ) পর্য্যন্ত ক্ষীণপ্রভ হইয়া যায়। * * * ভক্তি না হইলে প্রাপঞ্চিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা disbelieving temper (অবিশ্বাস প্রবণতা)

অপসারিত হয় না।' —(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, ৩৮ পৃঃ)

আমার চিত্তবৃত্তি এই যে, যদি গুরুদেবের নিকট হইতে মন্ত্রাক্ষর লাভ করা যায় এবং কিছু কিছু শাস্ত্রাদি চর্চ্চা বা পাঠ-বক্তৃতাদি করিবার কৌশল শিক্ষা করা যায়, তাহা হইলেই মধ্যমাধিকার এবং বৈষ্ণবের বিচার করিবার যোগ্যতা লাভ হয়। কিন্তু পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তিতে এইরূপ কৃত্রিম বিচার দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, —

"মন্ত্রের উপদেশমাত্র দীক্ষা নয় ; যাহাতে দিব্যজ্ঞান হয়, তাহার নামই দীক্ষা। জীব নিজে শত শত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বা নিজের মনোমত ভজনের অভিনয় করিয়া নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। শব্দার্থ-জ্ঞানকে মন্ত্রার্থ-জ্ঞান সাহায্য করেন। **মহান্তগুরুর নিকট শিষ্যের দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা-প্রাপ্তিতে বাহ্য-জগতে যে পরিভাষা—যাহা অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিময়ী, তাহা তাঁহার চিত্তে স্থান না পাইয়া সে স্থানে মন্ত্রার্থ বা বিদ্বদ্‌রূঢ়িবৃত্তি অধিকার স্থাপন করেন।"** —(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী, ৪র্থ খণ্ড, ৩৩ পৃঃ)

বিদ্বদ্‌রূঢ়িবৃত্তি চিত্তে স্থান না পাইলে শ্রীল প্রভুপাদের দীক্ষায় আমি দীক্ষিতই হই নাই, তাঁহার সহিত সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট হইতে পারি নাই।

যিনি হরিভজন করেন, তিনি পূর্ব্ব ইতিহাস ও পূর্ব্ব অনর্থের কথা চিন্তা না করিয়া বর্ত্তমান অনর্থ-সমূহকে অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তন-প্রভাবে বিদূরিত করেন। কিন্তু আমার চিত্তবৃত্তিতে আমার বর্ত্তমান

অনর্থকে বিদূরিত করিবার চেষ্টা অপেক্ষা বৈষ্ণবের পূর্ব্ব ইতিহাস দর্শন ও তাঁহার প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাই প্রবল। শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে শুনিতে পাই,—

"আমাদিগের যাবতীয় অনর্থ কৃষ্ণসেবায় উন্মুক্ত হইলে উহাই অর্থ বা প্রয়োজনরূপে স্থায়ী মঙ্গলের কারণ হয়। ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বচরিত্র, সার্ব্বভৌমের কথা, প্রকাশানন্দের কুতর্করূপ যাবতীয় অনর্থ **পরিশেষে কৃষ্ণসেবাময় হইয়াছিল।** সুতরাং বিগত অনর্থের জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। বর্ত্তমান অনর্থ শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রবল করিলেই তাহারা প্রবল হইবে না।" —(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, ১৯-২০ পৃঃ)

রূপানুগ-গণের চিত্তবৃত্তিতে বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব দর্শন করিবার স্পৃহাই দৃষ্ট হয়। এইজন্যই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ"—এই আদেশ-বাণী। যাহারা বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব দর্শন না করিয়া তাঁহাদিগকে প্রাপঞ্চিক-চক্ষে, দর্শন করে, তাহারা খুব ত্যাগী, বিরাগী হইলেও তাহাদের বৈরাগ্য অতি তুচ্ছ ও নির্ব্বিশেষ-বিচারপর ; এইজন্যই শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে শুনিতে পাওয়া যায়,—

"শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, নাম-ভজন ও বৈষ্ণবকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞান করিলে তুচ্ছ বৈরাগ্য হয়, তাহা ভক্তের ত্যাজ্য।" —(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী, ১ম খণ্ড, ৭ পৃঃ)

শ্রীল প্রভুপাদ পুনঃ পুনঃ এইজন্য আমাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন,—

"নিজ ক্ষুদ্র অধিকারে, চায় ভক্ত দেখিবারে,
অবশেষে অপরাধ হায়।"

—উপদেশামৃতের অনুবৃত্তি

অন্যত্র গাহিয়াছেন,—

"যে ফল্গু বৈরাগী', কহে নিজে ত্যাগী,
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
মায়াবাদি-জন, কৃষ্ণেতর মন,
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব॥"

—(নির্জ্জনে অনর্থ'—সঃ তোঃ ২৩শ বর্ষ ১-২ সং)

শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তিতে কৃষ্ণবিরহকাতর আশ্রয়-বিগ্রহগণের সেবার জন্য উৎকণ্ঠা ও সর্ব্বক্ষণ বিষয়বিগ্রহের রসালোচনার পরিবর্ত্তে আশ্রয়-বিগ্রহগণের রসালোচনার কথাই প্রকাশিত। কিন্তু আমার চিত্তবৃত্তি তদ্‌বিপরীত। আমি কৃষ্ণবিরহতপ্ত আশ্রয়জাতিয়গণের সেবা অপেক্ষা সাংসারিক তাপক্লিষ্ট দেহসম্পর্কীয় স্বজনাখ্য দস্যুগণের সেবাকে 'পরম ধর্ম্ম' এবং বিষয়বিগ্রহের রসালোচনার অভিনয় করিয়া সম্ভোগবাদী প্রাকৃত সহজিয়ার চিত্তবৃত্তিতে অভিনিবিষ্ট। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—

"আমাদের সেব্যবিগ্রহ আশ্রয়জাতীয় ভগবৎপরিকরগণকে বহু-দিনের বিরহকাতরতা হইতে রক্ষা করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করাইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে লইয়া যাইতে হইবে। **মাথুর-বিরহকাতর ব্রজবাসি-গণের সেবা** করাই আমাদের পরম ধর্ম্ম।"—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ১ম খণ্ড ৪৬ পৃঃ)

"সর্ব্বক্ষণ **আশ্রয়জাতীয়ের রসালোচনা** করিবে। তাহা হইলে জড় বিষয়-জাতীয় অভিমান তোমাকে ক্লেশ দিবে না।"

—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ৩য় খণ্ড ৬২ পৃঃ)

আমার চিত্তবৃত্তি এই যে, আমি বহু গুণে গুণী, খুব বিদ্বান, খুব বুদ্ধিমান্ ইত্যাদি ; সুতরাং গুরুগৌরাঙ্গের চৌদ্দপুরুষ আমার কৃপায় উদ্ধার লাভ করিবেন ! কিন্তু প্রভুপাদের বিচার এই যে, শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর দীনচিত্ত অসমর্থ-জনের প্রতি বিশেষ দয়াময়।" —(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ২য় খণ্ড ২ পৃঃ)

আমার চিত্তবৃত্তি এই যে, ভগবানের সাক্ষাৎকার ও শ্রীহরিনাম-গ্রহণ দুইটী পৃথক্ বস্তু। হরিনাম-গ্রহন সাধন-মাত্র, আর ভগবানের সাক্ষাৎকার সাধ্যবস্তু ; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—

"**শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার— দুই একই জানিবেন।** শ্রীনামই সাক্ষাৎ ভগবান্। কেবল **সাংসারিক চক্ষে** ভগবানের নাম ও ভগবান্ পৃথক্ বোধ হয়।" —(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ২য় খণ্ড, ৩ ও ৫ পৃঃ)

আমার চিত্তবৃত্তি এই যে, "আমি এতটা হরিনাম করি, এতটা সেবা করি, তথাপি হরি, গুরু ও বৈষ্ণবের মন পাই না অর্থাৎ তাঁহারা আমাকে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা দ্বারা বঞ্চনা করিতেছেন না !" কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, "ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—'গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু' অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।'—এই সকল প্রার্থনা হৃদয়ে রাখিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করিবেন।"—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ২য় খণ্ড ৭ম পৃঃ)। "**ফলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া**

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করুন।”—(ঐ, ১০ পৃঃ)।

আমার চিত্তবৃত্তি,—অনেক দিন ত’ হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিলাম, এখন কিছুকাল বিশ্রাম করা যাউক ; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—“**সর্ব্বদা হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পান, নতুবা বিষয় আসিয়া গ্রাস করে।**” (ঐ, ১৪ পৃঃ)

আমার ধারণা,—আমি কোনপ্রকার অসৎসঙ্গ করি না। ‘অসৎসঙ্গ’ বা ‘দুঃসঙ্গ’ বলিতে যিনি বা যাঁহারা আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণে বাধা প্রদান করেন, আমি তাহাদিগকেই মনে করিয়া রাখিয়াছি ; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—

‘কৃষ্ণনাম করিলে সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ আপনা হইতেই কুজ্ঝটিকার ন্যায় দূরীভূত হইবে। উহারা (দুঃসঙ্গ সমূহ)—**মায়াবাদী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী।** দিন দিন **মায়াবাদিগণ** আপনাদিগকে **বৈষ্ণব’ বলিয়া পরিচয়** দিতে আরম্ভ করিল ! **শ্রীল স্বরূপ গোস্বামীর আজ্ঞানুসারে** ঐসকল **মায়াবাদীকে তাড়াইয়া দিয়া** নিঃসঙ্গে হরিনাম করিলে গৌরহরি দয়া করিবেন।”—(ঐ, ২৭ পৃঃ)।

গৌড়ীয়গণের মালিক শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু নির্ব্বিশেষবাদী-গণকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃসঙ্গ বলিয়াছেন। তিনি ছোট হরি-দাসের জন্যও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আবেদন করিয়াছিলেন ; কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদী বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবিকে কিছুতেই মহাপ্রভুর সম্মুখীন হইতে দেন নাই।

আমার চিত্তবৃত্তিতে সর্ব্বদাই ‘আখেরের’ বন্দোবস্ত করিবার

প্রবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। আমি পরমার্থ অপেক্ষা জড়ীয় অর্থে অধিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি ; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—

"আমি ত' তোমার মত নশ্বর অর্থমাত্র লোভী নহি। নিত্য অর্থ বা পরমার্থের লোভী হইয়া যেন আমি জন্ম জন্ম থাকি,—এই আশীর্ব্বাদ করিও। ভোগ্য **অর্থের লোভ যেন আমার নিতান্ত পরম শত্রুরও কোন দিন না ঘটে। আমার পরম শত্রুর মঙ্গল প্রার্থনা ব্যতীত যেন অন্য কোন অভিলাষ আমার না হয়। যে সকল পাষণ্ডের অর্থলোভ আছে** অর্থাৎ যাহাদের অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহা লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠাশা ও কনক-কামিনী-ভোগে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা আছে, আশীর্ব্বাদ করিও **যেন সেই সকল পাষণ্ডের মুখদর্শন আমাকে জীবনের শেষ কয়টা দিন আর করিতে না হয়।"** —(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ২য় খণ্ড, ৪৯ পৃঃ)

আমার চিত্তবৃত্তি এই যে, আমি নির্ব্বিশেষবাদীর ন্যায় সর্ব্বদা 'কাম'কে নিন্দা করিতে করিতে উহার দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিব। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের চিন্তাস্রোত তাহা নহে। তিনি বলেন,—"যাহারা ঐরূপ বিচারসম্পন্ন, তাহারা কামেরই ধ্যান করিয়া থাকে ও চরমে তাহাতেই সমাধি লাভ করে। একমাত্র বৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই কামের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

কৃষ্ণসেবা বিমুখতারই অপর নাম—কাম। * * * এই ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে **নির্ম্মৎসর কৃষ্ণ-সেবকের সেবাই** আমাদের **একমাত্র ঔষধ** জানিতে হইবে।

ইহজগতে কৃষ্ণসেবকই আমাদের কৃষ্ণপ্রেমবিরোধি-কামের হস্ত হইতে পরিত্রাণকারী।" —(ঐ, ২য় খণ্ড ১২৬ ও ১২৭ পৃঃ)

শ্রীরূপানুগবরগণের চিত্তবৃত্তি জড়ভোগী বা নির্ব্বিশেষবাদী আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না, অথচ সব বুঝিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া আমাদের অভিমান প্রবল। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—

শ্রীরূপানুগ-গণের চিত্তবৃত্তি জড়ভোগবাদীরা আদৌ বুঝিতে পারিবে না। * * * আধ্যক্ষিক বা sensuous বিচারে যে চণ্ডীদাস, তাহা শুদ্ধভক্ত চণ্ডীদাস নহে। আধ্যক্ষিকগণ অপ্রাকৃত চণ্ডীদাসকে চিনিবার অযোগ্য।" —(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ৩য় খণ্ড, ১৭ পৃঃ)

আমি অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাশা-কামুক বলিয়া লোকনিন্দার ভয়ে গুরু-বৈষ্ণবের সেবা যে-কোন মুহূর্ত্তে পরিত্যাগ করিতে পারি। নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ আমার এই দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া আমাকে নানাপ্রকার বাক্য-বাণের দ্বারা জর্জ্জরিত করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি অর্থাৎ আমাকে নিত্যসেবা হইতে ভ্রষ্ট করিতে চাহে। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের বা আশ্রয়বিগ্রহগণের চিত্তবৃত্তি ইহার বিপরীত—

"লোক-গঞ্জনার ভয়ে শ্রীবার্ষভানবীদেবী শ্রীকৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করেন না। আমাদের সহিত বিরোধ করিয়া যে অরিষ্ট বৃষ 'উলুইচণ্ডী' সেবা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতেও আমাদের নৈরাশ্যের কারণ নাই।"—(ঐ, ৩য় খণ্ড, ২৫ পৃঃ)

অনেক সময় আমি মনে করি,—শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তিতে 'অতন্নিরসন' ব্যাপারটিই বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। সুতরাং 'অতন্নিরসন'

করিতে যাইয়া নির্ব্বিশেষবাদী যেইরূপ বিষয়বিগ্রহ 'কৃষ্ণ'কেও 'অতদ্' বস্তু বলিয়া নিরসন করেন, তদ্রূপ আমি আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরু বা শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মকেও নিরাস করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তির সহিত খাপে খাপে মিলিয়া যাইব। কিন্তু আমার নির্ব্বিশেষ-বিচার-পরা চিত্তবৃত্তি শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি হইতে তফাৎ—

"যত্নপূর্ব্বক 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ' শ্লোকটি স্মরণ কর, তবে আমার বিচার-ধারা বুঝিতে পারিবে। বিশেষতাকে সামান্য শ্রেণীভুক্ত করার প্রয়োজন নাই।"
—(ঐ, ৩য়খণ্ড, ৫০ পৃঃ)

আমি মনে করি,—এই জড়দেহকে যদি শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থান করাইয়া—দেহরামপ্রিয়তা, প্রতিষ্ঠাশানুসন্ধান ও শুদ্ধবৈষ্ণব-গণের ছিদ্রানুসন্ধানে নিযুক্ত রাখিয়া ভজনকারীর ছলনা করি, তথাপি আমি প্রভুপাদের ন্যায় শ্রীধামে বা শ্রীচৈতন্যমঠে বাস করিয়া হরি-ভজনে তৎপর আছি : কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবাসের শাশুড়ী ও পয়ঃপান-ব্রত ব্রহ্মচারীর ভোগ ও ত্যাগপর কোন আদর্শকেই হরি-ভজন বলেন নাই—

"শ্রীধাম-বাসের অভিনেত্রীগণ যদি দিব্যজ্ঞান লাভের পরিবর্ত্তে অজ্ঞতা পোষণ করিয়া **শ্রীধামাপরাধে ব্রতী হন, তাহা হইলে শ্রীবাসের শ্বাশুড়ী, পয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারীর দাস্যই বাড়িয়া যাইবে।** ভক্তিলতা শুকাইয়া গিয়া বা কুঞ্জর-শুণ্ডের দ্বারা বিশীর্ণ হইয়া ভোগ্য লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আশায় পরিণত হইবে। সুতরাং শ্রীধাম-বাসের অভিনেত্রীগণের ও তাঁহাদের অনুসরণকারিগণের

পাদপদ্মে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা পূর্ব্বচিত্তবৃত্তির অমঙ্গল লইয়া শ্রীধামে বাস না করেন ; কারণ, তাহা হইলে তাঁহাদের কুলিয়ার বৈষ্ণব-নিন্দকের সঙ্গই প্রার্থনীয় হইবে।

শ্রীধাম-ভোগের বাসনা অন্তরে পোষণ করিয়া বাহিরে শ্রীধাম-বাসের ছলনা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রয়াসী অভক্তগণেরই শোভা পায়। শ্রীধাম-বাসের অভিনেতার এইরূপ দুষ্প্রবৃত্তি আগ্নেয়-গিরির ন্যায় উত্থিত হইলে আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল প্রাণী তাদৃশ বিষয়ীর সঙ্গ হইতে শতসহস্র যোজন দূরে থাকিবে। কেন না, গৌরসুন্দর বলিয়াছেন, সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।' আমরা এই শিক্ষা হইতে বিপথগামী হইতে পারিব না।" —(ঐ, ৩য় খণ্ড, ৭৮ পৃঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি হইতে আমার চিত্তবৃত্তি কতটা বিপরীত, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের নিম্নলিখিত বাণীটিতে আমরা বহু-বার শ্রবণ করিয়াছি,—

"**শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ-শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকর স্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন।** আমরাও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরূপ, শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদ্দেশ্যেই সকল কার্য্য করি। **ভক্তিপথ ছাড়িয়া দিলে অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মত্ব** আমাদিগকে **গ্রাস** করে।"—(ঐ, ৩য় খণ্ড, ৮৯ পৃঃ)

—ঃ০ঃ—

মায়া-জয়ের উপায়

ভগবান্—মায়াধীশ। আর জীব মায়াবশযোগ্য। এই স্থানেই জীব ও ভগবানের মধ্যে ভেদ।

"মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

—(চৈঃ চঃ ম ৬।১৬২)

অণুত্ব-হেতু জীবের মায়াবশ-যোগ্যতা নৈসর্গিক। বিভুত্ব-হেতু মায়া কখনও ভগবান্‌কে অভিভূত করিতে পারে না, নিত্যই তাঁহার পদানত থাকে। একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যখন বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে, তখন তাহা একটু সামান্য বায়ুদ্বারাও নির্ব্বাপিত হয়, কিন্তু বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডকে প্রবল বায়ুও নির্ব্বাপিত করিতে পারে না, বরং তাহা তাহার ইন্ধনরূপেই কার্য্য করে। ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ যখন বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে অবস্থান করে, তখন তাহার কোন ভয় নাই। কিন্তু যখন সে আশ্রয়হীন, বৃহৎ বা বিভু হইতে বিচ্যুত, তখন তাহার প্রতি পদে পদে বিপদ। 'অণু-চৈতন্য জীবেরও সেই অবস্থা। যখন জীব বিভুর আশ্রয়ে—গুরুর আশ্রয়ে থাকে, যখন জীব গুরু-বৈষ্ণবের শরণাগত, তখন মায়া তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না।

গায়ের জোরে মায়াকে জয় করা যায় না। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা মায়াকে জয় করিবার চেষ্টা, গায়ের জোরের চেষ্টা মাত্র। যাহারা অহঙ্কারাত্মা, তাহারা ঐসকল চেষ্টাদ্বারা মায়াকে জয় করা সম্ভব বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। কিন্তু জগতে যিনি যতই ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর ও তপোবীর বলিয়া বিখ্যাত হউন

না কেন, গায়ের জোরে কেহই মায়াকে জয় করিতে পারেন নাই। অণু চেতনের সাধ্য নাই সে বিভু চেতনের বহিরঙ্গা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী দৈবী মায়াকে জয় করিতে পারে। যাহাকে পিশাচী ধরিয়াছে, সে কখনই নিজে নিজের চিকিৎসা করিতে পারে না। এইজন্য ওঝা গুরু বা বৃহৎ বস্তুর প্রয়োজন হয়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় অতি সরল ভাষায় বেদ-বেদান্তের এই সার কথাটুকু বলিয়াছেন,—

"মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।"

ত্রিভুবনে এইরূপ কোন বীর নাই—আব্রহ্ম-স্তম্ভ পর্য্যন্ত এইরূপ কোন প্রাণী নাই—যে ব্যক্তি মায়াকে জয় করিয়া উহার কবল হইতে নিস্তার পাইতে পারে। বহুরূপিণী মায়া যে কতভাবে জীবকে মুগ্ধ করিতেছে, তাহা মায়া-মুগ্ধ থাকিয়া কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। অনেকে মায়া জয় করিয়াছেন বলিয়া গর্ব্ব করেন, নিজদিগকে মায়া-মুক্ত বলিয়া অভিমান করিয়া অপর-ব্যক্তিদিগকে মায়া-কবলিত বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। কিন্তু মায়ামুক্তি এই জাতীয় ব্যাপার নহে। কাহারও গর্ব্ব, অহঙ্কার, অভিমান, আত্মম্ভরিতা, দম্ভ প্রভৃতি প্রকাশের দ্বারাই মায়া হইতে মুক্ত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যে ব্যক্তি উঁচু গলায় কথা বলিয়া অপরকে দাবাইয়া রাখিতে পারে, সে-ই মায়ামুক্ত ইহাও বলা যায় না। মায়ার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণপাত করিয়াও কেহ মায়া জয় করিতে পারে না। মায়া জয় করিবার একটী মাত্র উপায় সমগ্র শাস্ত্র, সাধুগণের বাক্য ও শত শত প্রত্যক্ষ প্রমাণ সমূহ প্রচার করিতেছে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন

উপায় নাই। অন্য দ্বিতীয় উপায় যদি কেহ নির্দ্ধারণ বা আবিষ্কার করে, তবে তাহাও মায়ারই দ্বিতীয় রূপ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সরল ভাষায় তাহা এই—

'সাধু কৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥'

সাধু, গুরুর কৃপা ব্যতীত মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

মায়াবদ্ধ জীব যাহা নিজের চেষ্টায় অর্জ্জন করিতে পারে তাহাও মায়া। মায়া দ্বারা মায়া জয় করা যায় না। তবে কি কেবল সাধু-গুরুর কৃপার দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলেই মায়া-জয় হইবে? ইহাও কথা নহে। সাধু-গুরুর কৃপার কাঙ্গাল হইতে হইবে। সেই কৃপার কাঙ্গাল হওয়াই নিজের অহমিকাকে বিসর্জ্জন করিয়া বিভুত্বের নিকট আত্ম-নিক্ষেপ করা। যিনি কৃপার কাঙ্গাল তিনি নিজের চেষ্টায় মায়াকে জয় করিতে চাহেন না বা তাহা দাবীও করেন না। তিনি কেবল মায়ার আবরণকে অপসারিত করিয়া তাহার নির্ম্মল নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ বিভু চৈতন্যের সহিত যোগ যুক্ত করিবার জন্য আর্ত্তি-বিশিষ্ট হন। সেই আর্ত্তি যত কপটতা-রহিত হয়, কৃষ্ণ ততই তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মের ধূলিরূপে প্রকাশ করেন। কৃষ্ণপাদপদ্মের ধূলি বা কৃষ্ণজনগণের পাদত্রাণের ধূলি হইতে পারিলে আর প্রকৃতির কবলে কবলিত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

অতএব একদিকে যেরূপ গায়ের জোরে মায়া জয় করা যায় না, তদ্রূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলেও মায়া জয় হয় না। যিনি

মায়া জয় করিবার জন্য ব্যগ্র তাঁহার হৃদয় সাধুগুরুবৈষ্ণবের কৃপার জন্য সর্ব্বদা অকপটে ক্রন্দন করিতে থাকিবে। তাঁহাকে জোর করিয়া বৈরাগ্য, যোগ বা ধ্যান শিক্ষা দিতে হয় না। তাঁহার অনুকরণের পিপাসা থাকে না। লোক-দেখান ভণ্ডামী বা কপটতা হৃদয়ে স্থান পায় না। তিনি কৃপার জন্য সর্ব্বদা আর্ত্ত—উন্মত্ত। তাঁহার দেহস্মৃতি নাই। কৃপার জন্যই তাঁহার ধ্যান, ধারণা ও সমাধি হইয়াছে। কৃপা ছাড়া তিনি আর কিছু জানেন না, বুঝেন না। সেই কৃপালাভের জন্য সহজ আর্ত্তি তাঁহাকে সহজ সেবক করিয়া তোলে। যতই তিনি সেবা করিতে থাকেন, কৃপার জন্য আর্ত্তি ততই বাড়িতে থাকে। ইহার ইতি বা বিশ্রান্তি নাই। সাধুকৃপা সাগরের ন্যায় অপার ও অনন্ত। এই কৃপা যিনি যত চাহেন, তিনি তত কৃপার জন্য আকুল হইয়া পড়েন, ইহাই এই কৃপার স্বভাব। এই কৃপার জন্য আর্ত্তির যেইস্থানে সমাপ্তি বা বিরতি হইয়াছে, তথায়ই নির্ব্বিশেষবাদ বা মায়া আসিয়া যবনিকা-পাত করিয়াছে।

মুখস্থ বুলির সাহায্যে কেহ কৃপার পথের পথিক হইতে পারে না। কতকগুলি গদ্ মুখস্থ বলিতে পারিলেই যে কেহ কৃপার ভিখারী হইয়াছেন, তাহা বুঝায় না। আমরা অনেক সময় পত্র-ব্যবহারে বা সামাজিক-শিষ্টাচারে ঐরূপ 'কৃপার ভিখারী' বলিয়া অভিমান করি। কিন্তু তাহা কৃপাকাঙ্ক্ষার লক্ষণ নহে। পূর্ণ নিষ্কপট না হইলে সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা নমস্কার বিধান না করিলে, সমস্ত জড় অভিমান পরিত্যক্ত না হইলে কৃপার জন্য নিষ্কপট-আর্ত্তি হৃদয়ে আসে না। আনুকরণিক দৈন্যের মত আনুকরণিক কৃপার প্রার্থী হওয়ায় কেবল

মাত্র আত্মবঞ্চনাই প্রমাণিত হয়।

যিনি নিষ্কপট ভাবে কৃপার জন্য কাঙ্গাল তাঁহার স্বাভাবিক তৃণাদপি সুনীচতা, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্বগুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার জিহ্বায় সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম প্রভু নৃত্য করিতে থাকেন। কৃপার জন্য যিনি কাঙ্গাল হইয়াছেন, তাঁহার রসনা কখনও বাতব্যাধিগ্রস্ত বা জড়ত্বদশাগ্রস্ত হয় না। তাঁহার চিত্ত কখনও জগতের কাম চিন্তা করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না। কৃপার কাঙ্গালের জিহ্বাকে শ্রীহরিনামপ্রভু বলাৎকারে আত্মসাৎ করিয়া তদুপরি নিজ স্বেচ্ছাময় তাণ্ডব রচনা করেন এবং চিত্তকে সর্ব্বদা প্রগতিশীল বিরহ-বিধুর করিয়া রাখেন। 'কবে কৃষ্ণ-কৃপা পাইব'—এই চিন্তাই তাঁহাকে পাইয়া বসে। তাই একাধারে তাঁহার শ্রীহরির কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণ হইতে থাকে। মায়া তাঁহাকে কি করিয়া স্পর্শ করিবে? ইহাই মায়া জয় করিবার স্বাভাবিক উপায়।

—:০:=

বহুরূপী নির্ব্বিশেষবাদের দুই একটি রূপ

বৈষ্ণবের স্বরূপ ও বিশ্বরূপদর্শন

শুদ্ধা ভক্তিদেবীর পূর্ণ আশ্রয় হইতে জীব বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলে ধর্ম্মানুশীলনের নামে নির্ব্বিশেষবাদের ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ

তাঁহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর সমগ্র তথাকথিত আস্তিক সম্প্রদায়ই পরমার্থের নামে নির্ব্বিশেষবাদকে বহুমানন করেন, ইহা অনাদিকৃষ্ণ বহির্ম্মুখতার একটি মজ্জাগত স্বভাব। যাঁহারা ভগবদ্ভক্তি যাজনের অভিনেতা, তথাকথিত প্রচারক বা তথাকথিত সত্যের আন্দোলনে উৎসাহী, তাঁহারা সকলেই ন্যূনাধিক তাঁহাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাত-সারে নির্ব্বিশেষবাদকে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বহুমানন করিতে বাধ্য হন। ইহা মায়াদেবী তাহার স্বরূপ গোপন করিয়া সংঘটন করাইয়া থাকেন। যাঁহারা নবীন উপাসক অর্থাৎ নূতন ধর্ম্মাচরণে উন্মুখ বা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয় নির্ব্বিশেষবাদেই ন্যূনাধিক ভরপুর থাকে। নির্ব্বিশেষবাদের ধারণা হইতেই তাঁহারা ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের ধারণা করিয়া থাকেন। কারণ, নির্ব্বিশেষবাদই কৃষ্ণবিমুখ জগতের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। এই নির্ব্বিশেষবাদ যে একপ্রকার, তাহা নহে; ইহা বহুরূপী। ইহার রূপ যে কতপ্রকার, তাহা ইয়ত্তা করা যায় না। ইহা এক এক সময় এমন সাধুতা, সত্য, মৈত্রী, জ্ঞান, বিরাগ, তপস্যা, ন্যায়, সুযুক্তি, সুগবেষণা, নিরপেক্ষতা, নিষ্ঠা, সদাচার, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি জাগতিক বহুমানিত গুণে বিভূষিত হইয়া আধ্যক্ষিক-তথাকথিত ধর্ম্মপ্রবণ জগৎকে বিমোহিত করে যে তাহাতে অনেক সময় বহু সরল ব্যক্তিরও বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়। চার্ব্বাকাদি স্পষ্ট নাস্তিকগণের কবল হইতে বহু-লোকের উদ্ধারের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদের প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার মোহ অতিক্রম করিবার ক্ষমতা একমাত্র মায়াতীত অতিমর্ত্ত্য পরমহংস ব্যতীত অপর কোন সাধারণ জীবের নাই। ভক্তিরাজ্যে কনিষ্ঠাধিকারীর কথা দূরে থাকুক,

মধ্যমাধিকারীও নির্ব্বিশেষবাদের ঐসকল রূপে অনেক সময় বিমোহিত ও বঞ্চিত হইয়া পড়ে।

নির্ব্বিশেষবাদের প্রগতির পাথেয়ই আধ্যক্ষিকতা। সেই **আধ্যক্ষিকতা ভগবদ্ভক্তির** স্বরূপলক্ষণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া **তটস্থ লক্ষণের প্রতিবিম্বাভাসগুলিকে ভক্তি** মনে করে ও সেই সকল প্রতিবিম্ব যে সকল পাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকেই ধার্ম্মিক বা ভক্ত এবং যে সকল পাত্রে তটস্থ লক্ষণের প্রতিবিম্বাভাস প্রতিফলিত দেখা যায় না, তাহাদিগকে অধার্ম্মিক, অভক্ত, এমন কি, দুর্নৈতিক পর্য্যন্ত মনে করে। নির্ব্বিশেষবাদ 'সোনার পাথর বাটী'র অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া থাকে অর্থাৎ পরমহংসের পতন)!', 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে', কামিনীকাঞ্চনের মায়ায় "ব্রহ্মাবিষ্ণু পড়ে খাচ্ছে খাবি" ইত্যাদি মত পোষণ ও প্রচার করে! যাহা 'সোনার বাটী' তাহা 'পাথরের বাটী' নহে; যিনি পরমহংস, তিনি কখনও পতিত নহেন; ব্রহ্ম কখনও পঞ্চভূতের কারাগারে আবদ্ধ হন না; জগদ্গুরু ব্রহ্মার, বিষয়বিগ্রহ বিষ্ণুর কামিনীকাঞ্চনে বদ্ধদশা নাই; বৈষ্ণবের জন্মমৃত্যু নাই, কর্ম্মফলভোগ নাই, ইহাই বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত; কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদী বলেন, বৈষ্ণবও জন্মমৃত্যুর অধীন; এমন কি স্বয়ং ভগবান্ জন্মমৃত্যুর কবলে কবলিত, অবতারের কেন্সার (কর্কট রোগ) রোগ হয়, তাঁহারও দেহ পাঞ্চভৌতিক দেহ ইত্যাদি!

নির্ব্বিশেষবাদের ঐ সকল বিষাক্ত বাষ্প ভক্তিরাজ্যের তথাকথিত উপাসকগণের মধ্যেও প্রবলভাবে ব্যাপ্ত হইয়াছে। যাহাদের ঐরূপ নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতঃ, তাহারা গুরুদেবকে মুখে 'পরমহংস'

বলিয়া স্তুতি করিয়া গুরুদেবের কোন ছিদ্র আছে কিনা, তাহা শ্রবণ, অনুসন্ধান ও তজ্জন্য গবেষণা করিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হয় এবং যদি তাহারা গুরুদেবে বা বৈষ্ণবে ভক্তির তটস্থলক্ষণে প্রতিবিম্বাভাস-গুলি দেখিতে না পায়, তবে তাহাদের হৈতুকী ছলনাময়ী শ্রদ্ধা অপগত হইয়া পড়ে। তাহাদের ঐ হৈতুকী শ্রদ্ধা নির্ব্বিশেষবাদেরই একটি বহুরূপিণী মায়া। ঐ মায়া বা ইন্দ্রজালকে আপাতদর্শনে 'শ্রদ্ধা' বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু উহা আধ্যক্ষিকতাময় নির্ব্বিশেষবাদের মায়াবী 'চেড়ী' মাত্র।

যেইরূপ পরমেশ্বরের **বিশ্বরূপ ও স্বরূপ** দর্শন অধিকারি-ভেদে হইয়া থাকে, তদ্রূপ বৈষ্ণবেরও বিশ্বরূপ ও স্বরূপ দর্শন অধিকারি-ভেদে লাভ হয়। নবীন উপাসকগণ পরমেশ্বরের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হয়। ঐ বিশ্বরূপ প্রাকৃত—ইহাই শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ; কিন্তু অবৈষ্ণবমত তাহা নহে। নির্ব্বিশেষবাদীমাত্রই ঐ বিশ্বরূপের মোহে মুগ্ধ ও বঞ্চিত হন। সেইরূপ যাহাদের নির্ব্বিশেষ ধাত আছে, তাহারাও বৈষ্ণবের বিশ্বরূপ-দর্শনে বঞ্চিত হইয়া থাকে, বৈষ্ণবের স্বরূপ দর্শন করিতে পারে না। বৈষ্ণবের বিশ্বরূপের মধ্যে যদি তাহারা তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের উপযোগী প্রতিবিম্বাভাসগুলি প্রতিফলিত দেখিতে পায়, তখন তাহাদের একপ্রকার ছলনাময়ী শ্রদ্ধারূপী নির্ব্বিশেষ-মায়া প্রকাশিত হয় ; আর যদি বিশ্বরূপ দেখিয়া তাহাদের ঐ হৈতুকী শ্রদ্ধা বিনষ্ট হয়, তখনই তাহারা বৈষ্ণব ও গুরুকে আক্রমণ করিতে বসে।

তথাকথিত বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি সম্প্রদায়

কেবল প্রতি কথায় 'পাপ' 'পাপ', কতকগুলি সম্প্রদায় 'সুনীতি' 'সুনীতি', কতকগুলি 'কামিনীকাঞ্চন' 'কামিনীকাঞ্চন', 'ত্যাগ' 'ত্যাগ' এই সকল মন্ত্র জপ করিয়া থাকে। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, যাহারা অত্যন্ত পাপী, তাহারাই পাপের ভয়ে বেশী ভীত বা উহার নিন্দায় পঞ্চমুখ। যাহারা অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ, তাহারাই দুর্নীতির প্রতি ক্রোধপরায়ণ ; যাহারা প্রচ্ছন্নভাবে কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত, তাহারাই কামিনীকাঞ্চনের বিদ্বেষী, যাহারা প্রচ্ছন্ন ভোগী, তাহারাই ত্যাগের প্রশস্তি-গায়ক। বস্তুতঃ ভগবদ্ভক্তগণ পাপ ও পুণ্য কোনটির নামই শ্রবণ করেন না, দুর্নীতি ও সুনীতি কোনটিকেই বহুমানন করেন না। তাঁহারা কখনও কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগের মন্ত্র জপ করেন না। তাঁহারা ভোগ ও ত্যাগ কোনটিরই উপাসক নহেন, তাঁহারা বৈষ্ণবসেবক।

নিম্নে নির্ব্বিশেষবাদিগণের কএকটি চিন্তাস্রোতঃ তাহাদের ভাষায় উদ্ধৃত হইল—

কোন এক পৃথিবীবিখ্যাত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যকে বলিতেছেন;—

গুরু—(শিষ্যের প্রতি) "তোমার কি বিবাহ হ'য়েছে ?"

শিষ্য—আজ্ঞে হ্যাঁ।

গুরু—(শিহরিয়া) ওরে বা—যাঃ, বিয়ে ক'রে ফেলেছে !

গুরুদেব—তোমার কি ছেলে হ'য়েছে ? (শিষ্যের বুক ঢিপ, ঢিপ, করিতে লাগিল। ভয়ে ভয়ে বলিলেন—আজ্ঞে—ছেলে হ'য়েছে।)

গুরুদেব—'যাঃ, ছেলে হ'য়ে গেছে !'

(র—১ম ভাগ ৪র্থ সং ১৩ পৃঃ)

নির্ব্বিশেষবাদী গুরু ও শিষ্য উভয়ের বিচারে বিবাহ করা না করা, ছেলে হওয়া না হওয়া—এইগুলিই ধার্ম্মিকতার মাপকাঠি !

শ্রীগৌড়ীয়মঠের একজন তথাকথিত প্রচারকনামধারী ব্যক্তি আকুমার ব্রহ্মচারীর অভিমান করিতেন। প্রসাদ-সেবার সময় যখনই তিনি 'সাধু সাবধান' ধ্বনি দিতেন, তখনই তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন,—

"সাধু সাবধান !"

"বিয়া ! বিয়া ! বিয়া ! হাতপা ছোর্‌কে জিঞ্জির পর্‌না ক্যা মজাদারী ভাইয়া !"

শ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ অভক্তিপর ধ্বনি শুনিয়া অনেক সময় আমাদিগকে বলিতেন,—"ইহা নির্ব্বিশেষবাদীর ধ্বনি। ইহার মধ্যে ভক্তির কোন গন্ধও নাই। বিবাহ না করা ও ছেলে না হওয়াই যদি পারমার্থিকতা হইত, তবে জগতে পারমার্থিকের কোন অভাব থাকিত না। কারণ, প্রত্যেক মায়াবাদী, নির্ব্বিশেষবাদী, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি নাস্তিক ঐ মত প্রকাশ করিয়া থাকে।" ঐ ব্রহ্মচারীটি পরবর্ত্তিকালে সন্ন্যাস-গ্রহণের অভিনয় করিয়া গুরুবৈষ্ণবাপরাধ-পূর্ণ নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতে ধাবিত হইয়াছে।

একসময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের আশ্রিত-অভিমানকারী এক ব্রহ্মচারীকে দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা-সংগ্রহের জন্য আর একজন ভক্তের সহিত প্রেরণ করা হইয়াছিল। যখন অন্তঃপুর হইতে স্ত্রীলোকগণ

দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা দিতে আসিতেন, তখন ব্রহ্মচারীজী মুষ্টিভিক্ষা-সংগ্রহের পাত্রটিকে দ্বারে রাখিয়াই তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া দূরে সরিয়া থাকিতেন, পাছে তাঁহার স্ত্রীদর্শন হয় এবং ছোট হরিদাসের মত মহাপ্রভুর অপ্রীতিভাজন হইতে হয়। আর যখন কোন পুরুষ লোক ভিক্ষা দিতে আসিতেন, তখন তিনি সম্মুখস্থ হইয়াই তাহা গ্রহণ করিতেন। ব্রহ্মচারীটির এই আচরণের কথা গুরুবর্গের কর্ণ-গোচর হইলে তাঁহারা ব্রহ্মচারীর এই আচরণ সমর্থন করিতে পারিলেন না। শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন যে, যাহাদের হৃদয় সর্ব্বদা যোষিৎচিন্তায় মগ্ন তাহাদেরই ঐরূপ অভক্তিপর বিচার দেখা যায়। নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার ঠিক এইরূপ। ঐরূপ কৃত্রিম স্ত্রীদর্শন বিদ্বেষের দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রকৃতি-সম্ভাষণই হইয়া থাকে— ইহাই শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণকে জানাইয়াছিলেন।

প্রায় অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে এক ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকের অভিনয়কারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি একদিন শ্রীগৌড়ীয়মঠের দুই একজন ভক্তের সহিত ঢাকা হইতে কলি-কাতাভিমুখে যাইতেছিলেন। তিনি ট্রেনের যে কক্ষে ছিলেন, তথায় রাত্রিকালে দেখিতে পাইলেন, এক বৃদ্ধ তাহার একটি পাঁচ ছয় বৎসর বয়স্কা দৌহিত্রীকে ট্রেনের বেঞ্চের উপর শয়ন করাইয়া নিজ উরুদেশের উপর ঐ বালিকার মস্তক স্থাপন করিয়াছেন। ইহা দেখিয়াই সদ্য-স্ত্রী-পরিত্যাগকারী প্রচারক মহোদয় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন এবং সেই চলন্ত ট্রেণের কক্ষে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "দেখুন! মানুষ বৃদ্ধ

হইয়া গিয়াছে, তথাপি কিরূপ তাহার স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সা ! স্ত্রীজাতি কি মায়াবী ! অল্পবয়স্কা বালিকা হইলে কি হয়। তাহাও বৃদ্ধের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে !" এইরূপ নানা কথা বলিয়া প্রচারক মহোদয় জানাইলেন যে, তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া স্ত্রীসঙ্গের কুফল জগতে প্রচার করিতেছেন। কারণ, ইহাই জীবের সকল বন্ধনের মূল।

যখন শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রচারক মহোদয়ের এই কথা জানান হইল, তখন শ্রীল প্রভুপাদ ঐ ব্যক্তিকে নির্ব্বিশেষবাদী অভক্তিপরায়ণ প্রচ্ছন্ন কামুক বলিয়া আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণকে জানাইলেন। পরবর্ত্তিকালে ঐ স্ত্রীপরিত্যাগকারী ব্যক্তি পুনরায় পরিত্যক্তা স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বৈষ্ণবধর্ম্মে নিরামিষ ভোজনফলে শরীরের বলবীর্য্য শুষ্ক হইয়া যায় বিচার করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণপূর্ব্বক ছাগ-কুক্কুটাদির মাংস এবং নিষিদ্ধ মাংসবিশেষ সহধর্ম্মিণীর সহিত ভোজন করিতেছেন এবং আধুনিক ফ্যাসেন অনুযায়ী বিগত-যৌবনা সহধর্ম্মিণীকে নানা বসন, ভূষণ ও প্রসাধনাদি দ্বারা সুসজ্জিতা ও নবীনা করিয়া প্রায় ষষ্টিবর্ষ বয়সে স্ত্রী-তর্পণ করিতেছেন ! ইহাই প্রচারক মহোদয়ের স্ত্রীসঙ্গবিদ্বেষের ফল ! বর্ত্তমানে তিনি নির্ব্বিশেষ-বাদের ভোগ-কামনা পরিত্যাগ করিয়া স্পষ্ট ভোগী হইয়াছেন।

প্রায় অষ্টাদশবর্ষ পূর্ব্বেই এক অবিবাহিত যুবক হরিভজন করিবার ছলনা করিয়া মঠবাসী ব্রহ্মচারী হইবার অভিনয় করেন। এই নবীন ব্রহ্মচারীটি বৈষ্ণব-গৃহস্থ দেখিলেই তাঁহাদের চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতেন। এক সময় কোন এক বৈষ্ণবগৃহস্থ সহধর্ম্মিণীর

সহিত একটি নবজাত সন্তান লইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তখন ঐ ব্রহ্মচারীটি উক্ত বৈষ্ণবগৃহস্থকে বিদ্রূপাত্মক ভাষায় শিষ্টাচারবিরুদ্ধ নানা কথা বলেন। কারণ, স্ত্রীলোক বা নবজাত সন্তানাদি দেখিলেই উক্ত ব্রহ্মচারি-নামধারীর প্রচ্ছন্ন কামুকতার উদ্রেক হইত এবং তিনি নিজের কামলিপ্সা ও নীচচিত্তবৃত্তি অপরের মধ্যে দর্শন করিয়া পরকে সংশোধন করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন! শ্রীল প্রভুপাদ ঐ ব্রহ্মচারিনামধারীর ঐরূপ ব্যবহারের কথা শুনিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে ঐ ব্যক্তি মঠবাস পরিত্যাগ করেন এবং যে যোষিৎসঙ্গের এত বিদ্বেষ করিতেন, সেই যোষিৎসঙ্গকেই অত্যন্ত অবৈধভাবে রুচির সহিত আলিঙ্গন করেন। বর্ত্তমানে ঐ ব্যক্তি নিজ বিমাতৃগামী হইয়া ও তাহাতে বহু সন্তান উৎপাদন করিয়া জগজ্জঞ্জালকর বেশোপ-জীবী হইয়াছেন ও শুনা যায় কুলিয়া নবদ্বীপ সহরে বাস করিতেছেন। এখনও সেই ব্যক্তি বিজ্ঞাপনে যোষিৎসঙ্গের নিন্দা প্রচার করিয়া গোপনে ঐরূপ ব্যভিচার করিতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনা।

যাহারা যে বিষয়ের অতি বিদ্বেষী হয়, তাহারা সেই বিষয়েরই উপাসক হইতে বাধ্য হয়। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে, যাহারা কু-দলের অত্যন্ত বিদ্বেষী হইয়াছিল, তাহারাই এখন কু-দলের পদাব-লেহনকারী স্তাবক হইয়াছে। তাহাদের চিত্তবৃত্তি এখন কু-দলের সহিত খাপে খাপে মিলিয়া গিয়াছে। যাহারা ক-কে অত্যন্ত অবৈধ * * সঙ্গী বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল, তাহারা এখন তাহার

সহিত গলাগলি ঢলাঢলি করিতেছে। ক—এখন * শ্রেষ্ঠের (!) শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ-শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন !! ইহাই বিদ্বেষের পরিণাম। আর যাঁহারা পূর্ব্বাপর কু-দলের কোন বিদ্বেষ বিন্দুমাত্রও হৃদয়ে পোষণ করেন নাই. কেবলমাত্র অন্যাভিলাষরহিত হরিভজনের জন্য অসৎসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা গুর্ব্ব-পরাধী অবৈধ * * সঙ্গী কু-দলের সহিত মিলিতও হন নাই এবং হইবেনও না। নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবগণের চরিত্রের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তাঁহারা বিদ্বেষী বা বিরাগী এবং আসক্ত বা ভোগী কোনটীই নহেন। নিষ্কপট হরিসেবার জন্যই তাঁহাদের জীবন।

একসময় শ্রীগৌড়ীয়মঠে সন্ন্যাসি-নামধৃক্ এক ব্যক্তি তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের সহিত এক বিতর্ক উপস্থিত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "গৃহস্থ অবৈষ্ণবই হউন, আর বৈষ্ণবই হউন, উভয়ই ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী হইতে ছোট। কারণ, গার্হস্থ্য-ব্যাপারটি স্ত্রীপুরুষঘটিত ব্যভিচারকেই একটা লৌকিক সামাজিকতার আপোষের দ্বারা সমর্থন করিবার চেষ্টামাত্র।" তাঁহার বিচারে একমাত্র মহাভাগবত ব্যতীত বৈষ্ণবগৃহস্থমাত্রই প্রচ্ছন্ন ব্যভিচারী ও ধর্ম্মরাজ্যের অনধিকারী।

এই তর্কের মীমাংসার জন্য ভক্তগণ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত 'সন্ন্যাসি'-নামধারীর ঐরূপ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"প্রকৃত বৈষ্ণবগৃহস্থ সন্ন্যাসীর গুরু ; কিন্তু তাঁহার 'গুরু' অভিমান নাই। আর যে সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী কিংবা বানপ্রস্থ বৈষ্ণবকে 'গৃহস্থ' মনে করিয়া সেই বৈষ্ণবকে নিজ অপেক্ষা 'ছোট'

মনে করেন অর্থাৎ বৈষ্ণবের 'প্রভু' হইতে চাহেন, তিনি সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থধর্ম্ম হইতে পতিত হন। **ভক্তির তারতম্যানুসারেই বৈষ্ণবতা, আর বর্ণাশ্রমের বাহ্য আকারের তারতম্যানুসারে উচ্চাবচ বিচারই কর্ম্মজড়স্মার্ত্তধর্ম্ম বা অভক্তি।** বৈষ্ণবতা আত্মার ধর্ম্ম। যিনি যতটা শরণাগত ও বৈষ্ণবের সেবক, তিনি ততটা বৈষ্ণব। শ্রীল বাবাজী মহারাজ (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভু) ও শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদর্শ ও উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া কতকগুলি লোক গৃহব্রতধর্ম্মকেই ভক্তির অঙ্গ বিচার করিয়া বঞ্চিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শুষ্ক বৈরাগ্য বা গৃহব্রতধর্ম্ম কোনটিই বৈষ্ণবতা নহে। যিনি যতটা নিষ্কপট ও কৃষ্ণনামে শরণাগত, তিনি ততটা বৈষ্ণব—তিনি বাহিরে যে বেশ লইয়াই থাকুন।" এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ পাশ্চাত্য কৃত্রিমপন্থী ব্যক্তিগণের চিন্তাস্রোতঃ—যাহা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানরূপে বহুমানিত ও রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহাও পরমার্থের দিক্ হইতে গর্হণ করিয়াছিলেন। কৃত্রিমভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সমর্থকগণের মত অনুসরণে ইন্দ্রিয়-দমন হয় না, উহা ইন্দ্রিয়তর্পণবিশেষ।

পূর্ব্বোক্ত 'সন্ন্যাসি'-নামধারী ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তে বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না এবং শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিম্নলিখিত উপদেশসমূহ তাঁহার মনঃপূত হইল না। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ সন্ন্যাসিব্রুবের চিন্তা-স্রোতঃকে রামচন্দ্রপুরীর ন্যায় 'নির্ব্বিশেষ' চিন্তাস্রোতঃ বলিয়া মঙ্গলকামী ভক্তগণকে জানাইয়া দিলেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"ব্রজনাথ—'বৈষ্ণবজন' বলিলে কি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবকে বুঝিতে হইবে ?

বাবাজী—শুদ্ধকৃষ্ণভক্তই বৈষ্ণব—গৃহস্থই হউন বা গৃহত্যাগী হউন, ব্রাহ্মণই হউন বা চণ্ডালই হউন, ধনিমানীই হউন বা দরিদ্রই হউন, তাঁহার **যে পরিমাণে শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি** আছে, **সেই পরিমাণে** তিনি **কৃষ্ণভক্ত**। —(জৈব-ধর্ম্ম ১৭শ অঃ)"

"ভক্তগণ যখন গৃহস্থ থাকেন, তখন বিষয়ীদের ন্যায় বিষয়ে কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণ অন্বেষণ করেন না। তাঁহার ধর্ম্মপত্নী কৃষ্ণদাসী, পুত্রকন্যাসকল কৃষ্ণের পরিচারক ও পরিচারিকা। তাঁহার চক্ষু শ্রীবিগ্রহ ও কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তু দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করে। তাঁহার কর্ণ হরিকথা ও সাধু-জীবন শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। তাঁহার নাসিকা কৃষ্ণার্পিত তুলসী ও সুগন্ধসকল গ্রহণ করিয়া আনন্দ ভোগ করে। তাঁহার জিহ্বা কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণনৈবেদ্য আস্বাদন করিতে থাকে। তাঁহার চর্ম্ম ভক্তাঙ্ঘ্রি-স্পর্শসুখ লাভ করে। তাঁহার আশা, ক্রিয়া, বাঞ্ছা, আতিথ্য, দেবসেবা সমস্তই কৃষ্ণসেবার অধীন। **তাঁহার সমস্ত জীবনই 'জীবে দয়া', 'কৃষ্ণনাম' ও 'বৈষ্ণব-সেবন' এই মহোৎসবময়।** অনাসক্ত হইয়া বিষয়ভোগ কেবল গৃহস্থ-ভক্তেরই সম্ভব। গৃহস্থ-বৈষ্ণবের মধ্যে অনেক তত্ত্বজ্ঞ গুরু আছেন।"

(জৈবধর্ম্ম ৭ম অঃ)

* * *

'স্ত্রীসঙ্গী কাহাকে বলা যায় ? বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত সহবাস

করাকে কি স্ত্রী-সঙ্গ বলে ? এরূপ হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিবাহ করিবার পূর্ব্বে এই স্মৃতিবচন পাঠ করিয়াছিলেন,

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥"

গৃহকে গৃহ বলা যায় না। গৃহিণীর নামই গৃহ। গৃহিণীর সহিত সমস্ত পুরুষার্থ ভোগ করিবে। আবার শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ-গণের মধ্যে অনেকেই গৃহী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের আদর্শ চরিত্র অবলম্বনপূর্ব্বক কলিজীবের উদ্ধার হইয়া থাকে। বিবাহিতা পত্নীর সহিত কৃষ্ণসংসার স্থাপন করিলে জীবের ভজনোন্নতির ব্যাঘাত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার সাহায্য হয়। কৃষ্ণসেবার উপকরণস্বরূপ স্ত্রীপুত্র অঙ্গীকারকে ভক্তির অঙ্গ বলা যায়। বরং তত্ত্যাগে শুষ্ক বৈরাগ্যের বিশেষ অনাদর ভক্তিশাস্ত্রে দেখা যায়। বিবাহিতা পত্নীকে কৃষ্ণদাসী ও তদ্‌গর্ভজাত পুত্রকে কৃষ্ণদাস বলিয়া যে আনন্দ লাভ করা যায়, তাহা ভক্তের পক্ষে কিছুমাত্র দূষণীয় নয়। যদি বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত যুক্ত বৈরাগ্যের ব্যবস্থাক্রমে সহবাসাদি স্ত্রীসঙ্গ হইল না, তবে স্ত্রীসঙ্গ কাহাকে বলে ? তদুত্তর এই যে, সঙ্গ শব্দে আসক্তি। সেই বিবাহিত-স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া পড়িলে স্ত্রীসঙ্গ বলা যায়। আসক্তি জীবের একটি নিত্যধর্ম্ম। তাহা যদি কৃষ্ণে অর্পিত হয়, তবে অন্যত্র আসক্তি থাকে না। স্ত্রীতে আসক্তি করিলে সুতরাং কৃষ্ণাসক্তি খর্ব্ব হয়। কৃষ্ণাসক্তিই ভক্তি। স্ত্রীতে যুক্তবৈরাগ্য এবং কৃষ্ণে আসক্তি করিলে স্ত্রীসঙ্গ হইল না। * * * গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষে শাস্ত্রোক্ত বিবাহপদ্ধতির দ্বারা লব্ধ পত্নীর সহিত অনাসক্তরূপে

সহবাসকে 'স্ত্রীসঙ্গ' বলা যায় না। সেরূপ গৃহস্থ পুরুষের সঙ্গও অসৎসঙ্গ নয়।" —(সজ্জনতোষণী ৪র্থ বর্ষ, 'অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ' প্রবন্ধ)

জৈবধর্ম্মে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিজয়ের মুখে বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"প্রভো! তবে কি গৃহিণীসঙ্গ ত্যাগ না করিলে জীবের শুদ্ধনামের উদয় হইবে না?"

বাবাজী—স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ বিবাহিত-স্ত্রীর সহিত অনাসক্তভাবে বৈষ্ণবসংসার সমৃদ্ধি করেন, তাহাকে "স্ত্রীসঙ্গ" বলে না। স্ত্রীলোকে যে পুরুষের আসক্তি এবং পুরুষে যে স্ত্রীলোকের আসক্তি তাহারই নাম 'যোষিৎসঙ্গ'। সেই আসক্তি ত্যাগ করিয়া গৃহস্থলোক শুদ্ধ কৃষ্ণনামের আলোচনায় পরম-পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন। —(জৈবধর্ম্ম ২৫শ অঃ)

অন্য একসময় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া কোন এক ব্যক্তি বলিলেন,—এই সকল সিদ্ধান্ত নিতান্ত নিম্নাধিকারীর পক্ষে। বস্তুতঃ 'ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী' না হইলে কেহই 'গোস্বামি' পদবাচ্য বা বৈষ্ণব হইতে পারেন না। উপদেশামৃতে ষড়বেগের অন্যতম উপস্থ-বেগের ধারণকেই গোস্বামিত্ব বা বৈষ্ণবতা বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব-গৃহস্থগণের যদি সন্তানাদি হয়, তবে তাঁহাদের উপস্থবেগ ধারণ হয় নাই জানিতে হইবে। উক্ত ব্যক্তির এই কথার উত্তরে শ্রীসজ্জনতোষণী হইতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই সিদ্ধান্তটি উক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠ করা হইল।

"বৈধ স্ত্রীসঙ্গকেই উপস্থবেগ ধারণ বলে।"

('ধৈর্য্য' সজ্জনতোষণী ১১।৫)

পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসি-নামধারী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ব-গুরুবর্গের শ্রীচরণে অপরাধপূর্ণ চিন্তাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নীরব হইয়া স্থান ত্যাগ করিলেন ও নিজের শুষ্ক বৈরাগ্যকে বহুমানন করিতে লাগিলেন। এই অপরাধফলে ঐ ব্যক্তি পরে অত্যন্ত বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিল এবং গুরুদেবকর্ত্তৃক নির্ব্বিশেষবাদী বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ পরবর্ত্তিকালে তাঁহার আর মুখদর্শন করেন নাই এবং সে ব্যক্তিও শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখীন হইতে পারেন নাই।

শুদ্ধভক্তিসাম্রাজ্যের সংরক্ষক জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই সকল সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে নির্ব্বিশেষবাদি-গণের প্রায় শতকরা শতজন যে ব্যক্তিকে তাহাদের 'প্রামাণিক মহাজন' বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহার কএকটি কথা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। ইহা উদ্ধার করিবার কারণ এই যে, নির্ব্বিশেষবাদ কেবল যে তাহার আপন ঘরে আবদ্ধ আছে, তাহা নহে, যাঁহারা ভক্তিধর্ম্মের আচরণকারী ও প্রচারক বলিয়া অভিমান করেন, এরূপ শতকরা প্রায় নিরানব্বই জনের হৃদয়ের মধ্যেও নির্ব্বিশেষমত গোপনে প্রবেশ করিতেছে।

নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার এইরূপ—

গুরুদেব—(শিষ্যের প্রতি) "হ্যাঁগা, এটা আমার ক'দিন ধ'রে হ'চ্চে, কেন বল দেখি ? ধাতুর কোন জিনিসে হাত দেবার যো

নাই ! একবার একটা বাটীতে হাত দি'ছিলুম, তা' হাতে শিঙ্গীমাছের কাঁটা-ফোটা মত হ'লো। হাত ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ কর্‌তে লাগ্‌লো। গাড়ু না ছুঁলে নয়, তাই মনে কর্‌লুম, গাম্‌ছাখানা ঢাকা দিয়ে দেখি, তুল্‌তে পারি কি না। যাই হাত দিয়েছি, অম্‌নি হাতটা ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ ; খুব বেদনা ! শেষে মাকে প্রার্থনা কর্‌লুম, 'মা, আর অমন কর্ম্ম ক'র্‌বো না, মা এবার মাপ কর !"

—(র ······প্রথমভাগ ৪র্থ সংস্করণ ১৯০ পৃঃ)

* * *

"গুরুদেব—কামিনীকাঞ্চনই মায়া। ওখানে সকলে ডুবে যায়। ওখানে—

ব্রহ্মা বিষ্ণু পড়ে খাচ্ছে খাবি !"

—(র ······দ্বিতীয় ভাগ ১ম সংস্করণ ৪র্থ পৃঃ)

একজন জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"কোন ভক্ত যদি গৃহী হন, আর কেহ যদি আকুমার ব্রহ্মচারী বা অভুক্ত ত্যাগী হন, তবে উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?" জগদ্‌বিখ্যাত কোন নির্ব্বিশেষবাদী উত্তরে বলিতেছেন,—

"কামিনীকাঞ্চনের ভিতর থাক্‌তে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাক্‌তে গেলে যত সিয়ানই হও না কেন, কাল দাগ একটু না একটু গায়ে লাগ্‌বে।

মাখন তুলে যদি নূতন হাঁড়িতে রাখ, মাখন নষ্ট হ'বার সম্ভাবনা থাকে না। যদি ঘোলের হাঁড়িতে রাখ, তা' হ'লে সন্দেহ হয়। (সকলের হাস্য)

খই যখন ভাজা হয়, দু'চারটে খই খোলা থেকে টপ্ টপ্ ক'রে লাফিয়ে পড়ে। সেগুলি যেন মল্লিকা ফুলের মত. গায়ে একটুও দাগ থাকে না। খোলার উপর যে সব খই থাকে. সেও বেশ খই তবে অত ফুলের মত হয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞানলাভ করে, তবে ঠিক এই মল্লিকে ফুলের মত দাগশূন্য হয়। আর জ্ঞানের পর সংসার খোলায় থাক্‌লে একটু গায়ে লাল্‌চে দাগ হোতে পারে।"

—(র········১ম ভাগ ৪র্থ সংস্করণ ২১৪ পৃঃ)

"গুরুদেব (শিষ্যের প্রতি)—কিন্তু রসুনের বাটী যত ধোও না কেন, গন্ধ একটু থাক্‌বেই। কামিনীকাঞ্চন ঘাঁট্‌লে রসুনের গন্ধ হয়।"

"যেমন কাকে ঠোক্‌রান আম ঠাকুরকে দেওয়া যায় না, নিজেরও সন্দেহ।"

"নূতন হাঁড়ি, আর দৈ-পাতা হাঁড়ি। দৈপাতা হাঁড়িতে দুধ রাখ্‌তে ভয় হয়। প্রায় দুধ নষ্ট হ'য়ে যায়।',

"ওরা থাক্ আলাদা। যোগও আছে, ভোগও আছে। যেমন রাবণের ভাব—নাগকন্যা-দেবকন্যাও নেবে আবার রামকেও লাভ ক'রবে।

আর অসুররা নানা ভোগও কচ্ছে আবার নারায়ণকে লাভ কচ্ছে।"

"একটা দাম্‌ড়া গাই-গরুর কাছে যেতে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, একি হ'লো ? এ তো দাম্‌ড়া। তখন গাড়োয়ান বল্লে,—

'মশায়, এ বেশী বয়সে দাম্ড়া হ'য়েছিল। তাই আগেকার সংস্কার যায় নাই।'

এক জায়গায় সন্ন্যাসীরা বসে' আছে—একটি স্ত্রীলোক সেখান দিয়ে চলে যাচ্ছে। সকলেই ঈশ্বরচিন্তা কচ্ছে, একজন আড়্চোখে চেয়ে দেখ্‌লে। সে তিনটি ছেলে হ'বার পর সন্ন্যাসী হ'য়েছিল।

একটি বাটীতে যদি রস্থন গোলা যায়, রস্থনের গন্ধ কি যায়? বাবুই গাছে কি আম হয়?"

(র···· ২য় ভাগ ১ম সংস্করণ ২৩২ পৃঃ)

* * *

গুরুদেব (শিষ্যের প্রতি)—"তুই একটি ছেলে হ'লে স্ত্রীপুরুষ দুইজনে ভাই বোনের মত থাকিবে, আর ঈশ্বরকে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিবে, যাতে ছেলে পুলে আর না হয়।" —(ঐ)

* * *

"তবে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না হ'লে হ'বে না। ত্যাগ হ'লে তবে অজ্ঞান-অবিদ্যা নাশ হয়। আতস কাঁচের উপর সূর্য্যের কিরণ পড়্‌লে কত জিনিস পুড়ে যায়। কিন্তু ঘরের ভিতর ছায়া, সেখানে আতস কাঁচ লয়ে গেলে ওটী হয় না। ঘর ত্যাগ ক'রে বাহিরে এসে দাঁড়াতে হয়।"

—(র·······৩য় ভাগ ১ম সংস্করণ ৮৭ পৃঃ)

একদিন শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে নির্ব্বিশেষবাদিগণের এই সকল কথা বলিলে শ্রীল প্রভুপাদ অট্টহাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহাতে ভক্তির কোন কথাই নাই। সেই সূত্রে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

নিকট হারাধন দত্ত মহাশয় নির্ব্বিশেষবাদের পুরোহিতের যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও জানাইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে উপদেশ-প্রদানমুখে বলিয়াছিলেন যে, শুদ্ধভক্তগণের বিচার কখনও ঐরূপ নহে। ভগবদ্ভক্ত গৃহস্থের অভিনয় করিলে তিনি "রসুনের বাটী," "কাক ঠোঁক্‌রান আম" কিংবা "রাবণের আদর্শে একাধারে নাগকন্যা, দেবকন্যা ও লক্ষ্মী-ভোক্তার" অভিমান-কারীর ন্যায় হইবেন কিংবা তাঁহার গায়ে "কাজলের দাগ" বা "খোলার দাগ" লাগিবে—এরূপ বিচার অভক্তি-যাজনকারী নির্ব্বিশেষবাদীর। ভক্তি দেহ ও মনের ধর্ম্ম নহে যে ঐরূপ লাল দাগ ও কাল দাগের তারতম্য বিচার ভক্তের উপর প্রযুক্ত হইতে পারে।

কোন এক নির্ব্বিশেষবাদী শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও শ্রীরামানুজ-আচার্য্যের চরিত্রের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শ্রীরামানুজাচার্য্য হইতে শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেন না, শ্রীরামানুজাচার্য্য ভুক্তবৈরাগী অর্থাৎ বিবাহ করিবার পর সন্ন্যাসী হইয়াছেন, আর শ্রীশঙ্করাচার্য্য আকুমার ব্রহ্মচারী অবস্থা হইতেই সন্ন্যাসী হইয়া-ছিলেন। এইরূপ অপরাধময় নির্ব্বিশেষ বিচারে যাঁহারা ধাবিত, তাঁহারা শ্রীসনাতন-শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথাদি গোস্বামিগণের নিত্য-সিদ্ধ বৈরাগ্য অপেক্ষাও শঙ্করাচার্য্যের বৈরাগ্যের বহুমানন করেন! আবার শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীশ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীভবানন্দ রায়, শ্রীগুণরাজ খান, শ্রীসত্যরাজ খান, শ্রীমুকুন্দ দাস, শ্রীরঘুনন্দন দাস, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মধ্যে ভেদ-

দর্শন করেন। শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদে ভেদ দর্শন করিয়া অনেকে পাষণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীল রসিক মুরারি ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গোলোক-প্রতীতিযুক্ত সংসারকে সাধারণের সংসারের ন্যায় দর্শন করে, সেই সকল নির্ব্বিশেষ-বাদী ও প্রাকৃতসহজিয়ার সংসারবন্ধন কখনই ছিন্ন হইতে পারে না। মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সকল পুত্রই হরিভজন-পরায়ণ হন নাই, এমন কি, অনেকে হরিগুরু-বৈষ্ণব-বিমুখ হইয়াছেন, কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য্যের সন্তানগণ হরিবিমুখ ও বৈষ্ণববিদ্বেষী পর্য্যন্ত হইয়াছেন দেখিয়া সেই সকল বৈষ্ণবাচার্য্য বা বৈষ্ণবগণ 'কৃষ্ণদাসদাসী' সংগ্রহ করেন নাই, বহির্ম্মুখ সংসার করিয়াছিলেন, যাঁহারা কল্পনা করেন, তাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ প্রচ্ছন্ন কামুক ও স্ত্রীসঙ্গী। কেননা, তাঁহারা নিজদিগকে 'ত্যাগী' অভিমান করিয়া বৈষ্ণবের নিন্দা ও বৈষ্ণবে প্রাকৃতত্ব আরোপ করেন। মহাজন গাহিয়াছেন,—

যে ফল্গু বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
মায়াবাদী জন, কৃষ্ণেতর মন,
মুক্ত-অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব॥

নির্ব্বিশেষবাদীগণ "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" এই ন্যায়ানুসারে কামিনীকাঞ্চনের নিন্দা করিতে করিতে এবং উহার বাহ্যত্যাগের অভিনয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠাশাপরায়ণ হইতে হইতে কনক-

কামিনী-প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠারই প্রবল সন্ধান করেন এবং উহাই সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা অবরাঙ্গের নিন্দা করিতে করিতে উহাতেই ধ্যান ও সমাধি লাভ করেন। কিন্তু বৈষ্ণবের বিচার সেইরূপ নহে। তাঁহার পুরুষ বা যোষিদ্-দর্শন নাই ; তাঁহার বিচারে সকল আত্মাই হরিসেবা করিতে পারেন। "প্রপন্নামৃত" গ্রন্থ-পাঠে জানা যায়, যতিকুলশেখর শ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রিয় ও প্রধান শিষ্য শ্রীঅনন্তাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের আদেশে শ্রীশৈলে (তিরুপতিতে) দীর্ঘকাল বাস করিয়া ভগবৎকার্য্যে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। এই সময় শ্রীঅনন্তাচার্য্যের সহধর্ম্মিণী অন্তর্ব্বত্নী হন। শ্রীঅনন্তাচার্য্য স্ত্রৈণ পুরুষের ন্যায় কোন জড়দেহে আসক্ত ছিলেন না। বৈষ্ণবসেবাই উভয়ের একমাত্র জীবাতু ও প্রয়োজন ছিল। শ্রীঅনন্তাচার্য্য তিরুপতিবাসী বৈষ্ণব-গণের জলাভাবে কষ্ট দেখিতে পাইয়া স্বহস্তেই তথায় একটি সরোবর খনন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খননকার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভার্য্যা খনিত মৃত্তিকা মস্তকে লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া আসিতেন। পূর্ণগর্ভা-ভারাক্রান্তা আচার্য্য-সহধর্ম্মিণী অতি ধীরে ধীরে খনিত মৃত্তিকার ভার ফেলিয়া আসিতেছিলেন এবং তজ্জন্য অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করিতেছিলেন। অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া তিনি এক বৃক্ষ-ছায়ায় নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন। কথিত আছে, ইহা দেখিয়া স্বয়ং নারায়ণ অনন্তাচার্য্যের সহধর্ম্মিণীর রূপ-ধারণ পূর্ব্বক খনিত মৃত্তিকা বহন করিয়াছিলেন। অনন্তাচার্য্য-খনিত এই সরোবর আজও তিরুপতিতে 'অনন্তসরোবর' নামে বিখ্যাত হইয়া অনন্তাচার্য্য ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর বৈষ্ণবসেবার আদর্শ ঘোষণা

করিতেছে। এইরূপ আদর্শ বৈষ্ণবসেবকগণের সেবাচেষ্টা না দেখিয়া যদি কেহ তাঁহাদের পতিপত্নীরূপে বাস-দর্শনে লোলুপ-দৃষ্টি হইয়া পড়ে, তবে সেই সকল প্রচ্ছন্ন কামুক নির্ব্বিশেষবাদিগণের চিত্তবৃত্তি আসুরচিত্তবৃত্তি অপেক্ষাও হীন নহে কি ?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ১২শ পরিচ্ছেদে (৪৬-৫৩) শুদ্ধ বৈষ্ণবসেবকের আদর্শ শ্রীশিবানন্দ সেনের প্রতি মহাপ্রভুর, নিজ-জনগণের কথা পাঠ করিলে নির্ব্বিশেষবাদীর ও প্রাকৃত সহজিয়ার কামক্রোধাদি-রিপুর বিচারগুলি অত্যন্ত হেয় বোধ হয়।

নির্ব্বিশেষবাদিগণের মধ্যে অনেকের বিচার এই যে, গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তি কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠা বা আচার্য্যত্ব লাভ করিতে পারেন না ; কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শুদ্ধ বৈষ্ণব-গৃহস্থগণ সর্ব্বত্রই জগদ্গুরু আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। কূর্ম্মনামক গৃহস্থ-বিপ্রকে মহাপ্রভু কৃপা করিয়া শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক আচার্য্যের কার্য্য করিবার আদেশ প্রদান করেন। তখন কূর্ম্মবিপ্র গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর অনুগমন করিতে চাহিলে—

"প্রভু কহে,—"ঐছে বাত্ কভু না কহিবা।
গৃহে রহি' কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা॥
যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিব তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

(—চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৭-১২৯)

শ্রীগৌরসুন্দর বাসুদেব বিপ্রের কুষ্ঠরোগ বিমোচন করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে 'আচার্য্য' হইয়া জীবোদ্ধার করিবার আদেশ করিয়াছিলেন।

"প্রভু কহে,—কভু তোমার না হ'বে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম॥
কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার॥"

(—চৈঃ চঃ মঃ ৭।১৪৭-৪৮)

নির্ব্বিশেষবাদিগণ হয় ত' মনে করিবেন,—যিনি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ছিলেন, তিনি কি করিয়া লোকোপদেশকের কার্য্য করিবেন? জগাই-মাধাইর দ্বারাও মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন যে, নিষ্কপট বৈষ্ণবের পূর্ব্ব ইতিহাস বা প্রাকৃতত্ব দর্শন করিতে নাই।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "জৈবধর্ম্মে" বলিয়াছেন,—

"এরূপ মনে করিও না যে, গৃহস্থাশ্রম-অবস্থায় কৃষ্ণ-প্রেমের পরাকাষ্ঠা-লাভ হইতে পারে না—মহাপ্রভুর অধিকাংশ কৃপাপাত্রই গৃহস্থ, সেই গৃহস্থদিগের চরণধূলি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণও প্রার্থনা করেন।" (জৈবধর্ম্ম ২২শ অঃ)

এই সিদ্ধান্তে শুষ্কবৈরাগী নির্ব্বিশেষচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। কেননা, তাঁহারা মনে করেন, উহার দ্বারা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার লাঘব হইল, অর্থাৎ তাঁহারা সংসার ত্যাগ **করিয়া ভোগি-সম্প্রদায়ের নিকট যে বাহাদুর হইয়াছেন, সেই বাহাদুরীর সর্ব্বোচ্চ আসন তাঁহারা পাইলেন না!**

আবার উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া **প্রাকৃতসহজিয়া ও গৃহ-ব্রত-সম্প্রদায়** মনে করেন যে, ঐরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা **তাঁহাদের গৃহব্রত-ধর্ম্মকে সমর্থন করিবার খুব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে!** তাঁহাদের **কপটতা** এবং **আত্ম-বঞ্চনাও ঐরূপ সিদ্ধান্তের আড়ালে আশ্রয়** লাভ করিতে পারিবে! বস্তুতঃ ঐ উভয় শ্রেণীই ভ্রান্ত।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, **নির্ব্বিশেষবাদিগণ বৈষ্ণবের স্বরূপ-দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখিয়া বঞ্চিত হন।** বৈষ্ণবের জন্ম, মৃত্যু, নীচকুল, আলস্য, ক্রোধ, মলমূত্র-পরিত্যাগ, ব্যাধি, যন্ত্রণা, অভাব প্রভৃতি দর্শনই বৈষ্ণবের বিশ্বরূপ-দর্শন। স্বরূপদর্শনের পরিবর্ত্তে এই বিশ্বরূপ দেখিতে দেখিতে নির্ব্বিশেষবাদিগণের ছলনা-ময়ী ভক্তি কিছুকালের মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। তখন তাঁহারা স্পষ্ট বৈষ্ণববিদ্বেষী হইয়া পড়েন এবং বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ক্রমশঃ গুরু-বিদ্বেষ ও ভগবদ্বিদ্বেষে পর্য্যবসিত হয়।

"ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়।"

নির্ব্বিশেষবাদিগণ গুরুদেবের পতন বা পরমহংসের পতন আশঙ্কা করেন !!

"ব্যাস ভ্রান্ত বলি' তার উঠাইল বিবাদ।"

নির্ব্বিশেষবাদী "গুরোরপ্যবলিপ্তস্য" শ্লোকের কদর্থ করিয়া গুরুকে 'পতিত' ও নিজকে ভ্রম-প্রমাদাদিদোষচতুষ্টয়-নির্ম্মুক্ত অপতিত-জ্ঞানে গুরু কত ছটাক, কত কাঁচ্চা তাহা মাপিয়া ফেলেন ও গুরুকে 'ডিস্‌মিস্‌' করিয়া থাকেন।

নির্ব্বিশেষবাদী রামচন্দ্র পুরী পিপীলিকা সঞ্চরণ করিতে দেখিলেই গুরুবৈষ্ণব ও ভগবানের ইন্দ্রিয়লালসার অনুমান ও আশঙ্কা করেন!

নির্ব্বিশেষবাদী বৈষ্ণবের বিশ্বরূপ দেখিতে গিয়া নির্ম্মল বৈষ্ণবে পাপাচার দর্শন করে, আর প্রাকৃতসহজিয়া নামবলে পাপাচরণকারী অপরাধীকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া থাকে: কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের বিচার এইরূপ—

"ভক্তের বৈগুণ্য অর্থাৎ পাপাচার কখনই সম্ভব নয়; যদি কখনও সেইরূপ আচার দেখা যায়, তদ্বিষয়ে দুই প্রকার চিন্তা করা উচিত—মহাপুরুষ-ভক্তের দৈবক্রমে একটি পাপ-কার্য্য হইয়াছে, তাহা কখনই স্থায়ী হইবে না; অথবা পূর্ব্ব পাপাভাস ভাবোদয়ে বিনষ্ট হইতে কিছুকাল অতিবাহিত হইতেছে। অতিশীঘ্র তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপ মনে করিয়া ভক্তের সামান্য দোষ দর্শন করিবে না; সেই সেই স্থলে দোষ দর্শন করিলে নামাপরাধ হইবে। নৃসিংহ-পুরাণে লিখিয়াছেন—

"ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
ন হি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিৎ তিমিরপরো ভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ॥"

অর্থাৎ যেরূপ চন্দ্র শশাঙ্কযুক্ত হইলেও কখনই তিমিরাবৃত হন না, তদ্রূপ ভগবান্ হরিতে অনন্যচেতা মানব অতিশয় মলিন হইলেও অর্থাৎ সুদুরাচার হইলেও শোভা পাইতে থাকেন—এই উপদেশদ্বারা এরূপ বুঝিবে না যে, ভক্তগণ নিরন্তর পাপ করেন; বস্তুতঃ ভক্তিনিষ্ঠা জন্মিলে পাপবাসনা থাকে না; কিন্তু যে পর্যন্ত শরীর থাকে, সে

পর্য্যন্ত ঘটনাক্রমে কোন পাপ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে; ভজনবিগ্রহ জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় সেই পাপকে তৎক্ষণাৎ ভস্ম-সাৎ করেন এবং ভবিষ্যতে সেইরূপ পাপের আর উৎপত্তি না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হন।"

—জৈবধর্ম্ম ২২শ অঃ

ইহা সাধারণ ভজনপরায়ণ বৈষ্ণব সম্বন্ধে শুদ্ধভক্তের বিচার। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে এইরূপ বিচার নহে। গুরুদেব বা আচার্য্যগণ পূর্ব্বে পতিত ছিলেন ও পরে পতিত হইতে পারেন বা হইয়াছেন—এরূপ বিচার নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার। ব্রহ্মা, শিব, ব্যাস, বিল্বমঙ্গল, ভক্তাঙ্‌ঘ্রিরেণু প্রভৃতি জগদ্‌গুরু আচার্য্যগণ পূর্ব্বে পতিত ছিলেন, পরে সাধু হইয়াছেন,—নির্ব্বিশেষবাদী ও প্রাকৃতসহজিয়া এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন, বাল্মিকী পূর্ব্বে দস্যু ছিলেন, পরে বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়াছেন, তুলসীদাস পূর্ব্বে অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন, পরে রামায়েৎ-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য হইয়াছেন! নির্ব্বিশেষবাদী ও সহজিয়াগণ বলিয়া থাকেন, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি অবৈধ জীবন যাপন করিয়াও বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হইয়াছেন! এই জাতীয় যাবতীয় বিচারই স্ব-স্ব রিপুচাঞ্চল্যোত্থ পাষণ্ডতা। নির্ব্বিশেষ-চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট কোন গোস্বামি-নামধারী জগদ্‌-গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা করিয়াছিল! "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ নির্ব্বিশেষবাদীর এই চিন্তাস্রোতঃ নিরাস করিয়া লিখিয়াছেন,—

"ভজনবিজ্ঞ ভক্তে দুরাচার থাকিলে তদ্দ্রষ্টা তাঁহাকে দেখিয়া অপরাধী হন। তজ্জন্য প্রাকৃত দৃষ্টির পরিমাণমতে ভক্তদর্শন করিতে নিষেধ। **তাদৃশ দুরাচারে অবস্থান অনন্যভক্তির বিনাশকারক নহে ; পরন্তু অল্পবুদ্ধি দ্রস্টার চক্ষে বিশেষ অপকার।** যিনি শুদ্ধ ভক্তকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্যভজন দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহাভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন। * * * জাতরুচি সিদ্ধ মহাত্মগণের আচরণ না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে পতিত মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। যেহেতু সিদ্ধমহাত্মা বৈষ্ণবগুরুগণের ব্যবহারাবলীতে কটাক্ষ ও তাঁহাদিগকে হীন-জ্ঞানে কখনই জীবের কোন মঙ্গল হয় না। সুতরাং প্রাকৃত দৃষ্টিতে সিদ্ধ ভক্তকে কেবল বদ্ধ প্রাকৃত জীবজ্ঞানে শিষ্য মনে করিয়া সৎপথে আনয়নের চেষ্টাই বৈষ্ণবাপরাধ। অজাতরতি সাধক ও সিদ্ধভক্তে ভেদ আছে জানিয়া এক ব্যক্তিকে শিষ্য ও অপর ব্যক্তিকে গুরু জানিতে হইবে। গুরুকে উপদেশ দিতে হইবে না। শিষ্যের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে না, ইহাই বিবেচ্য।"

হরিভজন বা ভাগবতধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে কপটতা ও মৎসরতার স্থান নাই। কপটতা করিয়া কেহ ভজনরাজ্য জয় করিতে পারে না ; আর সত্যানুসন্ধানের ছলনায় মৎসরতা চরিতার্থ করিবার জন্য শুদ্ধ বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধান বা সমালোচনা করিয়াও কেহ ভজনে অগ্রসর হইতে পারে না। তাহা জীবকে নির্ব্বিশেষবাদের অতল-গর্ভে লইয়া যায়। নির্ব্বিশেষবাদী যেরূপ আধ্যক্ষিক যুক্তি

পোষণ করিতে করিতে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করে, তদ্রূপ নির্ব্বিশেষচিন্তাস্রোতে ধাবিত ভক্তিরাজ্যের তথাকথিত পথিকগণও আধ্যক্ষিকযুক্তির দ্বারা বৈষ্ণবের সমালোচনা করিতে করিতে প্রচ্ছন্ন মৎসর ও কপট হইয়া বৈষ্ণবের ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করিয়া থাকে। অর্থাৎ ধরাধামে কেহই মহাভাগবত বা পরমহংস বৈষ্ণব নাই—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বৈষ্ণবের আনুগত্য হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করে।

সকলেই অতীতের সুখস্বপ্ন দেখিয়া থাকে। তাই নির্ব্বিশেষবাদিগণও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রভৃতি গুরুবর্গের প্রকটকালে বলিতেন,—"শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথের ন্যায় বৈষ্ণব আর বর্ত্তমান জগতে দেখা যায় না!" শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটকালে যাহাদের নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতঃ প্রবল হইয়াছে, তাহারাও তদ্রূপ বলিয়া থাকে,—"হরিভজনকারী আদর্শ বৈষ্ণব আর এই জগতে নাই।" সুতরাং আনুগত্যের বালাইও নাই!

যাঁহারা মহান্ত আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে নিত্যকাল ভজনপ্রয়াসী, তাঁহারা জানেন,—কৃষ্ণের সাধু, শাস্ত্র ও গুরুরূপে অবতারের নিত্যত্বের কখনও ব্যাঘাত হয় না। তাঁহাদের নিত্য অবতার না থাকিলে বিশ্বচক্র বন্ধ হইয়া যায়। যদি কৃষ্ণের নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করি, যদি তাঁহাকে সশক্তিক ভগবান্ বলি অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদীর ন্যায় তাঁহাকে নিঃশক্তিক না বলি, তবে তাঁহার শক্তিবর্গের অর্থাৎ গুরু ও বৈষ্ণবের অবতার ও ব্যক্তিত্ব নিত্যকালই রহিয়াছে ও

থাকিবে।

'পৃথিবীতে বৈষ্ণব নাই, আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত কোন মহাভাগবত বৈষ্ণবই নাই'—যদি এইরূপ সিদ্ধান্তই হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণই নাই, গুরুপাদপদ্মের শক্তিসঞ্চার-সামর্থ্য নাই—ইহাই বলা হয়। অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আচার্য্যত্ব অস্বীকার করা হয়। গুরুদেবকে শক্তিহীন নপুংসক নির্ব্বিশেষ বস্তু বলা হয় ; কারণ, তিনি নিজ অচ্যুত-বংশ-সংরক্ষণে অসমর্থ। পৃথিবীতে যত লোকোত্তর আচার্য্য হইয়াছেন, সকলেই অচ্যুত-ধারায় মহাভাগবত-বংশ বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। এমন কোন আচার্য্য নাই, যিনি অন্ততঃ একটি মহাভাগবত সন্তান জগতে না রাখিয়া অপ্রকটলীলা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া বলিয়াছেন,—"একজনও হরিভজন করিল না!" সুতরাং পৃথিবীতে একজনও শ্রীগুরুদেবের ধারায় শুদ্ধ বৈষ্ণব শাসক নাই, যদি ইহাই প্রমাণিত হয়, তবে ভক্তিদেবীও চিরতরে ধরাধাম হইতে অন্তর্হিতা হইয়া পড়িয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে নির্ব্বিশেষচিন্তাস্রোতঃ প্রবল হইলে বৈষ্ণবের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব অস্বীকৃত হয়।

—:०:—

অধিকার-নির্ণয়

গুণ ও দোষ কিরূপে নির্ণেয় ?

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন —

"স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ ॥"

(ভাঃ ১১।২১।২)

নিজ নিজ অধিকারে যে অবস্থিতি, তাহাই গুণ এবং তাহার বিপর্য্যয়ই দোষ ; গুণ ও দোষের এইরূপেই নির্দ্ধারণ হয়।

অধিকার নির্ণয়-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ

অধিকার-নির্ণয়-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে সুবিচারপূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"অধিকারনির্ণয় একটি প্রধান ন্যায়াচরণ। যোগ্যতার নাম অধিকার। যোগ্যতা দুই প্রকার অর্থাৎ যে কর্ম্মে যাহার যোগ্যতা ও কত পরিমাণে সেই কর্ম্মে তাহার যোগ্যতা। সকল ব্যক্তিই সকল পুণ্যকর্ম্ম করিতে যোগ্য নহে। কোন ব্যক্তি কোন পুণ্যকর্ম্ম করিতে যোগ্য বটে, কিন্তু সেই কর্ম্ম পূর্ণরূপে করিতে যোগ্য নহে। অতএব যোগ্যতা স্থির না করিয়া যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সেই কর্ম্ম ফলবান্ হইবে কি না, তাহা বলা যায় না। তজ্জন্য অধিকার-নির্ণয় সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কর্ম্মকর্ত্তা নিজের অধিকার নির্ণয় করিতে পারে না, অতএব **উপযুক্ত গুরুকে আদৌ অধিকারবিষয় জিজ্ঞাসা করিবে।** উপদিষ্ট কর্ম্ম করিবার সময় প্রক্রিয়া নির্ণয় করা

পুরোহিতের কার্য্য। এইজন্যই লোকেরা উপযুক্ত গুরু ও পুরোহিত
বরণ করেন। আজকাল যেইরূপ গুরু ও পুরোহিত-বরণ হইতেছে,
তাহা শাস্ত্রকৃৎদিগের অভিপ্রেত নহে। নামমাত্র গুরু ও নামমাত্র
পুরোহিত বরণ করা পুত্তলিকা-বরণের ন্যায় নিরর্থক। গ্রামের বিশেষ
যোগ্য ব্যক্তিকেই বরণ করা উচিত। নিজ গ্রামে না মিলিলে
অন্যত্র অন্বেষণ করাই কর্ত্তব্য ; কর্ম্মের যোগ্যতার উদাহরণ দেওয়া
কর্ত্তব্য, নতুবা সহসা বোধগম্য হইবে না। পুষ্করিণী-খনন একটি
পুণ্যকর্ম্ম। যদি নিজহস্তে খনন করে, তবে উপযুক্ত বল, অস্ত্রাদি,
ভূমি ও সহায় থাকিলে ঐ কর্ম্মে যোগ্যতা হয়। যদি অর্থব্যয়
করিয়া খনন করে, তবে অর্থ থাকা চাই। যে পরিমাণ বল, অস্ত্রাদি,
ভূমি ও সহায় অথবা অর্থ থাকে, সেই পরিমাণই সেই কর্ম্মের
অধিকার। অনধিকারীর কোন ফল হয় না এবং কর্ম্ম করিতে গেলে
প্রত্যবায় হয়। বিবাহকার্য্যে শরীরের যোগ্যতা, সংসারনির্ব্বাহের
সামর্থ্য ও দাম্পত্য-ব্যবহারের উপযোগী মানসসংস্কার ইত্যাদি
যোগ্যতা আবশ্যক। এইরূপ যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইবে, তাহার
অধিকার অগ্রে নির্ণয় করা উচিত।

সনাতন শাস্ত্রের সর্ব্বত্র সর্ব্বাগ্রেই অধিকারের কথা আলোচিত
হইয়াছে। অধিকার লঙ্ঘন করিলে মনুষ্য জগন্নাশকর কার্য্য করিতে
বাধ্য হইবে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পঞ্চপ্রকার জগন্নাশকর
কার্য্যের কথা বিশ্লেষণ-সহকারে বিবৃত করিয়াছে।

জগন্নাশ-কার্য্য

"জগন্নাশকার্য্য পঞ্চ প্রকার—১) সৎকার্য্যের ব্যাঘাত করণ,

২) ফল্গুবৈরাগ্য, ৩) ধর্ম্মের নামে অসদাচার প্রবর্ত্তন, ৪) অন্যায়-যুদ্ধ ও (৫) অপচয়। অন্যলোকে যে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার স্বতঃ ও পরতঃ ব্যাঘাতকরণের যত্ন করিলে জগন্নাশকার্য্য করা হয়। ভগবদ্ভক্তিজনিত বা জ্ঞানজনিত যে বিষয়বৈরাগ্য হয়, তাহা উত্তম; কিন্তু চেষ্টা করিয়া বৈরাগ্য উৎপাদন করিতে গেলে অনেক অমঙ্গল হইয়া উঠে। সংসারে বর্ত্তমান থাকিয়া গৃহস্থধর্ম্ম উত্তম-রূপে পালন করাই সাধারণের কর্ত্তব্য। যথার্থ বৈরাগ্য উদিত হইলে সন্ন্যাসাশ্রমবিহিত বৈরাগ্য আচরণ করিবে অথবা ভগবৎসেবাপর হইয়া ক্রমশঃ গার্হস্থ্য-চেষ্টাসমূহ খর্ব্ব করিবে; ইহারই নাম যথার্থ বৈরাগ্য। অনেকে গৃহে কষ্ট-বোধ করিয়া অথবা অন্য কোন উৎপাতপ্রযুক্ত গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, সেইটি পাপকার্য্য। ক্ষণিক বিরাগ হইলে আশ্রম ত্যাগ করিবার অধিকার জন্মে না। কোন কোন লোক বুঝিতে না পারিয়া 'পরে ভক্তি অর্জ্জন করিব', তাহা মনে করিয়া ভেক-ধারণরূপ বৈরাগ্যলিঙ্গ গ্রহণ করেন। ইহা তাঁহাদের ভ্রম, যেহেতু ঐ বৈরাগ্য স্বভাব হইতে উদিত হয় নাই, কেবল কোন ক্ষণিক চিন্তা বা বিরাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলে ঐ বৈরাগ্য কয়েকদিবসের মধ্যেই উৎসন্ন হয় এবং তদ্‌গ্রহীতাকে কদাচারে ও ইন্দ্রিয়পরতায় নিক্ষেপ করে। বৈরাগ্যের অধিকারই আচার-প্রবর্ত্তনের যোগ্য-হেতু। স্বীয় স্বীয় অধিকারে যেই যেই আচার নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সেই আচারই সেই সেই লোকের পক্ষে সদাচার। অধিকার বিচার

না করিয়া অনধিকারগত আচার স্বীকার করিলে জগতের ও নিজের প্রকৃত অনিষ্ট ঘটে। কোন কোন লোক ভ্রম-ক্রমে, কেহ কেহ বা ধূর্ত্ততা-সহকারে উচ্চাধিকারযোগ্য না হইয়াও সেই অধিকারের কার্য্যসকল করিতে থাকেন, তদ্দ্বারা ক্রমশঃ জগন্নাশ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের নামে অসদাচার প্রচার করাই অনেকস্থলে দৃষ্টি করা যায়। ভক্তি সন্ন্যাসিদিগের বর্ণাশ্রম-লোপরূপ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন এবং নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা, দরবেশ, কুম্ভপটিয়া, অতিবাড়ী, স্বেচ্ছাচারী ভক্তি ব্রহ্মবাদীদিগের বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ চেষ্টাসকল অত্যন্ত অহিতকর। ঐ সমস্ত কার্য্যদ্বারা তাহারা যে পাপ প্রচলিত করে, তাহা জগন্নাশকার্য-বিশেষ। সহজিয়া, নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতির যে অবৈধ স্ত্রীসংসর্গ সর্ব্বদা লক্ষিত হয়, তাহা নিতান্ত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। রাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যতপ্রকার অন্যায়যুদ্ধ হয়, সেই-সমুদয় অধর্ম্ম ও জগন্নাশকার্য্যবিশেষ। নিতান্ত ন্যায়যুদ্ধ ব্যতীত ধর্ম্মশাস্ত্রে অন্য যুদ্ধ বিহিত হয় নাই। অর্থ, ক্ষমতা, সময়, সামগ্রী ন্যায়পূর্ব্বক ব্যয় করাই বিধি। অন্যায়রূপে ব্যয় করিলে অপচয়রূপ পাপ ঘটে। পাত্রের গুরুত্তা-লঘুতাক্রমে সকল পাপে গুরুতা-লঘুতা সংযুক্ত হয়। গুরুতা ও লঘুতা-অনুসারে পাপ, পাতক, অতিপাতক ও মহাপাতক-প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়। সাধু ও ঈশ্বরের প্রতি কৃত হইলে তাহাদিগকে অপরাধ বলে। অপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও বর্জ্জনীয়।" (শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২।৫)

সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ভক্তি ও অধিকার-বিচার

অনেকে বলেন—'কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগমার্গে অধিকার-নির্ণয়ের

প্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্তু ভক্তিতে নরমাত্রেরই অধিকার। সুতরাং ভক্তির অনুশীলন করিবার সময় অধিকার-নির্ণয়ের কোনই আবশ্যকতা নাই।'

যাঁহারা "ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা"—এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ঐরূপ বিচার করেন, তাঁহাদের ঐ স্বকপোল-কল্পিত মতবাদ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীজীব-প্রভু বলেন,—

"শ্রীভগবান্ মনুষ্যগণের শ্রেয়োবিধান-কামনায় কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—এই ত্রিবিধ যোগের কথা বলিয়াছেন; তন্মধ্যে কে কোন্ যোগের অধিকারী, তাহাও নির্ণয় করিয়াছেন।" (ভঃ সঃ ১৭০-১৭১ অনুচ্ছেদ)

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥

(ভাঃ ১১।২০।৬)

যোগা উপায়াঃ; ময়া শাস্ত্রযোনিনা শ্রেয়াংসি মুক্তি-ত্রিবর্গ-প্রেমাণি, অনেন ভক্তেঃ কর্ম্মত্বঞ্চ ব্যাবৃত্তম্।

* * *

তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥"

(ভাঃ ১১।২০।৭)

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—শাস্ত্রযোনি আমাদ্বারা মনুষ্যগণের মঙ্গল অর্থাৎ মুক্তিরূপ মঙ্গল, ধর্ম্মার্থকাম—এই ত্রিবর্গ-লাভরূপ মঙ্গল ও

বিমুক্তি বা ভগবৎপ্রীতিরূপ মঙ্গলের বিধান-কামনায় যথাক্রমে জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগরূপ ত্রিবিধ যোগ কথিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই। ভক্তি ক্রিয়ারূপা হইলেও কর্ম্মের পৃথগ্‌রূপে উল্লেখ থাকায় ভক্তির কর্ম্মত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে।

যাহারা কামী অর্থাৎ গৃহাশ্রমের কর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ এবং দেহ-গেহ-স্ত্রী-পুত্রাদিতে অতিশয় আসক্ত, সেইরূপ বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্ম্মযোগই (কর্ম্মার্পণই) সিদ্ধিপ্রদ।

যাহারা এইরূপ কর্মফলকামী, **সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে কখনও কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দেওয়া উচিত নহে** এবং তাহারা **যাহাতে বিহিত কর্ম্মের আচরণ করিয়া তাহার ফল শ্রীভগবানে সমর্পণের দ্বারা কর্মযোগী হইতে পারে, তদ্বিষয়ে উপদেশ** করা কর্ত্তব্য।

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥"
(গীঃ ৩।২৬)

অজ্ঞ—অতএব কর্ম্মাসক্তদিগের কর্ম্ম হইতে বুদ্ধিচাঞ্চল্য অর্থাৎ তাহাদের কর্ম্মত্যাগে প্রবৃত্তির উদয় করাইবে না। পরন্তু নিবিষ্ট হইয়া স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে। অজ্ঞগণের বুদ্ধিকে বিচলিত করিলে কর্ম্মসমূহে শ্রদ্ধা হ্রাস পাইবে, আবার জ্ঞানেরও উৎপত্তি হইবে না, অতএব উভয়তঃ তাহারা ভ্রষ্ট

হইবে।

জীব যতদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞ থাকিবে, অর্থাৎ **শ্রীভগবানের কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে 'জ্ঞা' অর্থাৎ শ্রদ্ধা বা দৃঢ়বিশ্বাস লাভ না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। যাহার 'জ্ঞা' অর্থাৎ শ্রীহরিকথায় দৃঢ়বিশ্বাস নাই, সে ব্যক্তিই অজ্ঞ।** সেইরূপ যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া ব্রহ্মার (পরমেষ্ঠীর) সুখ পর্য্যন্ত ভোগে বিরক্ত নহে, তাহাকেও অবশ্যই কর্ম্ম করিতে হইবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

(ভাঃ ১১।২০।৯)

হে উদ্ধব! যেইকাল পর্য্যন্ত জ্ঞানীর পারমেষ্ঠ্য-সুখাদিতে নির্ব্বেদ অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর-বুদ্ধির উদয় না হয়, সেইকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর কর্ম্ম করিতে হইবে; আর **আমার কথার প্রতি যেইকাল-পর্য্যন্ত আকস্মিক মহৎকৃপাজনিত-শ্রদ্ধা উদিত না হয়** অর্থাৎ 'ভগবৎকথা-শ্রবণাদি-দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে'—এই দৃঢ় বিশ্বাস যেইকাল পর্য্যন্ত জীবের না হয়, **সেইকাল পর্য্যন্তও কর্ম্ম (কর্ম্মার্পণ) করিতে হইবে।**

বেদোক্ত কর্ম্মই করিবে, কখনও বেদনিষিদ্ধ কর্ম্ম করিবে না এবং সেই বেদবিহিত কর্ম্মও **শ্রীভগবানে তৎফলার্পণ পূর্ব্বক** অনুষ্ঠান করিলে কর্ম্মবন্ধনশূন্য ঐহিক ও পারত্রিক ভোগে বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য জন্মিবে।

নিষ্কামভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা পারলৌকিক ভোগসুখে যে নির্ব্বেদ লাভ করে, তাহা কিন্তু বহুকাল বিলম্বে ঘটিয়া থাকে; পরন্তু যে ব্যক্তি অতি সত্বর সর্ব্ববর্ণাশ্রম ও তত্নপলক্ষিত জ্ঞানের পরিণাম-ফললাভের চরমফলস্বরূপ হৃদয়গ্রন্থিচ্ছেদন ইচ্ছা করেন, তিনি অন্য সমস্ত কর্ম্মই স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চরাত্রকথিত ও বেদোক্তবিধি-অনুসারে শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার সহিত শ্রীকেশবদেব অর্থাৎ চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণুর কেবল অর্চ্চন করিবেন। যাঁহারা শুদ্ধ বা কেবল অর্চ্চনে অধিকারী নহেন, তাঁহারা কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চন করিবেন। যাঁহারা একান্তভাবে নিরপেক্ষ অর্থাৎ নিষ্কাম ফলান্তর-কামনাহীন ও বর্ণাশ্রমের কর্ম্মসমূহ স্বরূপতঃ পরিত্যাগকারী—শাস্ত্রীয়-নির্গুণ-শ্রদ্ধাযুক্ত, তাঁহারাই চতুর্ভুজ মহাপুরুষের শুদ্ধ অর্চ্চনের অধিকারী, কিন্তু যাঁহাদের অতিশয় ব্যবহার-চেষ্টা আছে অর্থাৎ যাঁহারা স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-বন্ধু-সমাজ-প্রভৃতির সহিত ব্যবহারিকতায় আসক্ত, আঠার প্রকার বিবাদ (ব্যবহার)—ঋণদানাদি বিষয়-রক্ষণ-কৌশল বা মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতির দ্বারা বিষয়রক্ষায় নিপুণ এবং যাঁহারা স্বেচ্ছাচারমূলা লোক-পরম্পরাগতা শ্রদ্ধা-যুক্ত অর্থাৎ অন্য লোকের দেখাদেখি যাঁহাদের শ্রীভগবানে লৌকিক আদরমাত্র আছে, বস্তুতঃ তাঁহারা ভক্তি-ভক্ত-মহিম-জ্ঞানহীন এবং সবেমাত্র ভক্তিতে প্রবৃত্ত—এইরূপ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরত, লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত, কনিষ্ঠাধিকারী স্ত্রীপুরুষগণের পক্ষে কর্ম্মমিশ্র ভক্তিতে অর্চ্চনই ক্রমিক-মঙ্গলের উপায়।

'আমি ও আমার'-বুদ্ধি যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ উক্ত

কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চন করিতেই হইবে এবং 'সমস্তই শ্রীবিষ্ণুর জীব ও শ্রীবিষ্ণু-কর্তৃক চালিত হইয়াই আমার নিকট আসিয়াছে'—এই বুদ্ধি থাকিবে। চেতনের বিকাশানুযায়ী সকলকেই মান ও দান দিতে হইবে এবং ইহার ফল—মুক্তি। প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, জ্ঞানী, ভক্ত বা পরমহংস উত্তরোত্তর মান ও দানের শ্রেষ্ঠ পাত্র। পরমহংসের মধ্যে ব্রহ্মানুভবীই—আদি-পরমহংস, আর ভগবদনুভবীই—অন্ত্য পরমহংস। সুদুর্ল্লভ ভাগ্য-ক্রমে ইহাকে প্রাপ্ত হইলে নিজের কোন 'স্বত্বগ্রহ' (ভাঃ ৭।১৪।১১) না রাখিয়া সব ছাড়িয়া দিতে হইবে। জীব স্বতন্ত্রভাবে কামনা-বাসনা বা ইচ্ছা করিলে জীবের অমঙ্গল অনিবার্য্য। তজ্জন্য প্রথমে নিজ-বাসনা ত্যাগ করিয়া কামদেব শ্রীভগবানের সুখ-কামনার চিন্তা বা অনুসন্ধান আবশ্যক। এই কর্ম্মফলত্যাগই—সন্ন্যাস। ইহাই কর্ম্মযোগ, কর্ম্মার্পণ বা সাত্ত্বিকী ভক্তি।

অতএব নৃমাত্রেরই ভক্তিতে অধিকার আছে বলিয়া অশ্রদ্ধালু বা কপটী কখনও ভক্তির অধিকারী নহে, শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত হইতে ইহাই প্রমাণিত হইল। অন্ততঃ লৌকিক-শ্রদ্ধা না থাকিলে ভক্তিপ্রকৃতি আরম্ভই হইবে না।

ভণ্ডামি ভক্তি নহে

যে শ্রীহরিকথায় শ্রদ্ধা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম-ত্যাগের হেতু বলিয়া শ্রীভগবান্ "মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে" শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা শ্রদ্ধার ভান নহে। শরণাগতির ভান বা অভিনয় কিন্তু কর্ম্মত্যাগের হেতুরূপা শরণাগতিও নহে। কোনও

উপদেশক যদি ঐ সকল ভানকারীর প্রকৃত অধিকার বিচার না করিয়া তাহাদিগকে কৃত্রিমভাবে কর্ম্ম-ত্যাগের উপদেশ ও কেবলা ভক্তির (?) শিক্ষা প্রদান করেন, তবে নিশ্চয়ই ঐ সকল মর্কটতুল্য আনু-করণিক ব্যক্তিগণ ভক্তি-মুক্তাফলকে বদরী ভাবিয়া দন্তদ্বারা নিষ্পেষণ করিবার চেষ্টা করিবে এবং অচিরে উহাকে দূরে নিক্ষেপ করিবে।

'ভক্তিতে কর্ম্ম'জ্ঞানাদির মত যোগ্যতা বা অধিকার-বিচার নাই' —এই সিদ্ধান্তকে বিকৃতভাবে অপরিপক্ক মস্তিষ্কে বুঝিতে গিয়া ভক্তিযাজনের নামে বহু জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হইয়াছে। তামসিকী ও রাজসিকী প্রকৃতির ব্যক্তিগণ কেবলা ভক্তির সর্ব্বোচ্চ-স্তরের কথা শ্রবণ করিয়া অধিকার-বিচারহীন হইয়া যে তামসিকী ও রাজসিকী ভক্তির দম্ভ প্রকাশ করে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে। সদ্বৈদ্য ঔষধ ও পথ্য-নির্ব্বাচনে সর্ব্বদাই অধিকার বিচার করেন। এইখানেই অর্দ্ধ চিকিৎসক বা হাতুড়িয়া চিকিৎসকের সহিত সদ্বৈদ্যের পার্থক্য। 'টাইফয়েড' জ্বর-বিরামের পর যখন রোগী ক্রমশঃ সুস্থতার দিকে যায়, তখন তাহার শরীরের পুনর্গঠনের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে। বাদাম, পেস্তা, ঘৃত, পুষ্পান্ন, সোহান-হালুয়া, নানাপ্রকার বোম্বাই মিঠাই, পায়সান্ন ও ক্ষীর অতীব পুষ্টিকর খাদ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু জ্বর-বিরামের সঙ্গে-সঙ্গেই যদি ঐ সকল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনিবার্য্যরূপে হিতে বিপরীত ফলই ফলিবে। দৈহিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উক্ত রোগীকে হয়-ত ৫।৬ মাস বা তদধিককাল পরে ক্রমে ক্রমে নিয়মিত পরিমাণে সেই

পুষ্পান্ন, বাদাম, পেস্তা খাওয়ান যাইতে পারে এবং সেই উপযুক্ত সময়েই ঐ সকল পুষ্টিকর দ্রব্য তাহার পক্ষে আদর্শ পথ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু রোগ সারিবার পরদিনই পুষ্পান্ন, সোহান-হালুয়া, বাদাম বা পেস্তা খাওয়াইলে পুষ্টি হওয়া দূরে থাকুক, রোগী সদ্যসদ্য মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তৎপূর্ব্বে রোগীকে বহুদিন গ্লুকোজ, মিছরির পানা, কমলালেবুর রস (তাহাও যতটুকু পরিমাণ সহ্য হয়, সেই পরিমাণে), ভাতের মণ্ড, শুক্তোর রস, জলমিশ্রিত দুগ্ধ-প্রভৃতি তরল পথ্য প্রদান করিতে করিতে ধীরে ধীরে উপযুক্ত সময়ে পথ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিতে হইবে।

কোন ব্যক্তি সুস্থাবস্থায় দুই মণ বোঝা বহন করিতে পারে; কিন্তু তাহার বিসূচিকা ব্যাধি হইলে সেইদিন বা ঐ ব্যাধি উপশমের এক সপ্তাহের মধ্যে যদি তাহার মস্তকে দুই মণের একটি বোঝা দিয়া তাহাকে কশাঘাত করা যায়, তবে কি সে জীবনে আর কোনও দিন পূর্ব্ববল লাভ করিতে পারিবে? তাহাকে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিতে করিতে বলবৃদ্ধির সহায়তা করিলে সে পুনরায় দুই-তিন মণ বোঝা অনায়াসে বহন করিবে।

ভক্তিরাজ্যে ক্রমবিপর্য্যয়ে বিপৎ

ভক্তিরাজ্যেও সেইরূপ ভক্তিসাধক শ্রীভাগবতধর্ম্মের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া জানিতে পারিলেন—'রাগানুগা ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; শ্রীব্রজগোপীগণের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণভজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; গেহপরিজন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীব্রজধামে শ্রীশ্রীরূপসনাতনের পদাঙ্কানুসরণে এক-এক বৃক্ষের তলে এক-এক-দিন বাস করিয়া হরিভজনই কাম্য; এই

জীবনেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলসেবা-প্রাপ্তি জীবের একমাত্র প্রয়োজন।' এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সাধক এক লম্ফে চতুর্দ্দশ ভুবন, বিরজা, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের মধ্যে শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীগোবর্দ্ধন—সমস্ত অতিক্রম করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবালাভের আকাঙ্ক্ষায় যদি বাক্য-বাগীশতার প্রদর্শনী উন্মোচন করেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অধিকারে অবস্থিত ব্যক্তিগণের অধিকার অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদিগকেও রাতারাতি শ্রীরাধাকুণ্ডে আনয়ন করিবার জন্য প্রচার আরম্ভ করেন, তাহা হইলেই কি তাঁহার শ্রীরাধাকুণ্ডের ভজন বা শ্রীরাগানুগা ভক্তিতে প্রবেশ-লাভ ঘটিবে? সাধক বিভিন্ন যোগ্যতা বা অধিকারকে অগ্রাহ্য করিয়া একদিনেই কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারে উপনীত হইতে পারেন? অথবা শরণাগতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিতে পারিলেই কি শরণাগত হওয়া যায়? তবে কেন শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু সাধুগণের প্রভাব বা চিদ্বল ও সাধকের প্রভাব বা চিদ্‌বল্, সাধুর কৃপাশক্তিসঞ্চার-সামর্থ্য ও তদনুযায়ী সাধকের কৃপাশক্তিবরণ-যোগ্যতা, সাধুর স্বরূপগত ও পরিমাণগত ভক্তি-বাসনা-ভেদ এবং সাধকের স্বরূপগত ও পরিমাণগত ভক্তিবাসনা-ভেদ-অনুযায়ী শীঘ্র বা বিলম্বে— বিদ্যুদ্‌গতিতে বা শম্বূকের গতিতে ফলপ্রাপ্তি এবং ফলের মধ্যে আবার বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন পরিমাণের ফল-প্রাপ্তির কথা জ্ঞাপন করিলেন? যদি একদিনেই সকল অধিকারীরই একই প্রকার ফল-প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইত, তাহা হইলে শ্রীরূপানুগবর এইরূপ বিচার করিতেন না। বিদ্যুদ্‌গতিতে

সকলেই চলিতে পারিলে বৈধী ভক্তির ক্রমিক বিধান থাকিত না।

পৃথিবীর সকলেরই বা সাধকগণের মধ্যেও সকলের একই প্রকার অধিকার নাই, সুতরাং সকলকেই একই গণ্ডির মধ্যে আনয়ন করিয়া একই প্রকার ঔষধ ও পথ্য একই পরিমাণে দিয়া চিকিৎসা করিলে হিতে বিপরীত ফল হয়। এইখানে কেহ কেহ বলেন—'ভক্তিরাজ্যে ত একমাত্র ঔষধ শ্রীহরিনাম ও একমাত্র পথ্য শ্রীমহাপ্রসাদ; সুতরাং সকলকেই এক হাসপাতালের একই ওয়ার্ডের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া সেই দুইটি পেটেন্ট্ ঔষধ ও পথ্য একই পরিমাণে প্রদান করিলে কেনই বা রোগ না সারিবে? যদি না সারে, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিধান ত' মিথ্যা হইয়া যায়।'

এই যুক্তির মধ্যে যে হেত্বাভাস রহিয়াছে, তাহা আমরা অনেকেই প্রণিধান করি না। ঔষধ ও পথ্য একমাত্র শ্রীহরিনাম ও শ্রীমহাপ্রসাদ হইলেও অশ্রদ্ধালু, অপরাধী, কুটিল ব্যক্তিগণের নিকট সেই ঔষধ ও পথ্য আবরণযুক্তই থাকে। অশ্রদ্ধা, কুটিলতা ও অপরাধেরও আবার বিভিন্ন তারতম্য আছে। সকলকে এক হাসপাতালের একই ওয়ার্ডে রাখিলেও পাশাপাশিই কেহ হয়-ত শুদ্ধসত্ত্ব, কেহ হয়-ত সাত্ত্বিক-প্রকৃতিবিশিষ্ট, কেহ বা রাজসিক, কেহ বা তামসিক চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট থাকিতে পারে, সুতরাং তাহাদিগকে সমমাত্রায়ই একই প্রকার পেটেন্ট, ঔষধ ও পথ্য দেওয়া যাইতে পারে না। যাহার চিত্তবৃত্তিতে কর্ম্মবাসনার ঊর্ম্মি রহিয়াছে, তাহাকে শ্রীহরিনাম-প্রদানের অভিনয় করিলেও তাহার শ্রীহরিনামে শ্রদ্ধা ও রুচি হয় না।

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥"

যিনি পূর্ব্বে পূর্ব্বে শত শত জন্মে শ্রীবাসুদেবের কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চন করিয়া শ্রীনামে রুচিবিশিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারই মুখে সর্ব্বদা শ্রীহরি-নাম নৃত্য করেন।

কোথায়, এইখানে একদিনে বা এক জন্মেই যে সকলেরই শ্রীহরিনামে রুচি হইবে, শাস্ত্র এরূপ ত' বলিলেন না? কোন কোন অধিকারে শ্রীহরিনামে রুচি হইতে শত শত জন্মের প্রয়োজন হয়। সেই শত শত জন্মে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় ঔষধ ও পথ্য ব্যবহার করিতে হয়।

কোন কোন ব্যক্তির কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চন বা কর্ম্মার্পণের দ্বারা মঙ্গল হয়, আবার এমন কোন পশুবৎ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিও থাকিতে পারে, যাহাকে ঐ সত্ত্বরূপ হাসপাতালে রাখিলে বা তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস-আশ্রমে দীক্ষিত করিলে সেই ব্যক্তি অবৈধভাবে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইবে; আর যদি তাহাতে কৃত্রিমভাবে বাধা দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিবে। সেইরূপ ব্যক্তিকে শাসন-তরবারির নিম্নেও অধিক সময় রাখা যায় না। ইহারা হরিকথায় রুচির অভিনয় দেখাইলেও—ভক্তির অধিকারের অভিনয় দেখাইলেও মঠবাস বা ব্রহ্মচর্য্য-বান-প্রস্থাদি আশ্রমের বেষ পরিধান করিলেও তাহারা 'রতিমঞ্জরী' নামক কামশাস্ত্রের বিশ্লেষণানুসারে শশক, মৃগ, বৃষ ও অশ্বজাতীয় অথবা

শ্রীমদ্ভাগবতের বিশ্লেষণানুযায়ী কুকুর, গর্দ্দভ, ছাগল, শূকর ও বানর জাতীয়। ইহাদিগকে স্বভাববিহিত ধর্ম্মাচরণ করাইয়া ক্রমে ক্রমে বিরাগযুক্ত হইবার কথাই শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠিরের নিকট উপদেশ করিয়াছেন। প্রবৃত্তির উন্মাদনায় উন্মত্ত ব্যক্তির নিকট নির্ব্বেদের উপদেশ বা ঐকান্তিকী হরিভক্তির কথা বলিলে তাহা ব্যর্থ হয়। উপদেষ্টারও অশ্রদ্দধানে উপদেশদানজন্য প্রত্যবায় ঘটে।

স্বভাববিহিত ধর্ম্ম ই মঙ্গলজনক

শ্রীনারদ বলিতেছেন (ভা ৭।১১।৩১-৩৪),—

"প্রায়ঃ স্বভাববিহিতো নৃণাং ধর্ম্মো যুগে যুগে।
বেদদৃগ্‌ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ শর্ম্মকৃৎ॥"

হে রাজন্, বেদদৃগ্‌গণ যুগে যুগে প্রায় স্বভাববিহিত ধর্ম্মকেই ইহলোকে ও পরলোকে মঙ্গলজনক বলেন।

"বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ॥"

স্বভাবকৃত-বৃত্তির সহিত বর্ত্তমান স্বধর্ম্মাচারী ধীরে ধীরে আপনার স্বভাবজাত কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিষ্কাম-ভাব প্রাপ্ত হন।

"উপ্যমানং মুহুঃ ক্ষেত্রং স্বয়ং নির্বীর্য্যতামিয়াৎ।
ন কল্পতে পুনঃ সূত্যৈ উপ্তং বীজঞ্চ নশ্যতি॥
এবং কামাশয়ং চিত্তং কামানামতিসেবয়া।
বিরজ্যেত যথা রাজন্নাগ্নিবৎ কামবিন্দুভিঃ॥"

হে রাজন্, বারংবার বীজবপনে ক্ষেত্র নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে এবং পুনরায় শস্যোৎপাদনে অসমর্থ হয় এবং কদাচিৎ উপ্ত বীজও নষ্ট

হইয়া যায়। ঘৃতবিন্দুসমূহদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত না হইলেও প্রচুর ঘৃতনিক্ষেপফলেই যেমন নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ **কামসকলের অতি সেবা-দ্বারা কামাশয়চিত্ত অবশেষে বিরক্ত হয়।**

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—"**উৎকট-বাসনাবিশিষ্টস্য সহসৈব কামত্যাগাসম্ভবাদ**, বেদোক্ত-নিয়মেন বহুশঃ কামান্ ভূঞ্জানৈস্তৈবং নিত্যনৈমিত্তিকৈর্বিশুদ্ধ-চেতসস্তদ্দোষদর্শনেন **যযাতি-সৌভরিপ্রমুখানামিব শনৈর্বিরাগো ভবতি।** যথা সবীর্য্যং ক্ষেত্রং নির্বীর্য্যং শনৈর্ভবতি, যথা চ প্রজ্বলিতোঽগ্নির্ন ঘৃতবিন্দু-ভিঃ শাম্যতি, **মহতা ঘৃতপূরেণ তু শাম্যতেব,** তদ্বৎ। প্রহ্লাদকৃত-স্তুতৌ কৌমার এব নিবৃত্ত্যুপদেশো মন্দবাসনানামধিকারেণ, তদুক্তং তত্রৈব —'বালা অদূষিতধিয়ো দ্বন্দ্বারামেরিতেহিতৈঃ' ইতি। অতঃ সর্ব্বমনবদ্যম্।"

তাৎপর্য্য এই যে, উৎকট কামনাযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সহসা কাম-ত্যাগ অসম্ভব বলিয়া বেদবিহিত নিয়মে বহু প্রকারে কামসমূহ ভোগ করিতে করিতে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য কর্ম্মসমূহের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ঐ সকল কর্ম্মের দোষদর্শনে যযাতি-সৌভরি-প্রমুখ ব্যক্তিগণের ন্যায় ধীরে ধীরে কামের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয়। যেরূপ সবীর্য্য ক্ষেত্রে বীর্য্য সেক করিতে করিতে ধীরে ধীরে উহা নির্ব্বীর্য্য হয়, প্রজ্বলিত অগ্নিতে বিন্দু বিন্দু পরিমাণে ঘৃত-আহুতি দিলে অগ্নির বেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, প্রশমিত হয় না, কিন্তু যদি প্রচুর পরিমাণে ঘৃত নিক্ষেপ করা হয়, তাহা হইলে যেরূপ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রচুর পরিমাণে কামোপভোগ করিয়া উৎকট কামুকগণ নির্ব্বেদ

লাভ করে ; তবে সেই কামোপভোগ শাস্ত্রীয় প্রণালীতে হওয়া চাই, যেমন যযাতি-সৌভরি-প্রভৃতির উদাহরণে দৃষ্ট হয় ; অশাস্ত্রীয়ভাবে কামভোগ বা অবৈধ কামভোগের দ্বারা কামের তৃপ্তি হয় না বা যথার্থ স্থায়ী নির্ব্বেদ আসে না।

এইখানে প্রশ্ন হইতে পারে—তবে কেন শ্রীপ্রহ্লাদ কৌমার-কালেই অসুর-বালক-নির্ব্বিশেষে নিবৃত্তির উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন? যাহাদের পিতা-মাতা অসুর-অসুরী, সেই সকল বালকদের মধ্যে কি উৎকট কাম লুক্কায়িত ছিল না? তদুত্তরে বলিতেছেন,—যাহাদের কামের প্রকোপ মন্দীভূত, সেইরূপ অধিকারী ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ নিবৃত্তির উপদেশ দিয়াছিলেন।

অসুর বালকগণের বাসনা মন্দীভূত ; ইহা কি স্বকপোল-কল্পনা নহে? তদুত্তরে বলিতেছেন,—না। শ্রীমদ্ভাগবতই সেই অসুর বালকগণের স্বভাব নিম্নলিখিত শ্লোকে অর্থাৎ "কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভগবতানিহ" শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্ব-শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"তে তু তদ্গৌরবাৎ সর্ব্বে ত্যক্তক্রীড়াপরিচ্ছদাঃ।
বালা অদূষিতধিয়ো দ্বন্দ্বারামেরিতেহিতৈঃ॥"

(ভাঃ ৭।৫।৫৬)

একদিকে মহাভাগবতবর শ্রীপ্রহ্লাদের প্রভাব অর্থাৎ শক্তি-সঞ্চার-সামর্থ্য, আর একদিকে সেই সকল অসুর বালকগণ সুখদুঃখ-দ্বন্দ্বাসক্ত ব্যক্তিগণের উপদেশের দ্বারা অদূষিতান্তঃকরণ থাকায় তাঁহারা শ্রীপ্রহ্লাদে গৌরববুদ্ধি-হেতু ক্রীড়াপরিচ্ছদাদি ত্যাগ করিয়াছিলেন

এবং মহাভাগবতবর শ্রীপ্রহ্লাদে চিত্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপ অদূষিতচিত্ত নিরপরাধ বালকগণকে শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীভাগবত-ধর্ম্মের অধিকারী জানিয়া নিবৃত্তির উপদেশ দিয়াছিলেন।

প্রশ্ন হইতে পারে,—বালকগণ হিতাহিত-বিচারশূন্য, অনুকরণ-প্রিয়, সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশে ঐরূপ খেলাধূলা পরিত্যাগ করিয়াছিল। এইজগতেও অনেক নবীন সাধককে এইরূপ শ্মশানবৈরাগ্যে উন্মত্ত হইতে দেখা যায়, সুতরাং তাহা কিরূপে নিবৃত্তিপর উপদেশ-শ্রবণের অধিকার হইতে পারে? তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, বালকগণ যদি সাময়িক উচ্ছ্বাসে ক্রীড়াপরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ করিয়া সাধু সাজিতেন, তবে তাহাদের সম্বন্ধে শ্রীভগবৎপার্ষদ শ্রীনারদ বলিতেন না,—

"অথ দৈত্যসুতাঃ সর্ব্বে শ্রুত্বা তদনুবর্ণিতম্।
জগৃহুর্নিরবদ্যত্বান্নৈব গুর্ব্বনুশিক্ষিতম্॥
অথাচার্য্যসুতস্তেষাং বুদ্ধিমেকান্তসংস্থিতাম্।
আলক্ষ্য ভীতস্ত্বরিতো রাজ্ঞ আবেদয়দ্‌যথা॥"

(ভাঃ ৭৮১১-২)

দৈত্যবালকগণ সকলেই শ্রীপ্রহ্লাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া উৎকৃষ্টবোধে তাহা গ্রহণ করিয়াছিল এবং শ্রীপ্রহ্লাদের সঙ্গক্রমে দৈত্য-বালকগণের বুদ্ধি শ্রীবিষ্ণুতে অচলা হইয়াছিল। যাহারা সাময়িক উচ্ছ্বাসে বিরাগযুক্ত হয়, তাহাদের বুদ্ধি কখনও শ্রীভগবানে **'একান্ত সংস্থিতা'** হইতে পারে না। অতএব শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্য বালকগণকে অধিকারী দেখিয়া বা সঙ্গপ্রভাবে অধিকারী

করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন এবং শ্রীপ্রহ্লাদের কৃপা তাহাদের প্রতি ব্যর্থ হয় নাই; তাহাদের সকলেরই শ্রীভগবানে একান্ত নিষ্ঠা হইয়াছিল।

কোন বালক হয়-ত সাময়িক উচ্ছ্বাসে 'সাধুসঙ্গে থাকিব, হরি-ভজন করিব ও মাতাপিতার নিকট আর যাইব না, কারণ তথায় নানাপ্রকার অভাব-অশান্তি বা বাধ্যবাধকতা আছে'—এইরূপ প্রচ্ছন্ন চিন্তাস্রোতঃ লইয়া মাতাপিতা বা গৃহ ত্যাগ করিল। বালকের সেই সাময়িক নবীন উচ্ছ্বাসকেই যদি তাহার সংসারত্যাগের অধিকার বিচার করিয়া সেই বালককে সংসারবিরাগী সাজাইয়া দেওয়া হয় এবং যাহাতে মায়ার চর মাতাপিতার সহিত কোনরূপ সংস্পর্শ না হয়, তজ্জন্য কৃত্রিম কৌশলে লুকাইয়া রাখা হয় ও স্বজনাখ্য-দস্যুগণের প্রতি বালকের সাময়িক বিরাগ উৎপাদন করিয়া দিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলেও যতদিন পর্য্যন্ত না বালকের নিত্য স্বভাব বা অধিকারের উদয় হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ঐরূপ কৃত্রিমপন্থা একবৎসর, দুইবৎসর বা দশ-বিশ বৎসর পরে নিশ্চয়ই একটী উৎপাত সৃষ্টি করিয়া ফেলিবে। মাতাপিতার নিকট 'ছেলেধরা-সম্প্রদায়' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াও ছেলেকে অনেকদিন ধরিয়া রাখা যাইবে না। এইরূপ বহু বালক, যুবক ও বৃদ্ধকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—যাহারা পূর্ব্বে লুকাইয়া থাকিবার জন্য যত্ন করিয়াছিল, পরে তাহারাই মাতাপিতা, স্ত্রী-পুত্র বা দৈহিক আত্মীয়স্বজনের নিকট ধরা দিবার জন্য অর্থাৎ সাধুদের 'খোঁয়াড়' (?) হইতে ছুটি পাইবার জন্য শতগুণ অধিক যত্ন, কৌশল ও উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। পূর্ব্বে যে বালক মাতাপিতা

বা আত্মীয়-স্বজনকে দেখিলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিত অথবা "তোমরা
কে? তোমাদিগকে চিনি না; আমি বহুজন্মে কত মাতাপিতা
পাইয়াছি, কাহারও কোন সন্ধান রাখি না, তোমরা কোন্ চক্ষুর দ্বারা
আমাকে দেখিবে? তোমরা চামার (অর্থাৎ চর্ম্ম বা দেহের প্রতি
আসক্ত), আমি চামারের দলে আর মিশিব না"—এই সকল তত্ত্ব-
কথা (?) বলিত সেই বালক কিছুদিন পরে, এমন কি, বিশ-পঁচিশ বা
ত্রিশ বৎসর পরে চামারের দলে মিশিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।
এই সকলের মূল কারণ কি? অধিকার—লঙ্ঘনই—মূল কারণ।
মাতাপিতাকে কৃত্রিমভাবে 'স্বজনাখ্যদস্যু' বলিতে শিক্ষা করিয়া অনেক
পুত্র বৈধ ও অবৈধ কামে বা নিজ-দেহারামতার প্রতি আসক্ত
হইয়াছে। কেহ কেহ 'ভোগী' হইতে সাময়িক উচ্ছ্বাসে 'ত্যাগী'
সাজিয়া বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল, পরে স্ত্রীর নিকট অভিগমন
করিয়া সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম হইয়াছে।

কেহ কেহ যুক্তি প্রদর্শন করেন,—'এইরূপ দশ-বিশজন
বালকের মধ্যেও যদি দুই-চারি জন বালকের মঙ্গল হয়, তবুও ত'
লাভ।' কিন্তু শাস্ত্র বলেন—অধিকার লঙ্ঘন করিয়া কোনও সাধারণ
সাধক-জীবের কখনও মঙ্গল হইতে পারে না। পঞ্চাশ বৎসর পরেও
তাহাদের কাপট্য বা প্রচ্ছন্ন অন্যাভিলাষ প্রকাশিত হইয়া পড়ে;
ইহার বহু বহু প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

লোকশিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরূপ রঘুনাথাদি গোস্বামি-
বৃন্দ এইরূপ কৃত্রিমপন্থাকে প্রশ্রয় দেন নাই, বরং ইহা সর্ব্বতোভাবে

গর্হণ করিয়াছেন। সাধকের লীলাভিনয়কারী নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথদাস-প্রভুর দ্বারা শ্রীমন্-মহাপ্রভু ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথকে বলিতেছেন,—

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥
মর্কটবৈরাগ্য না কর' লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৩৭-৩৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, তখন সেই স্থানের কূর্ম্মনামক এক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচুর কৃপাশক্তি-সঞ্চারিত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরির প্রতি কূর্ম্মবিপ্রের স্বভাবতঃই পরমেশ্বর-বুদ্ধি হইয়াছিল। গৃহস্থ কূর্ম্মবিপ্র গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমন করিতে ইচ্ছুক হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু কূর্ম্মবিপ্রকে বলিলেন (চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৭-২৯),—

* * **"ঐছে বাত্ কভু না কহিবা।**
গৃহে রহি' কৃষ্ণনাম নিরন্তর লইবা ॥
যা'রে দেখ, তা'রে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥"

কূর্ম্মবিপ্র শ্রীগৌরহরির অনুব্রজ্যা করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিলে—

"প্রভু তাঁ'রে যত্ন করি' ঘরে পাঠাইলা ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ৭।১৩৫)

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল। ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥" "ঐছে বাত্ কভু না কহিবা", "যত্ন করি' ঘরে পাঠাইল"—এই সকল উক্তির মধ্যে যে কতটা চিদ্-বৈজ্ঞানিক মহাসত্য ও লোকশিক্ষকের প্রবীণতা নিহিত রহিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। **যাঁহারা নবীন উপাসক, যাঁহারা অপরিপক্ক, যাঁহারা সাময়িক উচ্ছ্বাসপ্রবণ বা যাঁহারা কৃত্রিমপন্থায় দলপুষ্টির জন্যই ব্যস্ত** তাঁহারা এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি প্রথমমুখে বুঝিতে পারেন না, ক্রমে ক্রমে ঠেকিয়া শিখেন। সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা বৈরাগ্যের ধ্বজা ধারণ করেন বা অপরের হস্তে তাহা প্রদান করেন, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের এই শিক্ষাটি অনেক সময় অবহেলা করিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভু কিরূপ অসুস্থতার ছল বা কারারক্ষককে উৎকোচ প্রদান করিয়া শ্রীগৌরপাদপদ্মে মিলিত হইয়াছিলেন, শ্রীল রঘুনাথ দাস প্রভু কিরূপে বহির্ম্মুখ স্বজনাদিকে বঞ্চনা করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন কেবল সেই একদেশীয় শিক্ষাই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। অনধিকারীকে সেই শিক্ষা প্রদান করিলে স্বাভাবিক কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যে ভোগ-ত্যাগের চিত্তবৃত্তি না হওয়ায় যখন তাহাদের শ্মশান-বৈরাগ্যের বন্যা চলিয়া যায়, তখন তাহারা দুর্নীতিই শিক্ষা করে। শ্রীশ্রীল সনাতনের বা শ্রীশ্রীল রঘুনাথের স্ব-স্ব **প্রাণকোটি-সর্ব্বস্ব অভীষ্টদেবের সহিত মিলনের জন্য যে সহজ অনুরাগের অগ্নিশিখা,** উহার

ছায়াও কৃত্রিমপন্থী বা অভ্যাসযোগে বৈরাগ্য-শিক্ষাকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে পতিত হয় না।

শ্রীলক্ষ্মণদেশিক নিজপত্নী জামাম্বার বহির্ম্মুখতা-দর্শনে পত্নীকে বঞ্চনা করিয়া ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অপরিপক্ক সাময়িক উচ্ছ্বাসপ্রবণ অনধিকারী ব্যক্তি অনেক সময় পত্নীর সহিত বা দৈহিক স্বজনাদির সহিত ঐরূপ কলহ করিয়া সাময়িক উচ্ছ্বাসে অর্থাৎ ক্রোধাদি রিপুর তাড়নায় বৈরাগ্যের বেষ গ্রহণ করে ; কিছুদিন পরেই মায়াদেবী যখন তাহার মোহনহস্ত-স্পর্শে ঐ রিপুবেগকে একটু প্রশমিত করিয়া দিয়া অন্য প্রকার বেগের উদ্রেক করিয়া দেয়, তখন সেই শ্মশান বৈরাগী অধিকতর নীচতা স্বীকার করিয়া "পুনর্মূষিকো ভব"-মন্ত্রে দীক্ষিত হয় অর্থাৎ অধিকতর তীব্র লালসা ও অভিনিবেশের সহিত পূর্ব্বোক্ত বহির্ম্মুখ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ করিবার জন্য আকাশ পাতাল আলোড়ন করে।

কেবল ব্যতিরেক-শিক্ষার কুফল

অনধিকারীদের নিকট কেবল ব্যতিরেক বা নিষেধমূলক শিক্ষাই উপস্থিত করিলে নিশ্চয়ই তাহারা কোনও দিন মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে না। কিছু বাস্তব বস্তু না পাইলে কেহ কেবল নিষেধমূলক নিন্দা বা বন্দনা শুনিয়া কোন স্থায়ী অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। শ্রীমদ্-ভাগবতের কথা কপ্‌চাইয়া তথাকথিত সরাগ শিক্ষক ও শিক্ষিত উভয়েই যদি কেবল জাগতিক ব্যক্তিগণকে 'গৃহমেধী', 'স্ত্রীসঙ্গী', 'পশ্বধম' প্রভৃতি আনুকরণিক গালি দিতে শিক্ষা করে,

তবে সেইরূপ বহির্ম্মুখ-জন-বিদ্বেষফলে বহির্ম্মুখতা ত' কোনদিনই যাইবে না, বরং উহাদ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে অন্তরে অন্তরে অধিকতর সঙ্গ, আবেশ ও অভিনিবেশ হইতে থাকিবে। এইজন্য সহস্র সহস্র ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—যাহারা কোন বস্তুর নিন্দায় অনুক্ষণ রত ও বিদ্বেষী, তাহারাই সেই বস্তুর ধ্যানফলে তাহাতে সাযুজ্য লাভ করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বা লোকশিক্ষক আচার্য্যের পরদুঃখে দুঃখী হইয়া যে নিন্দাপ্রতিম বা পরচর্চ্চা-প্রতিম উক্তি, অনধিকারী সরাগ বক্তা উহার অনুকরণ করিলে অসৎসঙ্গের ধ্যানেই অভিবিনিষ্ট হইয়া পড়িবে।

শ্মশানবৈরাগ্যের প্রশ্রয়দানে কুফল

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম ব্যতীত যে শ্রীরঘুনাথের অন্য কোন স্মৃতি ও অভিনিবেশ ছিল না, তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন যে, নবীন সাধকের সাময়িক উচ্ছ্বাস বা উৎকট শ্মশানবৈরাগ্যকে প্রশ্রয় দিলে হিতে বিপরীত ফল হয়। কিন্তু যাঁহারা অধিকারের বিচার করেন না, তাঁহারা 'একটি নূতন শিকার মিলিল' ভাবিয়া 'ছেলে ধরার দল' সাজিয়া বালককে ঐরূপ উপদেশ দান করিবার পরিবর্ত্তে নিজের দল বৃদ্ধি করিবার জন্য নানারূপ কৃত্রিম মিথ্যা-প্রবঞ্চনাদি অতি প্রাথমিক অবস্থাতেই শিক্ষা দান করেন। বালক ঐসকল অস্ত্র ভবিষ্যতের জন্য গোপনে রক্ষা করে এবং উপযুক্ত সময়ে 'ছেলে ধরা'—সম্প্রদায়ের উপরে অধিকতর তীব্রভাবে প্রয়োগ করে।

অধিকার বিচার না করিয়া যাঁহারা কেবল কৃত্রিমপন্থায় দলপুষ্টির

জন্য শ্রীমদ্ভাগবত কথিত ও সর্ব্ব-ঋষিগণ-ব্যবস্থিত বদ্ধজীবের অধিকারোচিত স্বাভাবিক-প্রণালী লঙ্ঘনপূর্ব্বক অপরিপক্ব অবস্থায় গায়ের জোরে বা কথার দাপটে দেহ-গেহাসক্ত ব্যক্তিগণকে তোতাপাখীর মত কতকগুলি 'বুলি' শিখাইয়া সংসার ত্যাগ করাইতে চাহেন এবং তাহাদিগকে তাহার অধিকার-বহির্ভূত প্রতিষ্ঠাদির দ্বারা লুব্ধ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ক্ষীরোদকশায়ী ভগবানের চরণে ঐ সকল বদ্ধজীবকে অপরাধী করিয়া তোলেন। হৃদয়ে অব্যক্ত ষড়্‌বেগ পোষণপূর্ব্বক জড়াসক্ত ব্যক্তিগণ যে কৃত্রিমভাবে সংসার হইতে দূরে থাকিবার অভিনয় করে, তাহাতে তাহারা কার্য্যতঃ আরও অধিকতর অভিনিবেশের সহিতই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা, দেহগেহ, স্ত্রী-পুত্র ও সংসারেরই চিন্তা করিতে করিতে সেই আবেশেই আবিষ্ট থাকে; এজন্যই তাহাদের মধ্যে কিছুদিন পরেই অন্যমনস্কতা, স্মৃতিভ্রম, সেবায় ঔদাসীন্য, শৈথিল্য, কাপট্য, মাৎসর্য্য, পরছিদ্রান্বেষণ-প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়।

অগৃহস্থ ব্যক্তিগণকেও তাহাদের অধিকার বিচার না করিয়া কেবল কতকগুলি 'বুলি শিখাইয়া' লোকবৃদ্ধি বা কর্ম্মীর সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজনানুরোধে মঠে বাস করাইলে তাহারাও পথে-ঘাটে, যানবাহনে, লোকালয়ে, গৃহস্থের গৃহে বিচরণকালে জগতের ভোগ্য নামরূপের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং অন্তরে গোপনে ভোগের ছবি ধ্যান করিতে করিতে প্রকৃত মঙ্গলের প্রতি অন্যমনস্ক, স্মৃতিহীন, সেবায় শিথিল, উদাসীন, ক্রোধী, অহঙ্কারী, কপটী, মৎসর, কামাহতচিত্ত, পরস্পর কলহপ্রিয়, বিক্ষিপ্তচিত্ত, পরচর্চ্চক ও আত্মম্ভরী জীব-

বিশেষে পরিণত হয়।

অনর্থযুক্ত অনধিকারী সাধক জীবকে উচ্চ পারমার্থিক পদবী বা ভক্তের প্রতিষ্ঠাদি প্রদান করাও অধিকার-লঙ্ঘনে প্রশ্রয়দানজনিত জগন্নাশকর কার্য্যবিশেষ। যাহার 'একদিনে তিন অবস্থা' এইরূপ ব্যক্তি বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাকে গুরু-বুদ্ধিতে বরণ না করিয়া ভোগ্য-বুদ্ধিতে ভোগ করিতে ধাবিত হয়; সুতরাং অচিরেই পতিত হইয়া পড়ে।

অধিকার লঙ্ঘন করার ফলেই ভক্তিযাজনের অভিনয় করিয়াও —শ্রীহরিনাম-গ্রহণের অভিনয় করিয়াও অনেক পাষণ্ড-মতবাদের আবির্ভাব হইয়াছে। অধিকার লঙ্ঘন করার ফলেই 'বারশত নেড়া', 'তেরশত নেড়ী', সহজিয়া, সখীভেকী, জাতিবৈরাগী, আউল-বাউল-প্রভৃতি মতবাদ জগতে প্রচারিত হইয়াছে। অধিকার লঙ্ঘন করার ফলেই কি গৃহী, কি ত্যাগীর অভিনয়কারী ব্যক্তিগণের মধ্যে—তীর্থ-স্থানের সর্ব্বত্র নানাপ্রকার ব্যভিচার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে।

অধিকার-লংঘনের প্রশ্রয়দানকারীর দায়িত্ব

অধিকার-লঙ্ঘন-ব্যাপারে যে সাধক বা শিষ্যই কেবল দায়ী, তাহা নহে, যাঁহারা আচার্য্য বা গুরুর কার্য্য করিবেন, তাঁহারাও এই দিকে তীব্র দৃষ্টি না রাখিলে ভজনেচ্ছু সাধকের বিপথে গমন অবশ্য-ম্ভাবী। অনেক সংসার-তপ্ত ভাবপ্রবণ নবীন সাধক সাময়িক উচ্ছ্বাস ও নবীন উন্মাদনার বশবর্ত্তী হইয়া একদিনেই সংসারত্যাগ বা শরণাগতির অভিনয় প্রদর্শন করেন; তখন যদি আচার্য্য বা শ্রীগুরুদেব সংখ্যাবৃদ্ধি করিবার লোভে বা তাঁহার আশ্রমের লোকাভাব-পূরণ বা সঙ্ঘ-পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার অনুরোধে অনধিকারীকে

সংসার-পরিত্যাগের উপদেশ বা অন্তরে অশ্রদ্ধালু্কে বা অযোগ্যকে শরণাগতের আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিতে প্রশ্রয় দান করেন, তবে সেই গুরুনামধারী ব্যক্তি কি সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের নিকট দায়িত্ব এড়াইতে পারিবেন? উচ্ছ্বাসপ্রবণ অবুঝ সাধকের না বুঝিয়া ভুল করিলে বরং ক্ষমা আছে, কিন্তু গুরুর আসন গ্রহণকারী তাহাতে প্রশ্রয় দিলে তাহা কি শ্রীভগবান্ সহ্য করিবেন? ঐরূপ কৃত্রিমপন্থীর সঙ্ঘদ্বারা কি জগতের অহিত ব্যতীত হিত হইবে?

শ্রীভগবানের প্রভুপদেশ (গীঃ ৩।২৬) এই—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥"

বিদ্বান্ ব্যক্তিও শুদ্ধভক্তিমাহাত্ম্যে অনভিজ্ঞ ফলকামী ব্যক্তির কর্ম্মত্যাগের প্রবৃত্তির উদয় করাইবেন না, অজ্ঞব্যক্তি যাহাতে কর্ম্মার্পণের পথে চলিতে শিক্ষা করে, তদ্‌বিষয়ে নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিবেন, তাহাতে প্ররোচিত করিবেন; লোক-শিক্ষক নিরপেক্ষ-ভাব প্রদর্শন করিলে অনেক সময় অজ্ঞব্যক্তি নিশ্চেষ্ট বা শিথিল হইয়া পড়ে।

শুদ্ধভক্তি-মাহাত্ম্যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরও কোনওরূপে প্রাক্তন-জন্মকৃত ভক্তি-সংস্কার অনুমান করিয়া যে ভক্তির অধিকারি-নির্ণয়ের প্রসঙ্গ আছে, তাহা অনধিকারী বা অশ্রদ্ধালুকে তথাকথিত 'সুযোগ (chance) দেওয়া'র নামে 'বিপথগামী করা' নহে। কলিকালে কর্ম্ম-সন্ন্যাস ও জ্ঞানসন্ন্যাস নিষিদ্ধ, কিন্তু ভক্তিসন্ন্যাস শাস্ত্র ও মহাজন-আচার-সম্মত,—ইহা "অশ্বমেধং গবালম্ভং" শ্লোকের ব্যাখ্যা-

প্রসঙ্গে আমরা অনেক সময় শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু যেই স্থানে অশ্রদ্ধালু, অপরাধী, অত্যন্ত জড়াভিনিবিষ্ট, কুটিল ও ভক্তির অভিনয়-জনিত অহঙ্কারে স্ফীত অর্থাৎ অনধিকারী ব্যক্তি ভক্তিশাস্ত্র-সম্মত সন্ন্যাস-গ্রহণের নামে বিরক্ত-বেষাদি গ্রহণ করে, সেইস্থানে ঐরূপ সন্ন্যাস-গ্রহণচেষ্টা কর্ম্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষাও অধিকতর নিন্দনীয় নহে কি? ভক্তিপথের সন্ন্যাস-গ্রহণের অভিনয় করিয়া যদি দণ্ডজীবী বা বেষোপজীবী ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, রাবণের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগীর দল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে তাহাদের সন্ন্যাস কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষাও কলির অধিক উৎপাত-বিশেষ ব্যতীত আর কি? অনধিকারী ব্যক্তি ভক্তি সন্ন্যাসী সাজিয়া ধর্ম্মের আবরণ দিয়া নিজ দেহ বা স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান বা ভূ-সম্পত্তি-বৃদ্ধি-প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়ে, কখনও বা পূর্ব্বা-শ্রমের স্ত্রীর সেবাদি গ্রহণচ্ছলে স্ত্রীসঙ্গ করিয়া থাকে। অন্যদিকে কুবিষয়াসক্ত অনধিকারীকে 'পরমহংস-মহাভাগবত' সাজাইয়া তাহার অত্যন্ত কুভোগপর গৃহব্রতধর্ম্মকে যুক্ত-বৈরাগ্য বা শ্রীরায়রামানন্দ ও শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির অধিকার বা রাগমার্গের অধিকার বলিয়া প্রখ্যাপন করিলেও তদ্দ্বারা জগন্নাশকর কার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। গৃহব্রতকে তাহার অধিকার উপলব্ধি করিতে দিয়া ক্রমে ক্রমে ফল-কামনা-ত্যাগরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক অতি প্রাথমিক ভাগবত-ধর্ম্মের সমীপস্থ করাই শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মের উপদেশ। তাহাকে গোস্বামী, প্রচারক, আচার্য্য, বক্তা ও উপদেষ্টা সাজাইলে বা মিথ্যা প্রতিষ্ঠার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করাইলে সে কয়দিন তাহার

পোষাকী স্বভাবটি রক্ষা করিতে পারিবে? অচিরেই তাহা-দ্বারা নানাপ্রকার উৎপাত, নানাপ্রকার গুপ্ত ব্যভিচার ও জগজ্জঞ্জালের স্তূপ সৃষ্টি হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু এইরূপ অনধিকারী সরাগ বক্তাকে ভাগবত-ধর্ম্মের বক্তার আসন প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সরাগ-বক্তার অনুভব নাই, কেবল নিজেকে জাহির করিবার জন্য বাক্য-বাগীশতা আছে। সদ্যঃপুত্রশোকাতুরা জননীকে পুত্র-স্নেহের মিথ্যাত্ব উপদেশকারিণী বন্ধ্যার অথবা অপর জননীকে পুত্রশোকের অকিঞ্চিৎ-করতার উপদেশে পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনকারিণী অথচ নিজের বেলায় তদ্‌বিপরীত-আচরণকারিণীর উপদেশক বা প্রচারকের আসন-গ্রহণ নিষ্ঠুর পরিহাসেরই কার্য্য হয়; ইহা ধর্ম্মকে লইয়া 'ছিনিমিনি খেলা'র চেষ্টা ব্যতীত আর কি!

অধিকার-লংঘনজনিত কুফলের দৃষ্টান্ত

অধিকার-লঙ্ঘনজনিত ভয়াবহ ফলের দৃষ্টান্ত ভারতের ধর্ম্মের ইতিহাসে ভূরি ভূরি রহিয়াছে। এককালে নীতিবাদী বৌদ্ধ, জৈন-প্রভৃতি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকার-লঙ্ঘনজনিত ব্যভিচারের স্রোত প্রচুরভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল। তান্ত্রিকগণের মধ্যে এক সময়ে যে কত অবৈধ-আচারের তাণ্ডব-নৃত্য হইয়াছে, তাহা বর্ণনা-তীত। অকালপক্ক ব্যক্তিগণ ব্রজবাস করিবার উচ্ছ্বাস দেখাইয়া কৌপীন গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু কৌপীনের মর্য্যাদা রাখিতে পারে নাই; পরে কেহ গুপ্ত-বান্তাশী, কেহ বা ব্যক্ত-বান্তাশী হইয়া পড়িয়াছে।

ব্যক্ত বান্তাশীগণ জাতিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষ সৃষ্টি করিয়া
পরিধানে কৌপীন-বহির্ব্বাস অথচ অঙ্কে স্ত্রী-পুত্র লইয়া আখড়াধারী
হইয়াছে। অনধিকারিণী কুমারী দেবদাসীর অভিনয় করিতে গিয়া
শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিবার পরিবর্ত্তে ছাগধর্ম্মী
মানবের ভোগ্যা হইয়া বারবনিতার সঙ্ঘের সৃষ্টি করিয়াছে।
অধিকার লঙ্ঘনের ফলে তথা-কথিত পুষ্টিমার্গের মধ্যে একাধারে
গৃহব্রতধর্ম্ম ও অবৈধ আচারের তাণ্ডব নৃত্য চলিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মে
একদিকে সর্ব্বাধিকারি-সাধারণ সন্ন্যাস, জৈনগণের সর্ব্বাধিকার-
পালনীয় দীর্ঘ উপবাস-প্রধান কৃত্রিম ব্রতচর্য্যার যে কি কুফল
হইয়াছিল এবং অনধিকারী স্ত্রীলোকের মধ্যেও সন্ন্যাস ধর্ম্ম বিস্তৃত
হইয়া যে পতিতা বৌদ্ধভিক্ষুণী ও জৈনমতাবলম্বি-ক্ষপণিকার আবির্ভাব
হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় বাৎস্যায়নের কামসূত্রের মধ্যে
পাওয়া যায়। বাৎস্যায়ন বলিতেছেন (কামসূত্র ৩।১।৯),—

“ভিক্ষুকীশ্রমণাক্ষপণাকুলটাকুহকেক্ষণিকামূলকারিকাভির্ন সংসৃজ্যেত।”

ভিক্ষুকী, শ্রমণা (বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী), ক্ষপণা (জৈনসন্ন্যাসিনী),
কুলটা, কুহকা (মায়াবিনী), ঈক্ষণিকা (দৈবজ্ঞ স্ত্রীলোক), মূলকারিকা
(বশীকরণ-প্রভৃতি করিবার জন্য যাহারা ঔষধ-মন্ত্রাদি প্রদান করে)
—ইহাদের সহিত কখনও মিশিবে না।

স্ত্রীলোকের সন্ন্যাস

বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী ও জৈন-সন্ন্যাসিনীকে কুলটা ও কুহকার সহিত
সমপর্য্যায়ে গণনা করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে সাধারণ স্ত্রীজাতির পক্ষে সন্ন্যাস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। বেদাদিশাস্ত্রেরও ইহাই অভিমত। তবে সর্ব্বত্রই বিশেষবিধি আছে, কিন্তু তাহা সাধারণের অধিকার জ্ঞাপন করে না। শ্রীগোদাদেবী, শ্রীমাধবীমাতা, শ্রীনন্দিনী দেবী, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া (শ্রীল হরিদাস পণ্ডিতের শিষ্যা), শ্রীগঙ্গামাতা প্রভৃতির ন্যায় অধিকার সাধারণ বদ্ধজীবের হয় না। **একমাত্র মহতের বিশেষ কৃপায় বিশেষ অধিকার লাভ হয়।**

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"স্ত্রীলোকের গৃহস্থাশ্রম ও স্থলবিশেষে বানপ্রস্থ ব্যতীত অন্য কোন আশ্রম স্বীকর্ত্তব্য নয়। কোন অসাধারণ-শক্তিসম্পন্না স্ত্রী বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সামর্থ্য লাভ করত যদি **ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাসাশ্রম** গ্রহণ করিয়া সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন বা লাভ করেন, তাহা **সাধারণতঃ কোমলশ্রদ্ধ, কোমল-শরীর, কোমলবুদ্ধি স্ত্রীজাতির পক্ষে বিধি নয়।**" (শ্রীচৈঃ শিঃ ২।৪)

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশে চিরকুমার ও চিরকুমারীর সঙ্ঘ বা সভার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং কোন কোন নব্যধর্ম্মের মধ্যে সেই স্রোত প্রবলবেগে প্রবেশ করিয়াছিল। উহার ফল যে কি বিষময় হইয়াছে ও কতটা জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন।

ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে কেহ কেহ বলেন,—"শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় না করিয়া থাকায় ঐ সকল পতনের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।"—ইহা সত্য ; আবার ইহাও সত্য যে, ধর্ম্মের ধ্বজা লইয়া অধিকার-বহির্ভূত যে সকল কার্য্য হইয়াছে, তাহাতেই পতনের

ইতিহাস অধিকতর জাজ্জ্বল্যমানরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাজ চূড়ঙ্গদেব পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার্থ পবিত্রচরিত্রা চিরকুমারী দেবদাসী নিযুক্ত করিয়া চূড়ঙ্গসাহী-পল্লীতে (শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানের পার্শ্বে) তাহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু বর্ত্তমানে সেই পল্লীর নাম শুনিলে লোকে নাসিকা-কুঞ্চন করে; কারণ, তাহা বারবনিতা-পল্লীতে পরিণত হইয়াছে।

অধিকার লংঘন হইতে মহদবমাননার উৎপত্তি

একমাত্র মহতের আশ্রয় ব্যতীত ধর্ম্মের ধ্বজা ধারণ করিয়াও স্ত্রীই হউক, আর পুরুষই হউক, কেহই আত্মরক্ষা করিতে পারে না। আবার মহতের সঙ্গে থাকিবার অভিনয় করিয়া—মহতের অনুকরণ করিয়া অধিকার-বহির্ভূত ভজনের প্রদর্শনী উন্মোচন করিলে মহতের চরণে অপরাধ-ফলে পতন অবশ্যম্ভাবী। তাই শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-মহারাজের অনুকরণ করিয়া কেহ কেহ পুরীষ-ত্যাগের স্থানে বাস ও কৌপীনাদি-পরিধানের অভিনয় করিলেও তাহারা অবৈধ-কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল। পরম করুণাময় শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ তাহাদিগকে বৈধজীবন-যাপনের উপদেশ দিয়াছিলেন। অধিকার-লঙ্ঘনের এরূপ বিষময় ফল।

মহতের চরণে অপরাধফলে অধিকার-লঙ্ঘন-জনিত দম্ভ আসিয়া উপস্থিত হয়। সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনধিকারোচিত ব্যবহার-প্রদর্শনকারী যখন আত্মরক্ষা করিতে পারে না, তখন সে মহৎকেই দোষী সাব্যস্ত করে; মহৎ তাহার ভোগের পথে কণ্টক হইয়াছে মনে করিয়া মহতের নিকট নানাপ্রকার প্রবঞ্চনা, এমন কি,

ধরাধাম হইতে তাঁহার অস্তিত্ব-লোপের কামনা করে। ইহা অধিকার লঙ্ঘন-জনিত মিথ্যাচার বা কপটাচারের অবশ্যম্ভাবী ফল। বাহিরে বরং নিম্নাধিকারে থাকার অভিনয় করা ভাল, কিন্তু বাহিরে উন্নতাধিকার দেখাইয়া ভিতরে কপট-কামাচারী হওয়া হরিভজন হইতে চিরতরে বিদায় লইবার ষড়যন্ত্র ব্যতীত আর কি ?

সাধারণ জীবকোটি যে তাহার নৈসর্গিক অধিকার কৃত্রিমভাবে অতিক্রম করিতে পারে না, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিতেছেন,—

"বিরক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেই যে বিরক্ত হয়, এরূপ নয়। যদি **ভাবোদয়-ক্রমে ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি** স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া থাকে, তবে তাহাদের ভেক গ্রহণ করা অবৈধ।" (শ্রীচৈঃ শিঃ ৫।২)

"যদি স্ত্রীসম্ভাষণ-প্রবৃত্তি হৃদয়ের কোন দেশে অবস্থিতি করিতে থাকে, তবে যেন ভেক গ্রহণ না করেন। **গৃহে থাকিয়া মর্কট বৈরাগ্য দূর করত** সর্ব্বদা কৃষ্ণনামানন্দে আত্মার উন্নতি সাধন করুন, ব্যস্ত হইয়া অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। **ভক্তিজনিত স্বাভাবিক বৈরাগ্য পূর্ণবলে উদিত হইবার পূর্ব্বে যে গৃহস্থ গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন,** তাঁহারই মর্কট-বৈরাগ্য হইবার সম্ভাবনা।" (সজ্জনতোষণী ৮।১০, 'মর্কটবৈরাগ্য'-প্রবন্ধ)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অন্যত্র লিখিয়াছেন—"রক্ত-মাংস **গঠিত শরীরে** যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ একপ্রকার **নিসর্গজনিত ধর্ম্ম** হইয়া পড়িয়াছে। **এই নিসর্গকে সঙ্কুচিত করিবার জন্যই বিবাহ-বিধি।** বিবাহ-বিধি হইতে

যাহারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রায়ই পশুবৎ-ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত। তবে **যাঁহারা সৎসঙ্গজনিত ভজনবলে নৈসর্গিক বিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত-বিষয়ে রতি** লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ।" (সঃ তোঃ ১১।৫, 'ধৈর্য্য'-প্রবন্ধ)

আধিক্য ও ন্যূনতা—উভয়ই ভক্তিপ্রতিকূল

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ, পূঃ ১।২।১০৮)

পরমার্থবিদ্ ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলে ভজননির্ব্বাহ হয়, সেই পরিমাণই গ্রহণ করিবেন ; অধিকও গ্রহণ করিবেন না, কমও গ্রহণ করিবেন না। অধিক গ্রহণ করিলেও যেরূপ পরমার্থ হইতে চ্যুত হইবেন, কম গ্রহণ করিলেও সেইরূপই পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবেন। অনেক সময় উন্নতাধিকারীর অনুকরণ করিয়া কেহ কেহ এইরূপ অধিক ও অল্প গ্রহণ ও ত্যাগের চেষ্টা দেখাইয়া পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়। শ্রীশ্রীল রায় রামানন্দ ও শ্রীশ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যা-নিধির অনুকরণ করিয়া অধিকার-বহির্ভূত অধিক বিষয়-গ্রহণের চেষ্টা দেখাইয়া যেরূপ সাধক পরমার্থ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীশ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু বা শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের অনুকরণ করিয়া অধিকার-বহির্ভূত বৈরাগ্য বা অল্প বিষয়-গ্রহণের

চেষ্টা দেখাইয়া অনেকেই পরমার্থ হইতে চিরতরে বিচ্যুত হইয়াছে; সুতরাং অধিকারবহির্ভূত অল্প ও অধিক বিষয় গ্রহণ করিলে তদ্দ্বারা ভজননির্ব্বাহ হইবে না।

অধিকার-লঙ্ঘন হইতে যে কেবল পাপ ও দুর্নীতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নহে; বহুলোক নাস্তিক, বহুলোক পাষণ্ডী ও বহুলোক অপরাধী হইয়া জগতের বহু জীবকে জন্মজন্মান্তরের জন্য বিপথে চালিত করিয়াছে। অধিকার-লঙ্ঘনের ফলেই শত শত কালাপাহাড়, শত শত দয়ানন্দ ও শত শত ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছে। কালাপাহাড় পূর্ব্বে গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু পরে হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী হইয়া হিন্দুধর্ম্ম-দলনে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। দয়ানন্দ পূর্ব্বে শিবার্চ্চক ছিলেন, কিন্তু যে অধিকারে শিব-অর্চ্চনের যোগ্যতা লাভ হয়, সেই অধিকার লঙ্ঘন করায় তিনি শিববিদ্বেষী হইয়া ক্রমে সাত্বতশাস্ত্র-বিদ্বেষী হইয়া পড়েন। ভারতচন্দ্র রায় পূর্ব্বে বিরক্ত-বৈষ্ণব-বেষ গ্রহণ করিয়া পুরীর সাতাসন-মঠে অবস্থানপূর্ব্বক গৌড়ীয়-রসশাস্ত্রসমূহ আলোচনা করেন, কিন্তু অনধিকারী হইয়া পত্নী পরিত্যাগপূর্ব্বক বিরক্তের বেষ গ্রহণ ও রসশাস্ত্র আলোচনা করিবার ফলে পরে বেষত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মবিরোধী, শাক্তমতবাদী ও প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ-বর্ণনে সিদ্ধহস্ত গ্রাম্য মহা-কবি বলিয়া বিখ্যাত হন।

অশ্রদ্দধানে শুদ্ধভক্তির উপদেশের কুফল

কেবল যে অনর্থযুক্ত সাধককে লীলাকীর্ত্তন বা মাধুর্য্য-রসের কথা আলোচনা করিতে না দিলেই বা তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে সতর্ক

করিলেই অধিকার লঙ্ঘন করা হয় না, তাহা নহে। অশ্রদ্ধালুকে
কর্ম্মত্যাগের উপদেশ, লৌকিক শ্রদ্ধালুকে রাতারাতি শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধালু
সাজাইয়া দেওয়া, অত্যন্ত দেহগেহাসক্ত পশুপ্রকৃতির ব্যক্তিকে
কৌপীন পরিধান করাইয়া দেওয়া, অত্যন্ত গৃহাসক্ত ব্যক্তিকে আসক্তি
ত্যাগ করিবার শাস্ত্রীয় ক্রমিক ভজন-কৌশল শিক্ষা না দিয়া কেবল-
মাত্র স্ত্রীসঙ্গের নিন্দার মুখস্থ গদ শিক্ষা দেওয়া বা তাহাদের মজ্জাগত
প্রচ্ছন্ন উৎকট স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সাকে চাপা দিবার জন্য তৎপরিবর্ত্তে কর্ণ ও
জিহ্বার ক্ষুধা-বহ্নির ইন্ধন সরবরাহ করা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা ও উত্তম-
ভোজনাদি প্রদান করা কৃত্রিম পন্থামাত্র ; উহা ভাগবত-ধর্ম্মের পথ
নহে। এক ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা আর এক ইন্দ্রিয়ের ইন্ধন যোগাইয়া
রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বেগই প্রবলতরভাবে
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে ; তৎফলে আজ যে নিজেকে স্ত্রীসঙ্গবিরহিত
ব্রহ্মচারী মনে করিয়া নিজ-জনককে 'স্ত্রীসঙ্গী' ও জননীকে 'পুরুষরূপ
যোষিতের সঙ্গিনী' বলিয়া গালি প্রদান করিয়াছে, কালই সেই গুণধর
পুত্রটি একটি অবৈধ দাসীর ক্রীড়ামৃগ হইয়া পড়িয়াছে, কেহ বা
বিমাতৃগামী হইয়াছে—এইরূপ প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পাওয়া যায়। আজ
যে ট্রেনে গমনকালে কন্যার সহিত পিতাকে একাসনে অবস্থিত দেখিয়া
পিতাকে দুহিতৃসঙ্গিরূপ স্ত্রীসঙ্গী বলিয়া প্রচার করিতে সাহসী হয়
এবং বালক-যুবক-নির্ব্বিশেষ সকলের নিকট স্ত্রীবিদ্বেষ প্রচার করে,
সেই ব্যক্তিই পরে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া পঞ্চাশৎ বৎসর-বয়স্কা বৃদ্ধা
পত্নীকে পাশ্চাত্ত্যদেশীয় যুবতীগণের ন্যায় সাজাইয়া ইন্দ্রিয়চরিতার্থ
করিতে লোলুপ হয়। অধিকার লঙ্ঘনের এই সকল ভয়াবহ ফল।

রোগের সাময়িক বিরতি বা প্রাবল্য দেখিয়া কেবল রোগ বা রোগীর নিন্দা বা বন্দনা করিলে রোগ নির্ম্মূল হয় না। সর্ব্বপ্রথমে রোগ নির্ব্বাচন করা আবশ্যক, তৎপরে রোগীর অধিকার-অনুযায়ী রোগের নিদানচিকিৎসা আবশ্যক। রোগের যাহা ঔষধ ও পথ্য, তাহারও উপযুক্ত মাত্রা, উপযুক্ত সময় ও উপযুক্ত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আছে। মনে করুন, কোন ব্যক্তিকে কবিরাজ স্বর্ণসিন্দুর ও কোন ডাক্তার হাকস্‌লিজ্‌ নার্ভিগার ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন যে, ঔষধ-সেবনে রোগীর যাবতীয় স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নষ্ট হইবে। এই প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ পাইয়া রোগী মনে করিলেন—'একতোলা স্বর্ণসিন্দুর প্রত্যহ একমাত্রায় তিনমাস ছয়দিন সেবন করিয়া এত সময় নষ্ট করার কি আবশ্যকতা আছে? যদি আজই সবটা সেবন করি, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সবল হইয়া উঠিব।' আর এক হাতুড়ে ডাক্তার আসিয়া অন্য-এক রোগীকে বলিলেন—"নার্ভিগারের শিশিটি একমাস ধরিয়া সেবন না করিয়া আজই সব সেবন করিয়া ফেলুন দেখিবেন—আজই শরীরে হেকু র্লেসের মত বল পাইবেন।" আর এক কবিরাজ এক রোগীকে তাহার যকৃতের ব্যাধির জন্য কাঁচা পেঁপে-সিদ্ধ পথ্যরূপে গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কাঁচা পেঁপের অপূর্ব্ব গুণ শ্রবণ করিয়া সেই রোগীটি বাজার হইতে পাঁচ সের পেঁপে আনিয়া ভাতে সিদ্ধ করিতে দিলেন এবং একবারেই সমস্ত পেঁপে-সিদ্ধ (পেট ভরিয়া গেলেও, ভাবী মঙ্গল-লাভের আশায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও) গ্রহণ করিলেন। আর একব্যক্তি জনৈক কবিরাজের নিকট শুনিয়াছিলেন—"কদাপি কুপ্যতে মাতা, নোদরস্থা

হরিতকী" ; তাই তিনি এক সের হরিতকী কিনিয়া আনিয়া উহা বাটিয়া সেবন করিলেন !

পাঠক ! এই সকল ব্যক্তিদের অবস্থা কি হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিবার আবশ্যকতা নাই। ধর্ম্মরাজ্যে বা ভক্তিরাজ্যে অধিকার-লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিগণেরও এইরূপ দশা হয়। ঔষধ ও পথ্যই তখন অধিকার বা যোগ্যতা-অনুযায়ী গ্রহণ না করায় জীবন-ঘাতী হইয়া পড়ে। পশু-প্রকৃতির ব্যক্তি যদি আবেশময়ী ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব শুনিয়া একদিনে কেবলা ভক্তিকে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করে অথবা দেহ-গেহাসক্ত গৃহব্রত ব্যক্তি যদি কর্ম্মমিশ্র-অর্চ্চন বা কর্ম্মার্পণ পরিত্যাগ করিয়া অকিঞ্চনগণের ন্যায় কেবল নামনিষ্ঠের অভিনয় করে ; যাহার হৃদয়ে পশুভাব প্রবল, সে যদি কৃত্রিমভাবে ভেকধারী নির্জ্জন-ভজনানন্দী বৈরাগী সাজে, তবে তাহার বর্ত্তমানে ভক্তিলাভ ত' হইবেই না, জীবনে ভক্তিলাভের আশাও নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।

মহৎসঙ্গ ও মহদপরাধ

যে পর্য্যন্ত স্বভাব উদিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত কৃত্রিম-চেষ্টার দ্বারা কিছুই হইতে পারে না। নিত্যসিদ্ধ স্বভাব উদয় করাইবার জন্য মহতের সঙ্গের একান্ত আবশ্যকতা আছে। মহতের দ্বারা নিয়মিত সঙ্ঘে মহতের সঙ্গপ্রাপ্তির সুযোগ আছে ; কিন্তু সঙ্ঘে থাকিলেও সকলেরই প্রকৃতি একরূপ নহে। আবার যিনি সঙ্ঘে থাকেন, তাঁহারই মহতের সঙ্গ ও কৃপালাভ হয় ; যিনি সঙ্ঘে থাকেন না, তাঁহার মহতের সঙ্গ বা কৃপালাভ হইতে পারে না, তাহাও নহে।

সঙ্ঘে না থাকিলেও মহতের কৃপালাভ হয় না, আবার সঙ্ঘে থাকিলেও মহতের কৃপালাভ হয় না ; আবার সঙ্ঘে থাকিলেও মহতের কৃপালাভ হয়, সঙ্ঘে না থাকিলেও মহতের কৃপালাভ হয়। সঙ্ঘে থাকিলে মহতের কৃপালাভের অনেক সুযোগ আছে বটে, কিন্তু সুযোগ থাকিলেই যে তাহা গ্রহণ করা যায়, তাহাও নহে। কলেজ-বোর্ডিংএ থাকিয়াও অনেকে চারি-পাঁচবার ফেল করে, আবার প্রাইভেট্ পড়িয়াও অনেকে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। মহা-মহোৎসবের সময় যখন পঙ্‌ক্তি-ভোজন হয়, তখন পঙ্‌ক্তিতে সকলের পক্ষে একই প্রকার প্রসাদ পরিবেষিত হইলেও যাঁহারা উদরাময়গ্রস্ত রোগী, তাঁহারা হয় ত কেহ পুষ্পান্ন-মল্লপূপ প্রভৃতি পরিবেষণ-কালে তাহা গ্রহণ করেন না, কখনও গ্রহণ করিলেও এক রঞ্চমাত্র গ্রহণ করেন। প্লুরিসি বা বাতের রোগী দধি-পরিবেষণকালে দধি গ্রহণ করেন না ; আবার যাঁহারা অত্যন্ত বেশী রোগী, তাঁহারা বুদ্ধিমান্ হইলে বিচার করেন যে, 'পঙ্‌ক্তিতে বসিলে আমার চলিবে না, আমি হয় ত' অনেক প্রতিকূল সামগ্রী অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করিয়া ফেলিব, না হয় মাত্রা ঠিক রাখিতে পারিব না' ; তাঁহারা নিজের ঘরেই পৃথগ্‌ভাবে প্রসাদ পা'ন। কোন শয্যাশায়ী রোগীর জন্য হয় ত' মল্লপূপের উৎসবের দিনেও সাগু বার্লি বা ডাবের জলের পৃথক্ ব্যবস্থা থাকে, কাহারও বা একেবারে উপবাসেরই ব্যবস্থা থাকে। কাজেই মহাপ্রসাদ মঠবাসিনির্ব্বিশেষে পথ্যরূপে ব্যবস্থিত থাকিলেও যদি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অধিকার বা যোগ্যতা বিচার করা না যায়, তবে ভক্তির অনুকূল জীবন-নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

ভাবপ্রবণতায় অধিকার-লংঘনের কুফল

পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে যে, মহতের কৃপায় স্বভাবের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের ভক্তিবৃত্তি নৈষ্ঠিকী হয় না। কেহ হয় ত' ভাব-প্রবণতা, উচ্ছ্বাস, অনুকরণপ্রিয়তা কিংবা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা-মূলে দুই একবার কিংবা দুই-এক বৎসর একাদশীতে নিরম্বু উপবাস, রাত্রি-জাগরণ, শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ বা নৃত্যগীতাদি করিলেন, কিন্তু যদি মহতের কৃপায় ঐ সকল ভক্ত্যঙ্গানুশীলন—রুচি সহজ-স্বভাবরূপে উদিত না হয়, তবে কিছুদিন পরে তাহা বন্ধ হইয়া যাইবেই যাইবে। তখন একাদশীতে নিরম্বু উপবাসের পরিবর্ত্তে অনুকল্পের নামে চীনা-বাদাম, ছানার ডাল্‌না ও শটীর লুচি ভোজন-মহামহোৎসব, রাত্রি-জাগরণের পরিবর্ত্তে দিবানিদ্রা ও অল্প রাত্রিতেই নিদ্রার ক্রোড়ে শয়নাদি কার্য্য আরম্ভ হইয়া যাইবে। অনধিকারী ব্যক্তি কেবল সাময়িক উচ্ছ্বাস দেখাইয়া আপনাকে অধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিলেই অধিকারী হইয়া যাইতে পারে না। অধিকারকে ক্রমে ক্রমে মহতের সঙ্গ, উপদেশ, যথাবিহিত সাধন ও অনুশীলনের দ্বারা উন্নত করা যায়, কিন্তু অধিকার-বহির্ভূত সাধনের অভিনয় করিয়া কেহই মঙ্গললাভ করিতে পারে না। অমুক প্রতিষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত সেবকের অভাব, অমুক স্থানের ভিক্ষা-সংগ্রহার্থ লোকের প্রয়োজন, অমুক স্থানের সংকীর্ত্তনসঙ্ঘের নেতা আবশ্যক, অমুক আশ্রমে মাসিক দুই হাজার টাকা আনুকূল্য প্রয়োজন, অমুক আশ্রমে অর্চ্চক আবশ্যক, অমুক সভায় বক্তৃতার জন্য বক্তা, অমুক আসরে গান করিবার জন্য গায়ক আবশ্যক—এক কথা, আর অকপট সেবকের প্রাকট্য আর

এক কথা। কর্ম্মদক্ষতা থাকিলেই তিনি সহজ সেবক বা কীর্ত্তন-সঙ্ঘের পরিচালক হইতে পারেন না বা অর্চ্চনের মন্ত্রমুদ্রা-প্রভৃতি জানিলেই অর্চ্চক হইতে পারেন না। যে অধিকার ও যোগ্যতা থাকিলে যে সেবার সাধন করিতে পারা যায়, সেই সেবা ও যোগ্যতা না দেখিয়া কেবল লোক-সংগ্রহ, অর্থ-সংগ্রহ বা প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য সময়সেবী (Time-server) সৃষ্টি করিলে তদ্দ্বারা হিতে বিপরীত ফলই অবশ্যম্ভাবী। যাহার পশুবৎ চিত্তবৃত্তি আছে, সেইরূপ ব্যক্তি যদি কেবল বাগ্মিতাশক্তির গুণে কোন কীর্ত্তনসঙ্ঘের পরিচালক হইয়া লোকসমাজে ভক্তির উপদেশ করে, তবে তদ্দ্বারা অনেক লোকই বিপথগামী হইবে। উচ্ছ্বাসময়ী বক্তৃতার দ্বারা লোক মাতাইয়া অর্থ বা প্রতিষ্ঠাসংগ্রহ—জীবে দয়া নহে। জীবকে ভ্রান্তপথে চালিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। চিদ্‌বিলাসানুভবসম্পন্ন শাস্ত্রদ্রষ্টা মহাপুরুষ-ব্যতীত ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-বর্জ্জিত সত্য কেবল ঐ সকল বুলি কপ্‌চাইয়া কেহ স্থাপন করিতে পারে না। ঐরূপ বক্তা শ্রীভগবান্ ও ভক্তের মহিমা যতটুকু বলেন, তাহাও অনুভবের সহিত বলিতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত উচ্চতর সিদ্ধান্ত বা অনুভবের কথায় ত' তাহাদের অধিকারই নাই, কিন্তু অনেক সময় বাধ্য হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য শাস্ত্রদ্রষ্টা পুরুষগণের ন্যায় অনেক সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিবার বা অনেক সমস্যামূলক প্রশ্নের উত্তর দিবার অভিনয় করিতে হয় ; ইহার দ্বারা অনুভবহীন সরাগ বক্তা নিজের মনকে ঠকাইয়া অপরকে ঠকাইয়া থাকেন।

গৃহত্যাগের অধিকার-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ

অধিকারবিচার না করিয়া গৃহীও গৃহত্যাগী সাজিলে ও সাজাইলে কলির উৎপাত উপস্থিত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৃহী ও গৃহত্যাগীর অধিকার বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"অবস্থিতিভেদে ভক্ত দুই প্রকার গৃহস্থভক্ত ও গৃহত্যাগী ভক্ত। ভক্তগণ যখন গৃহস্থ থাকেন, তখন বিষয়ীদের ন্যায় বিষয়ে কেবল ইন্দ্রিয় তর্পণ করেন না ; তাহার কর্ণ হরিকথা ও সাধু-জীবন শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয় ; তাহার আশা, ক্রিয়া, আতিথ্য, বাঞ্ছা—সমস্তই কৃষ্ণসেবার অধীন। তাহার সমস্ত জীবনই জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম ও বৈষ্ণব-সেবন—এই মহোৎসবময়। কলিকালে জীবের পক্ষে গৃহস্থ-বৈষ্ণব হওয়াই উচিত, পতনের আশঙ্কা নাই ; ভক্তি-সমৃদ্ধিও সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে। গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেক তত্ত্বজ্ঞ গুরু আছেন, তাঁহাদের সঙ্গ জীবের বিশেষ শ্রেয়স্কর। মহাপ্রভুর অধিকাংশ পার্ষদগণই গৃহস্থভক্ত। অনাদিকাল হইতে ভক্ত রাজর্ষি দেবর্ষি অনেকেই গৃহস্থভক্ত। ধ্রুব-প্রহ্লাদ-পাণ্ডবাদি সকলেই গৃহস্থভক্ত। গৃহস্থভক্তকে জগতের পূজনীয় বলিয়া জানিবেন। **গৃহস্থভক্তগণের মধ্যেই কেহ কেহ গৃহত্যাগী হইবার অধিকারী হন। জগতে তাঁহাদের সংখ্যা স্বল্প এবং তাঁহাদের সঙ্গ বিরল।**" (জৈবধর্ম্ম, ৭ম অধ্যায়)

এই গৃহত্যাগি-ভক্তের অধিকার-লক্ষণ কি, তদ্বিষয়ে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিতেছেন (জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ),—

"প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে অন্তর্মুখী হয়, তখনই গৃহত্যাগের

অধিকার জন্মে। তৎপূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা। আদৌ স্ত্রীসঙ্গস্পৃহাশূন্যতা, সর্ব্বজীবে পূর্ণদয়া, অর্থ-ব্যবহারে তুচ্ছজ্ঞান, কেবল গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহের জন্য অভাবকালে যত্ন, **কৃষ্ণে** শুদ্ধা রতি, বহির্ম্মুখসঙ্গে তুচ্ছজ্ঞান, **মানাপমানে সমবুদ্ধি, বহ্বারম্ভে স্পৃহাশূন্যতা, জীবনে-মরণে রাগদ্বেষরাহিত্য"**—গৃহত্যাগী ভক্তের অধিকার-লক্ষণ। 'নিরপেক্ষ গৃহত্যাগী ভক্তের সম্মান পাইব'—এই আশায় কেহ কেহ কৃত্রিম অধিকার প্রকাশ করেন। সে'টা নিরর্থক ও অত্যন্ত অমঙ্গলজনক।

গৃহত্যাগের অধিকার-বিচার-সম্বন্ধে শিষ্য অপেক্ষা গুরুর অধিকতর দায়িত্ব আছে ; এতৎ-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—"**আদৌ গুরুদেব দেখিবেন যে, শিষ্য উপযুক্ত পাত্র কিনা।** গৃহস্থভক্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তির বলে শম-দমাদি ব্রহ্মস্বভাব লাভ করিয়াছেন কিনা, স্ত্রীসঙ্গ-স্পৃহাশূন্য হইয়াছেন কিনা, অর্থ-পিপাসা ও 'ভাল খাওয়া পরা'র বাঞ্ছা নির্ম্মূল হইয়াছে কিনা, কিছুদিন শিষ্যকে নিজের নিকট রাখিয়া ভালরূপে পরীক্ষা করিবেন। যখন উপযুক্ত পাত্র বলিয়া জানিবেন, তখন ভিক্ষাশ্রমের বেষ দিবেন ; তৎপূর্ব্বে কোন প্রকারেই দিবেন না। **অনুপযুক্ত পাত্রে বেষ দিলে গুরু অবশ্যই পতিত হইবেন।"** (জৈঃ ধঃ, ৭ম অঃ)

কেহ কেহ বলেন,—অত্যন্ত অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিতে গেলে তাহাকে অধিকতর কাম, ক্রোধ, মোহ, আসক্তি, প্রভৃতি অনর্থের মধ্যেই ডুবিতে হয় ; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীশ্রীল

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অত্যন্ত-কামুক-প্রকৃতি বদ্ধজীবের অধিকারে গৃহস্থাশ্রম-স্বীকারের দ্বারাই ক্রমিক-মঙ্গলের কথা অতি সুস্পষ্ট ভাষায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। গৃহস্থগণ হয় পরমহংস, না হয় অতি বদ্ধজীব। বিদ্বদ্গৃহস্থগণের সহিত (যেমন শ্রীজনক, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত-প্রভৃতি) অতিবদ্ধ, ক্রমিক-মঙ্গলকামী গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক কর্ম্মার্পণের উপদেশ-অনুসরণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে একাকার করিতে হইবে না। অত্যন্ত কামী ব্যক্তিগণকে ব্রহ্মচর্য্য-সন্ন্যাসাদি-আশ্রম স্বীকার করাইলে তাঁহারা সেই আশ্রমের মর্য্যাদা কিছুতেই রাখিতে পারিবেন না, কেবল কতকগুলি উৎপাতের সৃষ্টি করিয়া ক্রমিক-মঙ্গলের পথটীকেও রুদ্ধ করিবেন।

এইরূপ ক্রমিক-মঙ্গলেচ্ছু অর্থাৎ বর্ণাশ্রমে অবস্থান-পূর্ব্বক কর্ম্মার্পণরূপ প্রাথমিক ভাগবতধর্ম্মের দ্বারে প্রবেশেচ্ছু গৃহস্থগণের ক্রমে-ক্রমে কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগের চেষ্টাকে একদিনেই 'যুক্তবৈরাগ্য' আখ্যা দেওয়া যায় না। তবে তাহারা ক্রমে ক্রমে যতটা কৃষ্ণপ্রীতির জন্য ভোগত্যাগে পরিপক্ব হইতে থাকিবেন, ততটা যুক্ত বৈরাগ্যের দিকে অভিযান করিতে পারিবেন। অতিবদ্ধ কামুক জীব গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিবামাত্রই তাহাকে যুক্তবৈরাগী বলিলে ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ করা হইবে। বস্তুতঃ যুক্তবৈরাগ্যের পরিপক্কাবস্থাই বিদ্বদ্-গৃহস্থাবস্থা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিকে যেমন শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে "মর্কটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা," "ক্রমে-ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল"—এইরূপ উপদেশ দিলেন, আর একদিকে অকৃত-

দার শ্রীশ্রীল রঘুনাথ ভট্টকে "বিবাহ করিও না, বৈষ্ণব মাতাপিতার সেবন করিও এবং তাঁহাদের স্বধামগমনের পর একান্তভাবে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের আদর্শ অনুসরণ করিও"—এইরূপ উপদেশও দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিভিন্ন পার্ষদগণের দ্বারা বিভিন্ন লীলা-প্রাকট্যের মধ্যেও অধিকার-বিচারের সুস্পষ্ট আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে যে-ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, শ্রীরঘুনাথ ভট্টকে ঠিক সেইভাবে তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগের লীলা করিবার শিক্ষা প্রদান করেন নাই। শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভুর দ্বারাও সেইরূপ শিক্ষা প্রচার করেন নাই। শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে সমস্ত রাজৈশ্বর্য্য ও স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের ন্যায় বৃক্ষতলবাসী হইবার উপদেশ প্রদান করেন নাই। শ্রীবাস-পণ্ডিতের সমগ্র সংসার শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা-তৎপর ছিলেন ; কিন্তু মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের মহিষী-গণ সকলেই বা তাঁহার সকল পুত্রই শ্রীগৌরপাদপদ্মে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন না, ইতিহাসের পৃষ্ঠা ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রের অপ্রকটের পর তাঁহার কোন কোন পুত্র বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া নিহত ও দণ্ডিত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে তাঁহার অধিকারোচিত শিক্ষাই প্রদান করিবার লীলা প্রকট করিয়া-ছিলেন। "গৌরাঙ্গ-বিরোধিজনের মুখ না হেরিব"—এই শিক্ষা বৈষ্ণব-পিতার হৃদয়ে সহজেই উদিত হয়, কিন্তু বিষয়াসক্ত পিতাকে কৃত্রিম-ভাবে জোর করিয়া পুত্রাসক্তি ছাড়াইতে গেলে আসক্ত পিতা গোপনে গোপনে ভণ্ডামি বা কাপট্য শিক্ষা করে। যাহা ভক্তির প্রাকট্যে স্বাভাবিকভাবে উদিত হয়, তাহাকে কৃত্রিম-পন্থায় অসময়ে উৎপাদন

করিতে গেলে হিতে বিপরীত ফল হয়। শ্রীল রায়-রামানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করিবার জন্য রাজ-কার্য্য পরিত্যাগ করিবার লীলা প্রদর্শন করিলে শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীল রামানন্দ রায়কে বলিয়াছিলেন,—

"তোমার যে বর্ত্তন, তুমি খাও সেই বর্ত্তন।
নিশ্চিন্ত হঞা ভজ চৈতন্যের চরণ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ১১।২২)

নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীরায়-রামানন্দ বর্ত্তন না পাইলে কি অর্থাভাবে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না ? শ্রীপ্রতাপরুদ্রের শ্রীরামানন্দের প্রতি এই যে শুদ্ধ-প্রীতি, তাহা কমলাকান্ত বিশ্বাস বা বাউলিয়া বিশ্বাসের শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুকে তিনশত মুদ্রার অধমর্ণরূপে স্থাপন করিয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে উক্ত ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য 'অনুরোধ-পত্রিকা'-প্রেরণের ন্যায় ব্যাপার নহে। আবার শ্রীরামরায়কে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"ঐছে ঘর যাই, কর' কুটুম্ব-মিলন॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ১১।৩৯)

এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামরায়কে শ্রীজগন্নাথ-দর্শন ও তৎসঙ্গে আবার গৃহে গমন করিয়া কুটুম্বগণের সহিত মিলনের কথা বলিলেন কেন ? কেহ কেহ বলিবেন,—শ্রীরামরায় পরমহংস-বিদ্বৎ-শিরোমণি ; তাঁহার কুটুম্ব-দর্শনে জড়াসক্তির কোন প্রসঙ্গই হইতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বটে ; কিন্তু অনধিকারী ব্যক্তিগণকে শ্রেষ্ঠ অধিকারী ব্যক্তিগণের আদর্শ অনুকরণ করিতে দেওয়া যেরূপ বিপ-

জনক, তদ্রূপ অনধিকারীকে কৃত্রিমভাবে স্বজনাসক্তি বা জড়াসক্তি-পরিত্যাগের জন্য বল প্রয়োগও ভক্তির পথ নহে ; ইহা আরোহবাদি-গণের কৃত্রিমপন্থার অবৈধ অনুকরণমাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঋষভদেব বলিয়াছেন, যে, শ্রীবাসুদেবে প্রীতিযোগের উদয় না হইলে কৃত্রিম বল-প্রয়োগের দ্বারা দেহযোগ বা জড়াসক্তি দূর হয় না, ইহা বহু প্রত্যক্ষ উদাহরণের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। কোন কোন ব্যক্তি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় (?) পরম উৎসাহী, এমন কি, উচ্চ কর্ম্মচারিবৃন্দের বিরাগভাজন হইয়াও ছলে-বলে-কৌশলে সাধুসঙ্গের জন্য ব্যস্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন ; কিন্তু চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি একান্তভাবে শ্রীধামবাস, সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গ, শ্রীহরিকথা-শ্রবণের অভিনয় করিয়াও পূর্ব্বের সমস্ত উৎসাহ হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে অধিকতর দেহ গেহাসক্ত, কপটী, অপরাধী ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিক হইয়া গুরুবৈষ্ণবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন।

শ্রীরামরায়ের আদর্শের কথা অনধিকারীকে শিক্ষা দেওয়ার ফলে তাহারা শ্রীরামরায় ও তদভিন্ন-বিগ্রহগণের শ্রীচরণে অপরাধই করিয়াছে। অনধিকারীকে নিষ্কিঞ্চনতা শিক্ষা দিতে গেলে এইরূপই উৎপাত উপস্থিত হয়।

কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারের যথার্থস্বরূপ

ভক্তিরাজ্যে অধিকার বলিতে ত' জানিয়া রাখিয়াছিলাম,—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকার ; সেই সম্বন্ধে একটা মনগড়া পরিমাপ-যন্ত্রও ছিল, যথা—যাঁহারা ঠাকুরসেবা করেন, ফুলতুলসী চয়ন

করেন, চন্দন ঘষেন, ঠাকুরের বাসন মাজেন, ঠাকুরের নৈবেদ্য রন্ধন ও ভোজন করেন, তাঁহাদের অধিকারই কনিষ্ঠাধিকার ; আর যাঁহারা গৃহস্থই হউক, আর অগৃহস্থই হউক, ঠাকুর সেবার কোন প্রকার ধার ধারেন না, তুলসী বা ভগবন্নৈবেদ্যাদির সহিত যাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই, ঠাকুরের ভোগের পূর্ব্বেই যাঁহারা ভোজন, শয়ন বা কর্ম্মক্ষেত্রে গমন করেন, অর্থাৎ যাঁহাদের কোন নিয়ম-তান্ত্রিকতার বালাই নাই, তাঁহাদের অধিকারই মধ্যম অধিকার ; আর মধ্যম অধিকার তাঁহা-দেরই, যাঁহারা মস্তিষ্কের কসরৎ করিয়া বিচার বা সিদ্ধান্তের নামে যে-কিছু স্বকপোল-কল্পনাকে স্থাপন করিতে পারেন ! শাস্ত্রের আনুপূর্ব্বিক ও প্রণালীবদ্ধ অনুশীলন না করিয়াই, শাস্ত্রের উপক্রম-উপসংহারাদির দ্বারা তাৎপর্য্য অবধারণ না করিয়াই নিজের মতবাদ স্থাপন করিবার জন্য যে কোন শ্লোক বা পয়ারের যে-কোনরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, অথবা যাঁহারা অতন্নিরসন বা সাংখ্য-জ্ঞানের অসংলগ্ন বিচার লইয়া মনীষাকে আলোড়ন করিতে পারেন, তাঁহাদেরই মধ্যমাধিকার ! আর উত্তম অধিকারের রহস্য অনেক সময়ই রহস্যাবৃত ; কোন কোন সময় যাঁহারা বেদবিধির অবমাননা করিতে পারেন, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তি, বিষয় চেষ্টা-প্রভৃতিকে নিজ নিজ গণ্ডির স্তাবক বা দালালের দ্বারা অপরের অবাঙ্‌মানসগোচর বলিয়া স্থাপন করিতে পারেন এবং সেই অভিনয়ের অন্তরালে বিষয়-ধুরন্ধরতার সঙ্গে সঙ্গে অতি সুলভে সিদ্ধ পরিচয়, গুরু-শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্তরঙ্গত্ব প্রচার করাইতে পারেন, এই জাতীয় অধিকারিগণই উত্তম অধিকারী !

এইরূপ কাল্পনিক অধিকার-পরিমাপের মানযন্ত্রটির সহিত

শ্রীমদ্ভাগবতের নাম আরোপ করিয়া অধিকার-নির্ণয়ের যে চেষ্টা চলিয়াছিল, উহার কাপট্যনাট্য শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর প্রেরিত কোন মহাজন শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর প্রদত্ত আলোক-বর্ত্তিকাদ্বারা প্রদর্শন করিয়া অধিকার-নির্ণয়ের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "অর্চ্চায়ামেব"-শ্লোক-কথিত 'প্রাকৃত ভক্ত' বা কনিষ্ঠ-ভাগবতের বিচার আমাদের কল্পিত পরিমাপ-যন্ত্রের অনুযায়ী নহে; 'প্রাকৃত' বলিতে প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হেয় বস্তু নহে; যাহার ভক্তি-প্রকৃতি বা স্বভাব সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে, তিনিই প্রাকৃতভক্ত। সেই প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠভাগবত আবার কনিষ্ঠ-সোপানাশ্রিত, মধ্যম-সোপানাশ্রিত ও উত্তম সোপানাশ্রিতভেদে ত্রিবিধ। উত্তম-সোপানাশ্রিত বা মুখ্যকনিষ্ঠ অজাতপ্রেমা ও শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধা-যুক্ত, সুতরাং কনিষ্ঠাধিকারী বলিয়া ডিক্রী ডিস্‌মিস্‌ করিলে চলিবে না। কনিষ্ঠভাগবতগণের মধ্যে যে ত্রিবিধ অধিকার, সেই অধিকার-অনুযায়ী ব্যবহার ও অনুশীলন করিতে হইবে। সাধক ও সিদ্ধের কায়িক, বাচিক ও মানসিক লক্ষণের দ্বারা অধিকার-বিচার হয়। মস্তিষ্কের দ্বারা সাংখ্যযোগের দুই-চারিটি কথা তোতাপাখীর ন্যায় বলিতে পারিলেই তাহাকে মধ্যমাধিকারী বলা যায় না। "মধ্যমভাগবত" সৎ বা সাধক নহেন, তিনি মহাভাগবতের অন্যতম; তিনি মহৎ অর্থাৎ সিদ্ধ। সেই মধ্যম মহাভাগবতের মধ্যে আবার কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম শ্রেণী আছে। উত্তম মহাভাগবতও আবার তাঁহার আবেশ ও স্মৃতির তারতম্য-অনুসারে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম শ্রেণীর হইয়া থাকেন।

অধিকার-লংঘনাশঙ্কায় জাড্যরূপ বহির্ম্মুখতা

অত্যন্ত জড়াভিনিবিষ্ট অপরাধী জীবের ভক্তিশিথিলতা-স্বভাব হইতে উন্নত অধিকারে আরোহণের প্রতি নৈসর্গিক জাড্য উপস্থিত হয় ; কারণ, উন্নততর অধিকারে আরোহণের আনুষঙ্গিক ফল 'কৃষ্ণ-প্রীত্যে ভোগত্যাগ' ; তাহা জড়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তি করিতে প্রস্তুত নহে. সে পানাপুকুরে আবৃত বদ্ধ জলের ন্যায় চিরকাল একই জাড্যভাব লইয়া থাকিতে ভালবাসে। অনেক সময় কৃষ্ণপ্রীতিতে ভোগত্যাগ করিতে হইবে, এই আশঙ্কায় দৈন্যের আবরণে নিজের ক্ষুদ্র অধিকার জ্ঞাপন করিয়া ক্রমশঃ নিম্ন হইতে নিম্নতর পিচ্ছিলপথে পতিত হইতে থাকে। এইরূপ ক্ষুদ্রাধিকার-নিষ্ঠায় অত্যাগ্রহ দেখিয়া প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী নিরস্ত হন না। পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেব সেইরূপ ব্যক্তিরও ক্রমিক-মঙ্গল বিধান করেন ; তাহাকে ক্রমে ক্রমে উন্নততর অধিকারে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন। তাহার বদ্ধাবস্থা ও জাড্যকে প্রশ্রয় দেন না ; আবার তাহাকে অধিকার-বহির্ভূত কোন সোপানে অকস্মাৎ আনয়ন করিয়া চিরতরে পঙ্গু করিয়া দেন না ; তাহাকে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিবার প্রণালী শিক্ষা দেন।

অনুকরণ ও অধিকার

অনুকরণ করিয়া কোন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। এমন অনেক ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা অপর ব্যক্তিকে সংসার ত্যাগ করিতে দেখিয়া নিজের সেইরূপ ভজনবল বা হৃদয়ের বল না থাকিলেও দেখাদেখি সংসার ত্যাগ করেন। কেহ কেহ বা দেখাদেখি দীক্ষা-গ্রহণের অভিনয়, শ্রীহরিনাম-গ্রহণের অভিনয়,

সঙ্ঘে থাকিবার অভিনয়, শরণাগত হইবার অভিনয়, শ্রীধামবাসের অভিনয় প্রভৃতি করিয়া থাকে। এই সকল অনুকরণ-চেষ্টা যোগ্যতা বা অধিকারোচিত চেষ্টা নহে। কারণ, কিছুদিন পরেই এই অনুকরণ-চেষ্টা ধরা পড়ে। যে অপরকে দেখিয়া উচ্ছ্বাসভরে ঐ সকল কার্য্য করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি বেশীক্ষণ তাহা সংরক্ষণ করিতে পারে না। তাহার হৃদয়ে বিষয়পিপাসা আরও প্রবলভাবে জাগিয়া উঠে এবং সুদে-আসলে ক্ষতি-পূরণ আদায় করে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (২।৫৯) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জংরসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।।"

যিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করেন না, এইরূপ জীবের নিকট ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু আসক্তি নিবৃত্ত হয় না, পরন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়বাসনা পরতত্ত্বকে দর্শন করিয়া আপনিই নিবৃত্ত হয়।

উৎকৃষ্ট রস না পাইলে নিকৃষ্টরস কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে না ; কারণ, রসাস্বাদন করাই জীবের স্বভাব। কেবল বিষয় হইতে জীবকে দূরে রাখিলে বিষয়-গ্রহণের পিপাসা বা মূল-বীজ নষ্ট হয় না। স্ত্রীসঙ্গ হইতে দূরে রাখিলে জীবের নৈসর্গিক স্ত্রীসঙ্গলিপ্সা নির্ম্মূল হয় না, বরং বিরহে সম্ভোগের অধিকতর পুষ্টি অর্থাৎ স্মৃতি, আবেশ ও অভিনিবেশ আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কোন কোন কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের মতবাদানুসারে বিষয় হইতে কৃত্রিমভাবে দূরে রাখিয়া বিষয় ভুলাইবার চেষ্টা হয় বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। রসময়ী ভক্তি সেইরূপ

কৃত্রিমপন্থা শিক্ষা দেন না। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলেন,—

"স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব।"

রসরাজের শ্রীচরণামৃত-রস অনুভব না করা পর্য্যন্ত কেহ কুরস, বিরস বা অপরস পরিত্যাগ করিতে পারে না।

ক্রমানুসরণ

রসরাজের এই রস আস্বাদন করাইবার প্রণালী মহাভাব-বিগ্রহ মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর শিক্ষা দিয়াছেন। সেই শিক্ষার মধ্যে ক্রম আছে। শ্রীরায়-রামানন্দসংবাদে অধিকারানুযায়ী ক্রম-নির্দ্দেশ আছে। মহতের বিশেষ-কৃপায় কোন কোন ব্যক্তির ক্রমবিপর্য্যয়সত্ত্বেও তদুপায়ে ভক্তিলাভের দৃষ্টান্ত সাধারণ বিধি হইতে পারে না। শরণাগতি বৈধী ভক্তির অন্যতম, কিন্তু যাহার লৌকিক-শ্রদ্ধার অঙ্কুরমাত্র হইয়াছে, তাহাকে একদিনেই শরণাগত করা যায় না। বৈধী ভক্তিতে শাসন বা দণ্ডের বিধান আছে, কিন্তু শাসন বা দণ্ডদ্বারা পরিচালনা করিয়া কাহাকেও একমুহূর্ত্তে শরণাগত করা যায় না। পুনঃ পুনঃ মায়ার ঘাত-প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া অন্য উপায় না দেখিয়া সাধারণ নিত্যবদ্ধ জীব শরণাগত হয়। সেই ক্রম, সময় ও যোগ্যতা অস্বীকার করিলে হিতে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। সাধকের শত শত দোষ-ত্রুটীসমূহ বিশ্লেষণ করিয়াও সাধকের কোন মঙ্গল করা যাইবে না, কিন্তু শ্রৌত-শাস্ত্রসম্মত অধিকার নির্ণয় করিয়া সদ্‌বৈদ্যের দ্বারা সুচিকিৎসা হইলে অবশ্যই ফললাভ হইবে।

নিম্নাধিকারীর প্রতি অহৈতুকী কৃপা

অবশ্য ইহাও সত্য যে, এরূপ অনেক সদ্‌বৈদ্য আছেন, যাঁহারা এতটা নিম্ন-ভূমিকায় অবতরণ করিয়া চিকিৎসা করেন না। সেইরূপ কোন কোন সদ্‌গুরুপাদপদ্ম সকল সময়েই পাঠশালার বিদ্যাশিক্ষা দান করিবার জন্য প্রস্তুত হন না। যিনি অধ্যাপকগণেরও অধ্যাপক বা যিনি কলেজ্‌ ইন্‌স্‌পেক্টার, তাঁহার পাঠশালার বিদ্যা বা 'ক', 'খ' শিক্ষা দিবার সময় নাই। তবে কখনও তিনি যদি স্বেচ্ছায় কৃপাপূর্ব্বক পাঠশালা পরিদর্শন করিতে গমন করেন, তখন ছেলেদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য 'ক', 'খ'-সম্বন্ধে প্রশ্ন, বা 'ক' 'খ' শিক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু ইহা তাঁহার চিরস্থায়ী ভূমিকা নহে ; তিনি নিত্য যে ভূমিকায় অবস্থান করেন, তাহাতে তিনি পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট্‌ বা অধ্যাপকগণেরই 'থিসিস্‌' পর্য্যবেক্ষণে রত। তবে এই জগতে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট্‌ বা ডক্টরের সংখ্যা অতি অল্প ; স্বর্ণ ও হীরক অত্যন্ত কম, মাটির পরিমাণই বেশী। সাধকগণের মধ্যেও অনন্যা ভক্তির ঐকান্তিক-সাধক খুব বিরল।

সময়ের পরিপক্কতা

সাধনরাজ্যে অধিকারবিচার ও সময়বিচার—উভয়ই আবশ্যক। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—যখন জীবের সংসারক্ষয়ের সময় হয়, তখনই মহতের দর্শন ঘটে। সময় না হইলে মহতের কৃপা হয় না। সাধারণ জীবজগৎ জন্মজন্মান্তর বাসনারাজ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে। সেই সময় হইবার পূর্ব্বে কেহ জোর করিয়া লক্ষ

লক্ষ বা কোটি কোটি জন্মের সংসার-বাসনাকে একমুহূর্ত্তে দূর করিতে পারে না ; তবে আবার মহতের বিশেষ কৃপায় একমুহূর্ত্তও না লাগিতে পারে। কেহ কেহ সঙ্ঘের মধ্যে একত্রিত হইয়াছেন বা শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের অভিনয় বা সেবার অভিনয় করিতেছেন বা হরিকথা-শ্রবণের অথবা মহতের দর্শন-স্পর্শনাদির অভিনয় করিতে-ছেন বলিয়াই যে তাঁহারা মহতের কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাও বলা যায় না। কারণ, কার্য্যের দ্বারাই কারণ নির্ণয় করা হয়। মহতের কৃপালাভ হইলে সংসার-বাসনা অর্থাৎ কোনরূপ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাসনা থাকিবে না ; কেবল অভীষ্টদেবের সুখানু-সন্ধান-স্মৃতিরই আবেশ থাকিবে। ইহারই নাম মহতের প্রকৃত কৃপা। অতএব সেইরূপ মহৎকৃপা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত অধিকার-বিচার ও সময়ের অপেক্ষা—উভয়ই করিতে হইবে। দশ বৎসর, বিশ বৎসর, পঁচিশ বৎসর হইল হরিভজন করিতে আসিয়াছি বলা ত' দূরের কথা, পঞ্চাশ বৎসর, এক জন্ম, দুই জন্ম, এক লক্ষ জন্ম বা বিশ লক্ষ জন্মও চলিয়া যাইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঋষভদেব বলিয়াছেন—"শ্রীবাসুদেব আমাতে যেকাল পর্য্যন্ত প্রীতি না হইবে, সেকাল পর্য্যন্ত জীবের দেহবন্ধন হইতে মুক্তি হইতে পারে না" (ভা ৫।৫।৬)। এই দেহযোগ হইতে মুক্তি একমাত্র ভগবৎ-প্রীতির আনুষঙ্গিক ফল। আবার ভগবৎপ্রীতি মহতের কৃপাসাপেক্ষ। আমরা হয় ত' মনে করি,—'আমরা ত' সর্ব্বক্ষণ মহতের সঙ্গে বাস করিতেছি'—কেহ কেহ বা বলিব, "মহতের পরিচর্য্যা, মহতের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা

শ্রবণ করিতেছি অর্থাৎ মহতের পরিচর্য্যা ও প্রসঙ্গরূপা সেবা করিতেছি ; যদি আমাদের মহতের পরিচর্য্যা ও প্রসঙ্গসেবা সেবা হয়, তবে তাহার ফলও নিশ্চয়ই হইবে।”

মহতের পরিচর্য্যার ফল-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, মহতের পরিচর্য্যার দ্বারা তাঁহার পাদপদ্মে রতিরাস বা প্রেমোৎসবের উদয় হয় এবং আনুষঙ্গিকভাবে সংসারাসক্তি বা দেহাসক্তি দূর হয় (ভা ৩।৭।১৯); আর যাঁহারা শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-সৌরভ-লুব্ধ সাধুগণের সঙ্গ করেন, তাঁহাদের সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-সুখানুসন্ধান-স্মৃতি বা আবেশ থাকে এবং তাঁহারা অতিপ্রিয় এই মর্ত্ত্য শরীর ও ইহার অনুগত স্ত্রী-পুত্র, গৃহ-সুহৃৎ-প্রভৃতির স্মরণ স্বাভাবিকভাবেই করেন না।

‘কৈ, আমাকে ত’ লাঠি মারিয়াও দেহ-গেহাসক্তি হইতে, সংসারস্মৃতি হইতে সাধুগণ রক্ষা করিতে পারিতেছেন না? শ্রীভগবানে রতিরাসের কথা ত’ আমার কাছে স্বপ্নের তুল্য ; শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের ত’ অনেক অভিনয় করিতেছি, কিন্তু এই মর্ত্ত্যশরীর ও ইহার অনুগত বস্তুর প্রতিই ত’ সর্ব্বক্ষণ স্মৃতি ও অভিনিবেশ রহিয়াছে ; ভগবৎস্মৃতি ত’ এক মুহূর্ত্তও হয় না।’ ইহার কারণ নির্ণয়ে মহাজনগণ বলেন,—যখন তোমার মহতের অনুক্ষণ-সঙ্গাদি-লক্ষণভক্তিদ্বারাও জড়াভিনিবেশ, ভক্তিশিথিলতা-প্রভৃতি দূর হইতেছে না, তখন তাহা নিশ্চয়ই কোন পূর্ব্বাপরাধেরই ফল।

আমার ব্যাধির এই নিদান মহাজনরূপী সদ্‌বৈদ্য নির্ণয় করিয়া

দিলেন আর অপরাধ দূর করিবার যে বিধান, তাহাও বলিয়া দিলেন—(১) মহতের নিকট বিগলিত-হৃদয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করা, (২) কোন্ মহাজনের নিকট অপরাধ হইয়াছে জানিতে না পারিলে সর্ব্ব-মহতেরই প্রাণবন্ধু শ্রীহরিনামের অবিরাম অনুশীলন করা, আর (৩) তাহাও না পারিলে জন্ম-জন্মান্তর কষ্ট ভোগ করিয়া অপরাধের ক্ষয় করা অর্থাৎ অপরাধ-ক্ষয়ের জন্য সময়ের অপেক্ষা করা।

প্রথম দুইটি ঔষধ আমার পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন। বাহিরে মহতের নিকট আমি ক্ষমা-ভিক্ষার অভিনয় করিলেও বিগলিত-হৃদয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পারি না। হৃদয় ত' অপরাধে প্রস্তর হইয়া রহিয়াছে, একবিন্দুও জল চক্ষে আসে না—হৃদয় গলে না। দ্বিতীয় প্রকার ঔষধটিও আমার পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। শ্রীহরিনামে একটুকুও রুচি নাই, অবিরাম অনর্গল হরিনাম গ্রহণ করার কথা ত' আমার পক্ষে 'আকাশ-কুসুমে'র ন্যায় অলীক। সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাকে তৃতীয় প্রকার ব্যবস্থাই গ্রহণ করিতে হইতেছে, জন্মজন্মান্তর সংসারক্লেশরূপ দণ্ড ভোগ করিতে করিতে যদি কোনদিন অপরাধের ক্ষয় হয়, এই আশায়।

এখন আমার এইরূপ অধিকারে বা এইরূপ অধিকারভুক্ত সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের দেহ-গেহাসক্তি কি আত্মহত্যা করিলেই দূর হইবে? অপার করুণাময় অদোষদর্শী সাধুগণ কি এইরূপ অধিকারেও জীবের মঙ্গলের ব্যবস্থা করিয়াছেন? এইরূপ অধিকারের লোকসংখ্যা বহির্ম্মুখবিশ্বে কম নহে। কাহারও বা মহতের সঙ্গে

থাকিবার অভিনয় করিয়াও তাঁহার বাণীর প্রতি রুচিই হইতেছে না, কাহারও আপাত রুচি দেখা গেলেও সাধুর সঙ্গ-প্রভাবে উত্তরোত্তর উন্নত হওয়ার পরিবর্ত্তে যেন আরও অধঃপতনের দিকেই গতি দেখা যাইতেছে। প্রথম দিকে যে উৎসাহ ও জড়াসক্তি-ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, কিছুদিন পরে আর সেই উৎসাহ থাকে না. দৈন্যের পরিবর্ত্তে জড়াহঙ্কার, জড়াসক্তির প্রতি শৈথিল্যের পরিবর্ত্তে ভক্তিশৈথিল্য ও অধিকতর জড়াসক্তি দৃষ্ট হয়। এইরূপ অধিকারের ব্যক্তিগণ কি একেবারেই দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে অথবা ইহাদেরও ক্রমে ক্রমে মঙ্গল হইতে পারে? সঙ্ঘারামে এই অধিকারের ব্যক্তিগণের চিকিৎসার দুইটি চরম-প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়—(১) ইহাদিগকে দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া সম্পূর্ণ পরিবর্জ্জন করা ও (২) ইহাদিগকে একদিনেই কেবলা ভক্তির রাজ্যে আনয়ন করিবার জন্য প্ররোচনা বা চাপ দেওয়া।

এই দুইটি চরম প্রণালীই কি তাহাদের পক্ষে মঙ্গলদায়িকা? বরং একেবারে পরিবর্জ্জনের দ্বারা কখনও কখনও কাহারও নির্ব্বেদ দেখা যায়, কিন্তু ইহাদিগকে রাতারাতি সাধু করিয়া ফেলিবার যে প্রচেষ্টা ও প্ররোচনা দেখা যায়, তাহা নিশ্চয়ই সাধকের অধিকার লঙ্ঘন করাইবার চেষ্টা। নিম্নাধিকারীকে গায়ের জোরে উচ্চাধি-কার প্রদান করা যায় না, প্রদান করিলেও তাহা থাকে না। তবে মহতের স্বতন্ত্র-কৃপাশক্তির কথা পৃথক্।

মিথ্যাচার

গায়ের জোরে উচ্চাধিকার প্রদান ও গ্রহণের ফলে অনেক

আত্মমঙ্গলেচ্ছু সংসাধকও 'মিথ্যাচার' হইয়া পড়ে। এইজন্যই শ্রীভগবদ্গীতায় (৩।৬) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহকে নিগৃহীত করিয়া ভগবদ্-ধ্যানচ্ছলে মনে মনে বিষয়-সমূহ স্মরণ করিয়া অবস্থান করে, সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি কপটাচার 'দাম্ভিক' বলিয়া কথিত হয়। অনেকে প্ররোচনায় পড়িয়া বা প্রতিষ্ঠাশালাভের জন্য রিপুর তাড়না ও কর্ম্মের পূর্ণ-বাসনা থাকা সত্ত্বেও বাক্পাণি-প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়কে নিগৃহীত করিয়া ত্যাগীর আশ্রমে, মঠে বা সঙ্ঘে বাস করিয়া ভগবদ্ধ্যান বা হরিকথায় মগ্ন থাকিবার অভিনয় করে। কিন্তু তাহাদের মনটী সর্ব্বক্ষণ দেহ-গেহ-চিন্তাতে অভিনিবিষ্ট থাকে। উপস্থাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বাহ্যে নিগ্রহ করিলে কি হইবে, মনে মনে তাহারা আরও অধিকতর কাপট্যের সহিত চিন্তাদ্বারা মানসে বা কখনও স্থূলভাবে বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। বরং তাহারা যদি গৃহাদিতে থাকিয়া বৈধ জীবন যাপন করিত, তাহা হইলে ত্রিতাপের তীব্র জ্বালার অবিরাম-অনুভূতি হইতে বিষয়ের প্রতি ধিক্কার উপস্থিত হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া অপরের প্ররোচনায় বা প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির জন্য কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিয়া ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন থাকিবার অভিনয়ে তাহারা দেহগেহের চিন্তা যতটা করা প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক করিয়া থাকে। ভোগ্য-বস্তুর কৃত্রিম ত্যাগ-জনিত বিরহে তাহাদের সম্ভোগলালসা হৃদয়ের

মধ্যে তুষানলের ন্যায় জ্বলিতে থাকে। কেবল তাহারা সরাগ বক্তার ন্যায় মঠ, আশ্রম বা বিরক্তগণের সঙ্ঘে থাকিয়া মুখে বাক্য-বাগীশ মাত্র হয়। ইহাদের এই ব্যবহার নিশ্চয়ই লোকনাশের জন্য হইয়া থাকে। এই যে দ্বিজিহ্ব-ব্যবহার, ইহা জগতের পক্ষে ভয়াবহ অনিষ্টকর, নিজের পক্ষে ত' অনিষ্টকর বটেই। অধিকার-বহির্ভূত ধর্ম্মাচরণের অভিনয় দেখাইতে গিয়া ইহারা 'দুই নৌকায় পা দেওয়া'র নীতি অবলম্বন করে এবং বিষয়ের অতলজলে ডুবিয়া প্রাণ হারায়। মহাজনগণ বলিয়াছেন,—অন্তরে বিরাগগ্রস্ত থাকিয়া বাহিরে বিষয়িপ্রায় থাকিলে ভজনবৃদ্ধি হয়। কিন্তু অধিকার-বহির্ভূত কার্য্য করায় অনেকে বাহিরে বৈরাগী সাজিয়া অন্তরে বিষয়ী হইয়া পড়ে। অধিকার-লঙ্ঘনের ফলে এই মিথ্যাচাররূপ ফল অবশ্যই লাভ হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন—'মিথ্যাচার' না হইয়া হৃদয়ের কথা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট খুলিয়া বলিলে শ্রীগুরুদেব তদনুযায়ী অধিকার নির্ণয় করিতে পারেন। জৈবধর্ম্মে (৮ম) দেখিতে পাওয়া যায়—শ্রীহরিদাস বাবাজীমহাশয় শ্রীনিত্যানন্দদাসের চিত্তবৃত্তির অবস্থার অকপট বর্ণন শ্রবণ করিয়া তাঁহার অধিকার নির্ণয় করিয়াছিলেন।

সঙ্ঘের মধ্যে থাকিয়া সকল ক্ষেত্রে এইরূপে অকপটে নিজ-চিত্তবৃত্তির অবস্থা-বর্ণন সম্ভবপর হয় না। প্রথম বাধা এই যে, সঙ্ঘে একটু সেবার অভিনয় দেখাইলেই সঙ্গে সঙ্গে হস্তে একটি প্রতিষ্ঠার পতাকা উপহার পাওয়া যায় অর্থাৎ নানা প্রকার উপাধি

ও প্রশংসাপত্রাদি বা সঙ্ঘের কোন বিশিষ্ট পদ লাভ হয়। বদ্ধ-জীবের পক্ষে প্রতিষ্ঠাশার এমনি মোহ যে, উহা ত্যাগ করিয়া বদ্ধজীব কিছুতেই নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতে পারে না। কেহ কেহ নিজের অবস্থা কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারিলেও যদি সে লাজুকপ্রকৃতি অথবা ভীরু-স্বভাব হয় এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে সমালোচনার বাণ বর্ষিত হইবে বলিয়া শঙ্কিত হয়, তবে সেইরূপ সাধকের নিজের অবস্থা অকপটে বর্ণনা করা অনেক সময়েই কার্য্যতঃ হইয়া উঠে না, তাহাতে ভিতরে ভিতরে নালি-ঘা বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং অকস্মাৎ একদিন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

সঙ্ঘে থাকিবার অভিনয়কারী এইরূপ শত শত প্রতীক দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, যাঁহাদের নিকট মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বা দেহ-গেহ বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার নামোচ্চারণ করিলে তাঁহারা তৎপ্রতি উৎকট-বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেন; মনে হয়, তাঁহাদের ঐ সকল মায়িক বস্তুর প্রতি বিন্দুমাত্রও আসক্তি নাই। এমনও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—মঠে পিতা ও পুত্র উভয়েই আছেন; পিতা পুত্রের দিকে ভ্রমক্রমেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না, যেন কাষ্ঠ-প্রস্তরের ন্যায় পরস্পর স্পন্দন রহিত; কিন্তু মঠের সীমা অতিক্রম করিবার পরই যখন তাঁহারা গোপনে মিলিত হন, তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া কত যে সুখ-দুঃখের কথার বিনিময় করেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ভগবদ্ধামে মাতা-পুত্র, স্বামি-স্ত্রী পৃথগ্‌ভাবে বাস করিতেছেন; মনে হইতেছে যে, উভয়েই শ্রীধামের শরণাগত, পরস্পর আসক্তি-

হীন কিন্তু সেবানুরোধে (?) বা কোনও কারণে পরস্পর দূরবর্ত্তী হওয়ায় তাঁহাদের জড়াসক্তির প্রচ্ছদপটটী নানা আকারে উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। অনেকে কৃত্রিমভাবে শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার অধিকার, ব্যবহারে অকার্পণ্য প্রভৃতি প্রদর্শন বা অভ্যাসযোগের দ্বারা আয়ত্ত বা অনুকরণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহা রক্ষা করিতে পারেন না এবং 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ' হইয়া পড়েন।

এই যে কপটাচার, ইহার মূলে কি আছে ? অনধিকারীকে ছলনাময়ী বা সগুণা ভক্তির উচ্চাধিকারে কৃত্রিম পন্থায় বা তথাকথিত অভ্যাসযোগের দ্বারা আরোহণ করাইয়া এইরূপ জড় প্রতিষ্ঠাশায় আসক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সে ভয়ে, লজ্জায় বা সঙ্কোচে কৃত্রিম আত্মসম্মান বজায় রাখিবার অভিসন্ধিতে ঐরূপ মিথ্যাচার হইতে বাধ্য হইয়াছে। অশ্রদ্দধান বা লৌকিক-শ্রদ্ধালুকে শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার অধিকারে কৃত্রিমভাবে আরোহণ করাইতে গেলে অনর্থযুক্ত জীব মিথ্যাচার হইতে বাধ্য হয়।

এই জাতীয় ব্যক্তিবাহিরে নির্ব্বাত-নিষ্কম্প প্রদীপবৎ সম্পূর্ণ মৌনী, অবিক্ষুব্ধচিত্ত ও অনাসক্ত বলিয়া মনে হইলেও তাঁহার ভিতরে আন্দোলনের আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হইয়া রহিয়াছে। ঐ নীরবতা ও নিস্তব্ধতার মধ্যে তিনি সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছেন। বহির্ম্মুখতার যে চিরন্তন স্বভাব, সেই স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কখনও দেখিতেছেন,—'অপর ব্যক্তিকে ভোগে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, আমার বেলায় তাহার বাধা পড়িয়াছে।' এইরূপ বিচার করিয়া সেই ব্যক্তি কখনও ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী, কখনও বা

বিদ্বেষী হইয়া পড়িতেছেন। অবশ্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্য থাকিলেই এই সব উৎপাত উপস্থিত হয়।

স্ব-স্ব অধিকারে নিষ্ঠাই সিদ্ধির সোপান

যদি কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শতকরা ৮০ জন ছাত্র কৃতিত্ব লাভ করেন, তবেই সেই শিক্ষায়তনের মহত্ত্ব প্রমাণিত হয়; আর যদি শতকরা ৮০ জন ছাত্রই অকৃতকার্য্য হয় অথচ যদি সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সকলেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পারদর্শিতার খ্যাতি থাকে, তবে কি স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হয় না যে, অনধিকারী ছাত্র-গণকে উচ্চ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিবার ফলেই ঐরূপ অকৃতকার্য্যতা হইতেছে ?

অধিকার নির্ণয় না করিয়া যতই কিছু সাধন-ভজনের বা মঙ্গলজনক উপদেশ-প্রদানের চেষ্টা করা হউক, তাহা হস্তিস্নানের ন্যায় সাময়িক ও নিরর্থক হইয়া পড়ে। রোগীর কেবল রোগ-নির্ণয় হইলেই বা রোগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিলেই তাহার কখনও রোগশান্তি হয় না, অধিকারোচিত বাস্তব চিকিৎসাও প্রয়োজন।

কেহ কেহ বলেন—'প্রকৃত ভজনকারীর সংখ্যা চিরকালই সুদুর্ল্লভ, এজন্য বহুলোক ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অভিনয় করিলেও তন্মধ্য হইতে দুই-একজন উত্তীর্ণ হ'ন অর্থাৎ যথার্থ ভজনে প্রবেশ লাভ করেন।' এই যুক্তির উত্তর এই যে, পোষ্ট্‌গ্র্যাজুয়েট্ বা ডক্টরের সংখ্যা খুব মুষ্টিমেয় হইতে পারে, কিন্তু যাহাদের বর্ণ-পরিচয় পর্য্যন্ত হয় নাই, তাহাদিগকে উচ্চ-শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া সাময়িক

প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টার ফলে যদি শতকরা নিরানব্বই জনের পতনের ইতিহাস পরিদৃষ্ট হয়, তবে সেইরূপ অন্তর্ত্তীর্ণ ব্যক্তির সংখ্যা-দ্বারা কি জগন্নাশ হইবেন না? ঐ সকল ব্যক্তির ক্রমিক মঙ্গলের পথও চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। উচ্চতম-শ্রেণীর ছাত্র বা সাধক মুষ্টিমেয় হইবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু নিম্নতর-শ্রেণীর ছাত্রগণ কি সেই সেই শ্রেণীতে সকলেই চিরকাল অকৃতকার্য্যই হইতে থাকিবেন? স্ব-স্ব অধিকারানুযায়ি-শ্রেণীতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াই ক্রমে ক্রমে উচ্চতম-শ্রেণীতে আরোহণের অধিকার-লাভ হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,— **"স্বীয় স্বীয় অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয় এবং অধিকারচ্যুত হইলে পতন হয়।" (সঃ তোঃ ১০।৬, 'শ্রীপুরুষোত্তমমাস-মাহাত্ম্য')**

ভক্তি-প্রতিষ্ঠানে বহুদিন অবস্থান বা ভক্তির কথা বহুদিন আলোচনা করিবার অভিনয় করিলেই বা অধিক বয়স হইলেই যে বৈরাগ্যের অধিকার হইবে, তাহা নহে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"কেবল বয়সকে অধিকারের মূল বলা যায় না। অনেক বৃদ্ধ পুরুষ মনে মনে হামাগুড়ি দিয়া থাকেন। সে-সকল বৃদ্ধের যখন বৈরাগ্য হয় না, তখন বয়সকে বৈরাগ্যের মূল কারণ বলা যায় না।" —(সঃ তোঃ ৮।১০)

ভাগবতধর্ম্মে অধিকার-নির্ণয়

শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম-যাজনের আভাসেও পতন ও স্খলন হয় না;

অথচ যাঁহারা ভাগবত-ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা যাজন করিতেছেন বলিয়া দাবী করেন, এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনকেই অধিকাংশ সময় স্খলিত, পতিত, ভ্রষ্ট ও বিপথগামী হইতে দেখা যায় ; তাহা হইলে কি শ্রীমদ্ভাগবতের কথা মিথ্যা অথবা যাঁহারা ভাগবতধর্ম্ম যাজন করেন বলিয়া দাবী করিতেছেন, তাঁহারাই কি অন্য কিছু করিতেছেন ? শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী মিথ্যা নহে। শ্রীভাগবতধর্ম্মোপদিষ্ট অধিকারানুযায়ী পথ অনুসরণ না করায় এই সকল অনর্থ ও উৎপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাগবতধর্ম্মে স্খলন ও পতনের আশঙ্কা নাই বটে, কিন্তু তাহাতে অধিকারের বিচার আছে।

যাহার কর্ম্মকাণ্ডে কিংবা কর্ম্মার্পণে অধিকার, তাহাকে তথা-কথিত মঙ্গলকামী বা শুভেচ্ছাবাদী হইয়া অকিঞ্চনা ভক্তি বা শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার অধিকারী সাজাইয়া দিলে বিপথগামীই করা হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত এই অধিকারলঙ্ঘনকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীনারদগোস্বামী নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ হইয়াও লোকশিক্ষা-কল্পে নিজ পূর্ব্বজন্মের অধিকারোচিত সাধনলীলার কথা নিজ শিষ্য শ্রীব্যাসদেবের নিকট বর্ণন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কোনও শুভেচ্ছাবাদীই অধিকার লঙ্ঘন বা অপরের কৃত্রিম অনুকরণ করিয়া একজন্মে বিদ্যুৎগতিতে অকিঞ্চনা রাগময়ী ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সমস্তই মহতের কৃপা ও সাধকের কৃপাশক্তি-ধারণ-যোগ্যতার উপর নির্ভর করে।

শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু গুরু ও শিষ্য উভয়েরই

যথাক্রমে—কৃপা-শক্তি-সঞ্চার-সামর্থ্য ও তদ্‌বরণ-সামর্থ্যের তারতম্যানুসারে ফললাভের তারতম্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অকিঞ্চনা ভক্তির দাতা ও গ্রাহক—গুরু ও শিষ্য উভয়েই নৃলোকে সুদুর্ল্লভ। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপের একান্ত অনুগবর অকিঞ্চনাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা বরণ করিবার অধিকার জগতে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনুকরণ করিয়া সেই অকিঞ্চনা সুতীব্রা রাগময়ী ভক্তি-লাভের অধিকার হয় না। সাধারণ জীব অতি প্রাথমিক ভাগবত-ধর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণের পথে যাহাতে চলিতে শিক্ষা করে তজ্জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু সেই কর্ম্মমিশ্রাধিকারে গৃহি-গুরু-গ্রহণের ব্যবস্থা (হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৪) পর্য্যন্ত দিয়াছেন। সর্ব্বহারা নিষ্কিঞ্চন-শ্রেষ্ঠ শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবের প্রতি যে তীব্র আবেশময় ভক্তিযোগের উপদেশ প্রদান করেন তাহা সেইরূপ অকৃত্রিম অধিকারীই অসমোর্দ্ধ সৌভাগ্যফলে বরণ করিয়া ধন্যাতি-ধন্য হন। দেখাদেখি অনুকরণ করিয়া বা 'শুনিতে বড় ভাল' এইরূপ মনোভাবে চালিত অনধিকারী হইয়া উচ্চ অধিকারের অনুকরণ করিলে, লৌকিক শ্রদ্ধালু হইয়া শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাধিকারীর ন্যায় অভিনয় করিলে, কর্ম্মাধিকারী বা কর্ম্মমিশ্র-অর্চ্চনাধিকারী হইয়া অকিঞ্চনা ভক্তি-যাজনের সজ্জা গ্রহণ করিলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

অতএব শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীরূপের শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর (পূ ২।৩৬) সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন, — "তদেবং কর্ম্মার্পণ-কেবলজ্ঞান-কেবল - ভক্ত্যোঃ-

ধিকারিভেদেন ব্যবস্থাপিতাঃ ; ততঃ স্বাধিকারানুসারেণৈব স্থাতব্য-মিত্যাহ—'স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ' ইতি" (ভঃ সঃ ১৭৪-১৭৫ অনুচ্ছেদ) ; অর্থাৎ অধিকারীভেদে কর্ম্মার্পণ, কেবল-জ্ঞান ও কেবল-ভক্তি ব্যবস্থাপিতা হইয়াছে। অতএব নিজ নিজ অধিকারানুসারেই অবস্থান করা কর্ত্তব্য। এই হেতু শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—'নিজ নিজ অধিকার-বিষয়ে যে নিষ্ঠা, তাহাই গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।'

—*—

পুরুষাভিমান

শ্রীশ্রীগৌরশক্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

'সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়া,
পুরুষ-অভিমানে মরি।'

অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের 'আমি ভোক্তা' এইরূপ দেহাত্মবোধ-জাত যে জড়-অভিমান, তাহাই 'পুরুষাভিমান'। কি পুরুষরূপধারী, কি নারীরূপধারী স্বরূপবিস্মৃত প্রাণিমাত্রেই ন্যূনাধিক পুরুষাভিমানে অভিভূত। পুরুষাভিমানের মূলে আনন্দের অনুসন্ধান আছে, কিন্তু তাহা খণ্ডানন্দ— ভূমানন্দ বা নিত্যানন্দ নহে। এক অণুচৈতন্য

আর এক অণুচৈতন্যের নিকট আনন্দের আশা করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না, কেবল মৃত্যুকেই বরণ করে। এইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন,—'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।' অণুচৈতন্য বিভুচৈতন্যের ক্রোড়ীভূত না হইলে নিত্য ও অখণ্ড আনন্দের অধিকারী হইতে পারে না। কারণ, বিভুচৈতন্যই অখণ্ড আনন্দের আকর। সূর্য্যের সহিত যখন সূর্য্যকিরণ-কণ সংশ্লিষ্ট থাকে অথবা অগ্নিকুণ্ডে যখন অগ্নিকণ যুক্ত থাকে, তখনই সেই আলোকের স্থায়িত্ব, কখনই তাহা অন্ধকারের দ্বারা অভিভূত হয় না। মায়াধীশের সহিত মায়াবশযোগ্য জীব সংযুক্ত থাকিলে মায়াদ্বারা অভিভূত হয় না। অণুচৈতন্য তটস্থ জীবও তখন আনন্ত্য-ধর্ম্ম লাভ করে।

পুরুষাভিমান বহুরূপে উদিত হইতে পারে। বাহ্য পুরুষের আকার না থাকিলেও অন্তরে মহা-পুরুষাভিমান থাকিতে পারে। 'মহাপুরুষ' বলিতে কারণার্ণবশায়ী ও গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু বা মায়াধীশ লক্ষ্মীপতি নারায়ণ। মহাপুরুষ বা পুরুষোত্তমই অদ্বিতীয় ভোক্তৃতত্ত্ব বা বিষয়-বিগ্রহ ; এতদ্ব্যতীত যাহা কিছু সকলই সেই অদ্বিতীয় বিষয়তত্ত্বের ভোগ্য বা আশ্রয়-তত্ত্ব। মহাপুরুষই একমাত্র শক্তি-মত্তত্ত্ব, আর জীবমাত্রই শক্তিতত্ত্ব। অনাদি বহির্ম্মুখতাবশতঃ মায়াদ্বারা বিমোহিত-চিত্ত হইয়া আশ্রয়তত্ত্ব যখন বিষয়ের অভিমানে চালিত হয়, তখনই স্বরূপে শক্তি, প্রকৃতি, আশ্রিত ও ভোগ্যতত্ত্ব হইলেও শক্তিতত্ত্বের শক্তিমান্, পুরুষ, বিষয়বস্তু ও ভোক্তৃ তত্ত্বরূপে অধ্যাস হইয়া থাকে। ইহাই পুরুষাভিমান। এই পুরুষাভিমান বহুরূপী।

(১) শ্রীরামচন্দ্র মহাপুরুষ অর্থাৎ বিষয়বিগ্রহ মহাবিষ্ণু; তাঁহার স্বরূপশক্তি মহালক্ষ্মী শ্রীসীতাদেবী। মহাপুরুষ ও মহালক্ষ্মীর মধ্যে যে একপতি ও একপত্নী-ব্রতধরত্ব ও পরস্পর আসক্তি —যাহা প্রতিবিম্বিত প্রাকৃত জগতে পতিব্রতা নারী ও স্ত্রৈণ পুরুষে দৃষ্ট হয়, তাহা একমাত্র মহাবিষ্ণু ও মহালক্ষ্মীতেই একচেটিয়া। জীব তাহার অনুকরণ করিলে বিষয়বিগ্রহ বা মূল আশ্রয়বিগ্রহের অভিমান বা অহংগ্রহোপাসনারূপ পাষণ্ডিত্ব বরণ করিবে। অতএব কি পুরুষ, কি নারীরূপধারী জীবমাত্রেরই স্ত্রৈণ বা পুরুষাসক্ত হইবার অধিকার নাই। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী বা বারনারীর কথা দূরে থাকুক, নৈতিক ধর্ম্মপরায়ণ থাকিয়াও যদি পুরুষ বা নারীরূপধারীর পরস্পরের প্রতি জড়াশক্তি থাকে, তবে তাহারা উভয়েই পুরুষাভিমানী। এই জড়-আসক্তিও বহুপ্রকারের হইতে পারে। কেবল যে ইন্দ্রিয়লালসাই জড়াসক্তির অভিব্যক্তি তাহা নহে। মাতার প্রতি সন্তানের বা সন্তানের প্রতি মাতার যে আসক্তি, তাহাও পুরুষাভিমান। নৈতিক ধর্ম্মশাস্ত্র যাহাকে 'স্বর্গীয় স্নেহ' বা 'মাতৃপিতৃভক্তি' বলিয়া বর্ণন করেন, তাহা সকলই পুরুষাভিমান। জননী-জন্মভূমির প্রতি যে প্রীতি বা আসক্তি তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্লাঘ্য নৈতিকধর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত হইলেও, উহা পুরুষাভিমান-বিশেষ। পেট ও মাটি হইতে জাত অর্থনীতি ও রাজনীতি পার্থিববিচারে শ্রেষ্ঠ-নীতি বলিয়া বহুমানিত হইলেও ইহা সকলই পুরুষাভিমানের অভিব্যক্তি।

(২) ভোগস্পৃহার ন্যায় ত্যাগস্পৃহাও পুরুষাভিমানবিশেষ।

'গৃহি-বাউল' বা 'ঘরপাগলা', 'মেয়ে-ন্যাকড়া' বা স্ত্রীর অঞ্চলধৃক্ ব্যক্তিগণ যেরূপ পুরুষাভিমানী, জগন্মিথ্যা ও কেবল 'নিজের দেহ সত্য বা পেট সত্য'—বিচারযুক্ত লোটাকম্বলধারী, বিভূতিধারী, ভবব্রতধর, 'খড়িয়া পল্টন'গণও সেইরূপ পুরুষাভিমানী। বৃক্ষতল-বাসী বা কৌপীনধারী হইলেই যে তিনি পুরুষাভিমানী হইবেন না, ইহা নহে। গৈরিক-বস্ত্র ও কৌপীন-গ্রহণ, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-পরিত্যাগ, স্থূল-স্ত্রীসঙ্গ-ত্যাগ, আকুমার অটুট্ ব্রহ্মচর্য্য, হিমালয়-গহ্বরে বাস, দিগ্বসন ও নীতি-পরায়ণ হইয়াও অন্তরে মহাপুরুষা-ভিমানী হইতে পারে। কর্ম্মিগণ যেরূপ পুরুষাভিমানী, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানিগণ ততোঽধিক প্রচ্ছন্ন পুরুষাভিমানী। ভক্তিপথে প্রবেশ ও সংসারত্যাগের অভিনয় করিয়াও অন্তরে মহা-পুরুষাভিমান থাকিতে পারে।

(৩) সখীভেকি-সম্প্রদায় বাহ্যে নারীবেশ ধারণ করিয়া যেরূপ পুরুষাভিমানী বা অহংগ্রহোপাসক, ফল্গুত্যাগি-সম্প্রদায় "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ", "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" বলিয়াও সেইরূপ প্রচ্ছন্ন পুরুষাভিমানী ও অহংগ্রহোপাসক।

(৪) যে-সকল নারীরূপধারিণী আপনাদিগকে প্রাকৃত-পুরুষের ভোগ্যা বা পাল্যা জ্ঞান করে, তাহারা স্ত্রীরূপধারিণী হইলেও পুরুষাভিমানী।

(৫) যে-সকল পুরুষ আপনাদিগকে দেহ- গেহ, স্ত্রী-পুত্রাদির রক্ষাকর্ত্তা বা ভরণপোষণকর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে, তাহারা সকলেই পুরুষাভিমানী।

(৬) যাহারা বিশ্বম্ভর অদ্বিতীয় মহাপুরুষের পূর্ণ কর্তৃত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া জীবকে যোগ ও ক্ষেম অর্থাৎ অন্নাদি-আহরণ ও তৎসংরক্ষণের 'কর্ত্তা' বলিয়া বিচার করে, তাহারা সকলেই পুরুষাভিমানী। প্রাকৃত নীতিশাস্ত্র "উদ্যোগিনং পুরুষ-সিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।" প্রভৃতি নীতিবাক্যে যে বহির্ম্মুখ পুরুষকারকে প্রশংসা করেন, সেই ভগবদ্ভক্তিরহিত যে উদ্যম বা পুরুষকার, তাহা সকলই পুরুষাভিমান। শরণাগতিরহিত যে উদ্যম বা রজোগুণ, তাহা সকলই পুরুষাভিমান। আবার ভজনের ছলনায় যে তমোভাব, তাহাও পুরুষ-অভিমান।

(৭) যাহারা স্ত্রী-পুত্রাদি বিষয়-বৈভব—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও দম্ভ ও প্রতিষ্ঠাশার দ্বারা পরিচালিত, তাহারা পুরুষাভিমানী। দম্ভদৈত্যের ন্যায় পুরুষাভিমানী আর দ্বিতীয় নাই। দীনতা-দেবীর আবির্ভাবে পুরুষাভিমান বিদূরিত হয়। মুক্তি ও ভুক্তি পিশাচী এবং প্রতিষ্ঠাশা-চণ্ডালিনী প্রকৃতির বেশধারণ করিলেও দম্ভদৈত্যেরই সহচরীরূপে পুরুষাভিমান বর্দ্ধন করে। প্রতিষ্ঠাশা-বেশ্যার ন্যায় নারীরূপে সজ্জিতা পুরুষাভিমানিনী আর দ্বিতীয় নাই। প্রতিষ্ঠা একমাত্র মহাপুরুষের অংশী শ্রীবলদেব শ্রীনিত্যানন্দের একচেটিয়া সম্পত্তি। যাহারা সেই মূল-মহাপুরুষের সম্পত্তি বা লক্ষ্মীকে ভোগ করিতে চাহে, তাহারা যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুরুষ-অভিমানী, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

(৮) মহাপুরুষ-পুরুষ-প্রসঙ্গবিমুখ—অতএব অসতী গ্রাম্য

বার্ত্তার ভজনকারী ব্যক্তিমাত্রই পুরুষাভিমানী। যাহারা মহাপুরুষ-পুরুষ অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুভক্তের পরিচর্য্যারূপা ও প্রসঙ্গরূপা সেবা করে না, তাহারা পুরুষাভিমানী না হইয়া থাকিতে পারে না। শ্রীপুরুষোত্তমের ভজন না করিলে প্রকৃতির ভজন করিতে হইবেই হইবে। মহাপুরুষ-পুরুষের সঙ্গ ব্যতীত প্রকৃতি-ভজন করিবার নৈসর্গিকী দুর্দ্দমনীয়া স্পৃহা কেবলমাত্র বাহ্যত্যাগ বা ভোগের দ্বারা কোনকালেই বিদূরিত হইতে পারে না। এইজন্যই মহাজন গাহিয়াছেন,—

"কাষায়ান্ন চ ভোজনাদিনিয়মান্নো বা বনে বাসতো
ব্যাখ্যানাদথবা মুনিব্রতভরাচ্চিত্তোদ্ভবঃ ক্ষীয়তে।
কিন্তু স্ফীতকলিন্দশৈলতনয়াতীরেষু বিক্রীড়তো
গোবিন্দস্য পদারবিন্দভজনারম্ভ-লেশাদপি॥"

(শ্রীপদ্যাবলী, ১১ শ্লোক)

কাষায় অর্থাৎ গৈরিকবসন-পরিধান অথবা ভোজনাদির নিয়ম বা সংযমনাদি, কিংবা বনে বাস, শাস্ত্রব্যাখ্যা অথবা মুনিগণের ব্রতধারণ হইতে কাম কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু শ্রীযমুনার বিস্তৃত-তটপ্রদেশে বিচরণশীল শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম-ভজনারম্ভের লেশ হইতেই কাম আনুষঙ্গিকভাবে বিদূরিত হয়।

(৯) অপক্ব হইয়া পক্বতার বাহাদুরী, অনর্থযুক্ত হইয়া অনর্থমুক্তের বাহাদুরী, অসিদ্ধ হইয়া সিদ্ধের বাহাদুরী, বিধিবাধ্যতার যোগ্যতা লইয়া রাগময়ী ভক্তির অনুকরণ-চেষ্টা, শ্রীধামকে ঈশাক্ষেত্ররূপে দর্শন না করিয়া গ্রামবুদ্ধিতে দর্শন অর্থাৎ তথায়

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের নিরবচ্ছিন্না সুখানুসন্ধানস্মৃতিতে আপ্লুত না থাকিয়া দেহারামতার সহিত বাসের অভিনয়, শ্রীধামে শ্রীকৃষ্ণের সংসার অর্থাৎ ব্রজপত্তন না করিয়া ইতরচিন্তায় অভিনিবিষ্ট থাকা প্রভৃতি 'পুরুষ-অভিমান' ও 'প্রকৃতিভজনে'রই সাক্ষ্যস্বরূপ।

(১০) শ্রীরূপশিক্ষামৃতে যাহারা অভিষিক্ত নহে, তাহারা সকলেই ন্যূনাধিক পুরুষাভিমানী। 'শ্রীহংসগীতা' ও 'শ্রীরূপোপ-দেশামৃতে'র সর্ব্বপ্রথম শ্লোকটি এই পুরুষাভিমানের উপরেই লগুড়াঘাত করিয়াছেন,—

"বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

(১১) প্রাকৃতস্বজন-পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহারামতা ও দেহা-রামতা-ভোগের অভিসন্ধি, পুরুষাভিমানেরই অভিব্যক্তি। এজন্য শ্রীরূপপ্রভু তাঁহার 'শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু'তে গাহিয়াছেন,—

"স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়-পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥

(শ্রীভঃ রঃ সিঃ, পূঃ বিঃ 'সাধনভক্তিলহরী' ৮৭ শ্লোক)

হে সখে! যদি বান্ধবের সঙ্গ করিতে তোমার লোভ থাকে,

তবে কেশিঘাটের নিকটবর্ত্তী ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, ত্রিবক্রতাশালী, বামঅঞ্চলে নেত্র কটাক্ষবিশিষ্ট, অধরপঙ্কজ-কিশলয়ে বিরাজিত-বংশী ও ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা উৎকৃষ্ট শোভান্বিত শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিও না। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলে অন্যত্র বিরাগ উপস্থিত হইবে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাকুঞ্জের দ্বারে শ্রীশ্রী-রূপমঞ্জরী দাঁড়াইয়া আছেন। তথায় কোন পুরুষের প্রবেশের অধিকার নাই অর্থাৎ পুরুষাভিমানীর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-লাভ সুদূর-পরাহত। মহাপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের সেবক দণ্ডকারণ্য-বাসী মহর্ষিগণ পর্য্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিতে ইচ্ছা করিলে; এক-পত্নীব্রতধর মহাপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রে বহুবল্লভত্ব অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষ দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণকে দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের গোকুল-লীলায় স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া লীলা-পুরুষোত্তমের ভজনা করিতে বলিয়াছিলেন। অধিকারভেদে যাঁহারা শৃঙ্গার-রসে রুচি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বাহ্যদেহে পুরুষাকারে বর্ত্তমান থাকিলেও সিদ্ধদেহে স্ত্রী-আকার-বিশিষ্ট। শ্রীরূপমঞ্জরীর গণে গণিত না হওয়া পর্য্যন্ত - সেই গণের পাল্য-লাল্য না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই পুরুষাভিমান দূর হয় না। এই জন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"ছোড়ত পুরুষ-অভিমান।
কিঙ্করী হইলুঁ আজি কান॥

বরজ-বিপিনে সখী-নাথ।
সেবন করবুঁ রাধানাথ॥

১২। প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায় কৃত্রিমভাবে 'মঞ্জরী' অভিমান করিয়াও অন্তরে মহা-পুরুষাভিমানী। কৃত্রিমভাবে মনে মনে সিদ্ধদেহ কল্পনা অথবা সখীভেকীর বাহ্যে স্ত্রীবেশ-ধারণ অথবা সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য গৈরিকবস্ত্র বা কৌপীন-ধারণ অথবা নৈতিক জীবন-যাপনোদ্দেশ্যে যুক্তবৈরাগ্যের ছলনায় গৃহব্রত-ধর্ম্মে অভিনিবেশ—এই সকল ধারণাই প্রচ্ছন্ন পুরুষাভিমান-জাত বিকার।

মহাপুরুষের অর্চ্চনের দ্বারা পুরুষাভিমান দূর হয়। আর, লীলা-পুরুষোত্তমে অকিঞ্চনা ভক্তি-দ্বারা অপ্রাকৃত-প্রকৃতির কিঙ্করী-অভিমান অর্থাৎ গোপীর কিঙ্করী-অভিমান বা অপ্রাকৃত গোপীগর্ভে জন্মলাভ ও তাঁহার লাল্য-পাল্য-বিচার অধিকারানুসারে জীবের চিৎস্বরূপে প্রকাশিত হয়। যাঁহারা মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তিতে অপ্রাকৃত-প্রকৃতির গণে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহাপুরুষের সেবায়ও চিত্ত আকৃষ্ট না করিয়া লীলা-পুরুষোত্তমের ভজনে লালসান্বিত হ'ন।

শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীমনঃশিক্ষা'য় বলিয়াছেন,—

"অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতিমণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ।"

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর স্বমুখোদ্‌গীর্ণ শ্লোকে বর্ণাশ্রমের অভিমানকে পুরুষাভিমান ও শ্রীগোপীজনবল্লভের দাসানুদাসের অভিমানকে

অপ্রাকৃত-প্রকৃতি-অভিমান বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন।

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

(শ্রীপদ্যাবলী ৬৩ অঃ ধৃত শ্রীচৈতন্যোক্ত শ্লোক ;
শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৩।৮০)

'শ্রীগীতা'য় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি পর্য্যন্ত উক্ত হইয়াছে। কিন্তু শরণাগতির পর মহতের পরিচর্য্যা-প্রসঙ্গের দ্বারা তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবা-পরিপাটীর প্রতি লুব্ধ হইয়া স্বরূপাভিমানে যে ভজন, তাহা একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়। এই স্বরূপাভিমানই স্বরূপশক্তির কৈঙ্কর্য্যের অভিমান। জীব পুরুষাভিমানে বহিরঙ্গা প্রকৃতি বা মায়াকে ভজন করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়, কিন্তু স্বরূপশক্তির আশ্রয়ে ও আনুগত্যে লীলা-পুরুষোত্তমের কিঙ্করানুকিঙ্করাভিমানে নিত্য পরমানন্দময় জীবন লাভ করে। অতএব,—

"সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়া
পুরুষাভিমানে মরি।
'স্বরূপ শক্তির, আশ্রয় লইয়া,
পুরুষোত্তম ভজিয়া বাঁচি'॥"

—*—

বিনোদ-বাণী-গৌরসেবা কি ত্যাগ করিব ?

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দৈন্যভরে আপনাকে **শ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জক বা 'ঝাড়ুদার'** বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। **তিনি শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের অভিন্ন-বিগ্রহ।** কেবল শ্রীনাম-কীর্ত্তনের অভিনয়মাত্র তাঁহার আদর্শে প্রকাশিত হয় নাই, নামকীর্ত্তনাভিনয়ে কোথায় কোথায় অপরাধ প্রবেশ করে, তাহা তিনি তাঁহার 'হরিনামচিন্তামণি'তে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এখানে তিনি শ্রীনামাচার্য্যের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াও শ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জকের লীলাভিনয়কারী।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল স্বরূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিসিদ্ধান্তের পরীক্ষক ও সিদ্ধান্ত-সম্রাট্। মহাপ্রভুর যে-কোন স্তুতিবাদকে তিনি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন নাই। মহাপ্রভুকে বঙ্গদেশীয় কবি স্বয়ংভগবান্‌রূপে বর্ণন করিয়াছেন দেখিয়া তিনি তাহাতে স্বয়ং আত্মহারা হন নাই, কিংবা মহাপ্রভু কৃতার্থ হইয়াছেন,—এইরূপ বিচার করেন নাই। বস্তুতঃ ঐরূপ স্তুতিগানের মধ্যে যে সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস আছে, সেই অপ্রিয় সত্য স্বতঃসিদ্ধ নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন করিয়া বঙ্গদেশীয় কবির মঙ্গল ও সমস্ত জীবজগতের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন।

'শ্রীরূপ শত মুখে শত বলে, শত হাতে শত লিখে'—বৈষ্ণব-সমাজে এইরূপ একটি কথা প্রচলিত আছে। শ্রীরূপের 'রসামৃতসিন্ধু'র প্রারম্ভেই অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বী, প্রতিকূল-কৃষ্ণানুশীলনকারী প্রভৃতিকে নিরাস করা হইয়াছে। শ্রীরূপও রসামৃতসিন্ধুর তটে এইরূপ পরিমার্জ্জনের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমস্ত শিক্ষার মধ্যে এই পরিমার্জ্জন-লীলার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার স্বচরিতে লিখিয়াছেন,—যখন তিনি সত্যকথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন "কত লোকে কত কথা বলিতে লাগিল, গৌরাঙ্গভক্তদিগকে অনেক প্রকার গালি বর্ষণ করিতে লাগিল ; কিন্তু যাঁহারা গৌরাঙ্গের চরণে দেহ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সয়তানি কথায় কেন পশ্চাৎপদ হইবেন ?"

শ্রীস্বরূপ রূপ-ভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট-পরিপূরক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ সমস্ত জীবনব্যাপী শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-শ্রীজীব-রঘুনাথ--কবিরাজ--নরোত্তম--বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোরের পরিমার্জ্জন-লীলার ঐকান্তিক দাস্যেরই বিগ্রহরূপে আবির্ভূত থাকিয়া অনেক অপ্রিয়-সত্য স্বতঃসিদ্ধ নির্ভীককণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলন পরিবর্জ্জন ও অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন গ্রহণই তাঁহার চরিত্রের সত্তা। সেই বিনোদ-বাণী-গৌরের বিন্দুমাত্রও সঙ্গলাভ যাঁহাদের ঘটিয়াছে, তাঁহাদেরও চরিত্রে ন্যূনাধিক তাহা দৃষ্ট হয়। তাঁহারা

সেই সত্তা পরিত্যাগ করিয়া বাঁচিতে পারেন না।

হই না কেন আমি ভক্তিবিনোদ-বংশের একটা জঘন্যতম কুলাঙ্গার, শত অনর্থের কিঙ্কর, মায়াবদ্ধ জীব, তথাপি কোন-না-কোন দিন, কোটি জন্ম পরেও কি সেই নামহট্টের অতিমর্ত্ত্য ঝাড়ুদারের কোন-না-কোন প্রকার অতি নিম্ন যোগানদার হইবার আশাবন্ধটুকুকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় এই জীবন-যাত্রার একমাত্র ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাথেয় করিতে পারিব না ? সেই আশাটুকু ছাড়িয়া দিলে এই বিশ্বের ভোগ ও ত্যাগরূপ মৃত্যুর পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে কি করিয়া বাঁচিব ?

আমি সংশোধক নহি, সংশোধিতও নহি ; আমি শাসক নহি, শাসিত হইতেও অকপট অভিলাষী নহি। আমি আদর্শ নহি, আচরণশীল নহি। আমি সুদুর্ব্বল, শত শত অনর্থযুক্ত, শত ছিদ্রযুক্ত, পতনোন্মুখ, ভোগোন্মুখ শত অপরাধ প্রবণ বদ্ধজীব। কিন্তু এই দুর্দ্দৈব ও বিপদের মধ্যেও আমার ভাগ্যাকাশে একটি ধ্রুবতারা উদিত হইয়াছে,—ইহাই আমার আশা ও ভরসা।

আমি কৃষ্ণভজন কাহাকে বলে, তাহা ত' জানিই না, গৌরসুন্দরের শিক্ষা ও আদর্শ-অনুসরণ অতি-দুর্ব্বল আমার পক্ষে স্বপ্নতুল্য। গৌর-অর্চ্চার সেবা করিতে গিয়া আমার অর্চ্চায় দৃশ্য-বুদ্ধি উদিত হয়, নানাপ্রকার দৈহিক ও মানসিক বিঘ্ন অর্চ্চনকে ছিদ্রযুক্ত করিয়া দেয়। গৌর-ভজন করিতে গিয়াও আমি কখনও গৌরনাগরী বা গৌরভোগী হইতে চাহি, কখনও বা গৌর-ভজনের নামে প্রাকৃত-সহজিয়া, সখীভেকী, আউল, বাউল, অতিবাড়ী হইয়া

পড়ি ! আবার গৌর ধামের আশ্রয়ের অভিনয় করিতে গিয়াও নানাপ্রকার ধামাপরাধ করিয়া বসি. 'ধামে বসিয়া সংসারসুখ বা গ্রাম্যসুখ উপভোগ করিব, ধামবলে অধিকতর পাপ-প্রবৃত্তি চালাইতে পারিব'—এইরূপ নানাপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়।

কৃষ্ণকাম, গৌরকাম পরিপূরণের ছলনার নামে নিজের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের কাম-চরিতার্থ করিবার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াই। তবে আমার কি মহাবদান্য গৌরের সেবা হইবে না ?

লোকে বলে,—গুরুপদাশ্রয় না করিলে গৌর-কৃষ্ণের সেবা হয় না। গুরুপদাশ্রয়ের অভিনয়ও করিয়াছি, শিষ্যত্বেরও অভিনয় করিয়াছি ; কিন্তু দুষ্ট মন নিজেই গুরু সাজিতে চাহে,—শাসিত হইতে চাহে না। অপরের শাসক হইতে চাহে. এমন কি, গুরুরও শাসক হইতে চাহে, কিন্তু গুরুদেবের দ্বারা অমায়ায় শাসিত হইতে চাহে না ! এইরূপ অবস্থায় আমার কর্ত্তব্য কি ?

অর্চ্চা-গৌর আমার সহিত কথা বলেন না, আমার সন্দেহ ভঞ্জন করেন না, প্রত্যক্ষভাবে আমাকে সংশোধন করেন না। গুরু-গৌর অর্থাৎ চৈত্ত্যগুরু এবং শিক্ষা ও দীক্ষাদাতা গৌর-প্রকাশ-বিগ্রহও আমাকে অনেক সময় বঞ্চনা করেন অর্থাৎ আমি আমার নিজের মনঃকল্পনা বা মনোধর্ম্মকেই চৈত্ত্যগুরুদেবের উপদেশ ও নির্দ্দেশ বলিয়া মনে করি। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর সহিতও কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক সম্বন্ধমাত্র স্থাপন করিয়া ও ব্যবহারিকতা সংরক্ষণ করিয়া বিদায় লইতে চাহি ! এইরূপ অবস্থায় 'আমি কি

করিয়া আমার শত শত অনর্থযুক্ত, শত শত ছিদ্রযুক্ত, আদর্শহীন, আচারহীন, সুদুর্ব্বল, পদে পদে পতন ও অপরাধপ্রবণ জীবনকে সংশোধিত ও শাসিত করিব ?' যখন এই সমস্যা আমাদের হৃদয়ে উদিত হয়, তখন বাণী-গৌর কৃপাপূর্ব্বক উদিত হইয়া আমাদের এই সমস্যা ভঞ্জন করেন।

বাণী-গৌর আমাদিগকে মৌনধর্ম্ম শিক্ষা দেন না, আমাদিগকে 'বুঁদ' করিয়া দেন না ; আমরা মূক থাকিলে বাচাল করিয়া দেন—মুখর করিয়া দেন ; পঙ্গু থাকিলে গিরিলঙ্ঘনের শক্তি সঞ্চার করেন।

বাণী-গৌর আমাদের ব্যক্ত ও অব্যক্ত বাক্যবেগকে তাঁহার বাণীতে বাচাল করিয়াই সংযমিত করেন, আমাদের মনোধর্ম্মের বেগকে তাঁহার বাণী-মুখর করাইয়া দমন করেন, আমাদের অবৈধ ক্রোধ-বেগকে তাঁহার ভক্তদ্বেষি-জনের প্রতি বাণী-কীর্ত্তনমুখেই নিয়মিত করিয়া থাকেন, জিহ্বা-বেগকে অনুক্ষণ বাণী-গৌরের কীর্ত্তন-আরতি শিক্ষা দিয়া প্রশমিত করিয়া থাকেন, উদর ও উপস্থ-বেগকেও বাণী-যজ্ঞোৎসবে আহুতি দিয়া নির্ম্মূল করিয়া থাকেন। বাণী-গৌরই আমাদিগকে ত্রিদণ্ডী বা জীবন্ত মৃদঙ্গ করিতে পারেন।

সুমেধাগণ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেই গৌরসুন্দরের আরাধনা করেন। **এই সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে গৌর-নিজ-জনের জিহ্বাপ্রাঙ্গণে বাণী-গৌরের অবতার।**

গৌরাবতার মহাবদান্য সত্য ; কিন্তু বঙ্গকবি-প্রমুখ সিদ্ধান্ত-

বিরোধী রসাভাসদুষ্ট ছল-কবিগণ, সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দাদির ন্যায় মায়াবাদী অশুদ্ধ বৈদান্তিকগণ, সমসাময়িক নবদ্বীপবাসী পাষণ্ডী হিন্দুগণ, রামচন্দ্রপুরী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ, বল্লভ ভট্টাদির ন্যায় ভক্ত্যেকরক্ষক শ্রীধর স্বামীর বিরোধি-পণ্ডিতগণ, কৃষ্ণেতর অন্যাভিলাষী কালাকৃষ্ণদাস, বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের ন্যায় অন্তরঙ্গ সেবকাভিমানকারী ব্যক্তিগণ, ছোট হরিদাসের আদর্শাভিনয়কারী ছলত্যাগিগণ ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষু সেবকাভিমানিগণ তাঁহাদের প্রত্যক্ষধারণার গৌরে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাণীগৌরের কৃপায় আবার ইঁহাদের অনেকেরই শুভোদয় হইয়াছিল। শ্রীস্বরূপের জিহ্বা-প্রাঙ্গণে যখন বাণী-গৌরের অবতার হইল, তখন বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি শ্রীস্বরূপের বাণী-গৌরের দ্বারা সংশোধিত ও শাসিত হইয়া শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-সিদ্ধান্তবিরোধি-রসাভাস-দুষ্ট গৌর-স্তুতিকে সংশোধিত করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে গৌরসুন্দরকে বেদান্ত শিক্ষা দিয়া শাসিত ও সংশোধিত করিতে চাহিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ গৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়াও গৌরসুন্দরের প্রতি তাঁহার মর্ত্ত্যবুদ্ধি বিদূরিত হয় নাই। তিনি তাঁহার ভোগ্য ধারণার গৌরে মোহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন বাণী গৌর অবতীর্ণ হইলেন, তখনই তাঁহার ভ্রম-কুজ্‌ঝটিকা অপসারিত হইতে থাকিল। প্রকাশানন্দের সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিতে পারেন, কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ গৌরসুন্দরের "মহাতেজোময় বপু কোটি-সূর্য্যাভাস"-দর্শনেই আকৃষ্ট

হইয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ বিচারের সহিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—গৌরবপুর ঐশ্বর্য্যপ্রকাশে ঐশ্বর্য্যপ্রধান-ধাতুপর কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ কথঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইলেও শ্রীগৌর-সুন্দরে মর্ত্ত্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। শ্রীগৌর-সুন্দরকে তাঁহারা তাঁহাদেরই মত সন্ন্যাসী, এমন কি, হীন সম্প্র-দায়ের হীনাচার-বিশিষ্ট সন্ন্যাসী বলিয়া বিচার করিয়াছিলেন এবং বেদান্ত-পঠন ও ধ্যানাদি কৃষ্ণনামকীর্ত্তন বা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ বিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন বাণী-গৌর প্রকাশিত হইয়া তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিলেন, তখনই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন,—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্য দৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি' জিনি॥"

—(চৈঃ চঃ ম ২৫।২৮)

শ্রীবল্লভ ভট্টাদি পরম পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বাণী-গৌরের কৃপায়ই প্রকৃত শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্য ৭ম পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। বাণী-গৌরের কৃপাব্যতীত অন্তরের অন্তঃপুরের অভিমান, অনর্থ, প্রেয়ে শ্রেয়োবিবর্ত্ত, অহিতে হিত-বুদ্ধি কিছুতেই বিদূরিত হইতে পারে না; তাই বাণী-গৌরের অবতার-কথা-প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

"জগতের হিত লাগি' গৌর-অবতার।
অন্তরের অভিমান জানেন তাঁহার॥

নানা অবজ্ঞানে ভট্টে শোধেন ভগবান্।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান ॥
অজ্ঞ জীব নিজ-'হিতে' 'অহিত' করি' মানে।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে, পাছে উঘাড়ে নয়নে ॥"

—(চৈঃ চঃ অ ৭।১১৭-১১৯)

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবল্লভ ভট্টের স্বামি-বিরোধি-ব্যাখ্যার অনুমোদন করিয়া ভট্টপাদের মনস্তুষ্টি করিতে পারেন নাই; কিন্তু নিরপেক্ষ অপ্রিয় সত্যকথা কীর্ত্তন করিয়া জগদ্‌গুরু-লঙ্ঘনাপরাধ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। কেবল ভোগ্যধারণার মৌনী-গৌর, বা কেবল অর্চ্চা-গৌরের অবতার হইলে আমরা হয় ত' এই জগদ্‌গুরু-লঙ্ঘনাপরাধ হইতে সতর্ক হইতে পারিতাম না। যদি বাণীগৌর কালাকৃষ্ণদাসের আদর্শকে শাসিত ও সংশোধিত না করিতেন, যদি বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের বহুমানিত গণমতের কৃষ্ণকে 'মায়া' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে না জানাইতেন, যদি ছোট হরিদাসের আদর্শকে নিন্দা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা কখনই আমাদিগকে সত্যের পথে চালিত করিতে চাহিতাম না।

শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পর অর্চ্চা-গৌর প্রকাশিত হইয়া জীবমঙ্গল বিধান করিতেছেন। কিন্তু **বাণী-গৌরই অর্চ্চা-গৌরের স্বরূপ জানাইয়া দিতেছেন।** স্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে যদি এই বাণী-গৌরের অবতার না হইত, তবে জগতে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মেরই রাজত্ব চির-প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যাইত।

জগতে কি ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের বহুরূপী চিত্রের অভাব আছে ? জগতে কি অসংখ্য ধর্ম্মরঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি হয় নাই ? জগতে কি সর্ব্বলোকরঞ্জনকারী, সর্ব্বচিত্তহারী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অভাব আছে ? আবার কেহ কেহ বলিতেছেন—'বিংশ শতাব্দীতে যান্ত্রিক সভ্যতার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-বর্ব্বরতা হ্রাস হইয়া ধর্ম্ম-সভ্যতার বিশ্ব-ব্যাপী পুনরভ্যুত্থান হইয়াছে।' কিন্তু এই সকল বিশ্বচিত্তহারী ধর্ম্মের রঙ্গমঞ্চসমূহ কেবল কৈতবপূর্ণ, ইহা আজ নির্ভীক-কণ্ঠে সংশাস্ত্র ও সদ্‌যুক্তির সহিত কে জানাইয়া দিত যদি শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে অনুক্ষণ বাণী-গৌরের অবতার না হইত।

ভোগোন্মুখ মানব-জাতির একটি চিরন্তন স্বভাব,—তাঁহারা **গুরু ও সাধুকে মৌনধর্ম্মাবলম্বী দেখিতে চাহেন,** আর নিজেরাও এক এক জন মৌনীবাবা হইয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন ; কিন্তু গৌরাবতারের "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই মহাবাক্য ভোগোন্মুখ ও ত্যাগোন্মুখ মানব-জাতির সেই বিচারে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। বাণী-গৌরের অবতারই এই যুগের মহাদান। বাণী-গৌর অনুক্ষণ কীর্ত্তন-মুখে গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের উপদেশ দিয়া থাকেন।

বাণীতে ও গৌরে ভেদ নাই, নামে ও নামীতে ভেদ নাই। যেখানে ভেদ, সেখানেই মায়া। ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানেও সকলে বুঝিতে পারে, স্বরূপ-রূপানুগবর ভক্তিবিনোদ-বাণী-গৌরের প্রচারের বৈশিষ্ট্য—যাবতীয় অপর মতবাদ-নিরাস ও স্ব-মত স্থাপন। 'স্ব' বলিতে এখানে স্বরূপ-রূপের মত, শ্রীগুরুপাদপদ্মের

মত। বেদান্তের কার্য্যও তাহাই,—পরমত খণ্ডন ও স্বমত স্থাপন। বেদান্ত নির্ব্বিশেষ নহে,—অকৃত্রিম বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই যাবতীয় ধর্ম্মকে কৈতব ও মৎসরগণের ধর্ম্ম এবং শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্মকে অকৈতব ও নির্ম্মৎসরগণের স্বধর্ম্ম বলিয়াছেন। সুদর্শনের কার্য্যই - বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধকে আক্রমণ—কুদর্শনকে আক্রমণ—কুসিদ্ধান্তকে আক্রমণ; সুদর্শন নির্ব্বিশেষ নহেন, তিনি স্বয়ং সবিশেষ এবং সবিশেষ বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের আক্রমণকারিগণের প্রতি ভয়ঙ্কর।

সুদর্শনের এই আক্রমণ আমরা সহ্য করিতে পারিলে আত্ম-সংশোধন করিতে পারিব। এইরূপ জন্ম-জন্মান্তর সুদর্শনের অমায়ায় কৃপা শিরে বরণ করিতে পারিলে জন্ম-জন্মান্তর পরেও সেবা-সিদ্ধি লাভ করিতে পারিব। সুদর্শনের আক্রমণ সহ্য করিয়া আত্মসংশোধন করিবার জন্যই নিরপেক্ষ সত্যকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের উপদেশ বিনোদ-বাণী-গৌরে আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

আমার অসংখ্য প্রকার দুর্ব্বলতা আছে সত্য; অসংখ্য প্রকার অনাচার, দুরাচার ও ছিদ্র আছে। কিন্তু এই দুর্ব্বলতা, অনাচার ও ছিদ্র "মৌনী বাবা" হইয়া বসিয়া থাকিলে, কিংবা "তুম্‌ভি চুপ, হাম্‌ভি চুপ" ন্যায় অবলম্বন করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-গণের ন্যায় "তুমিও বড় ভক্ত, আমিও বড় ভক্ত" বলিয়া পরস্পর পিঠ চাপড়াইয়া দিলে, কিংবা আত্মমঙ্গল ও আত্মসংশোধনের কথা বাদ দিয়া উন্নত অধিকারের কথা বা অন্যান্য প্রসঙ্গ লইয়া

আলোচনা করিলে কি আমার অসংখ্য দুর্ব্বলতা ও অনাচারগুলি বিদূরিত হইবে ? যখন শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-কার্য্য আরম্ভ হয়, তখন প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বলিত,—"আপনারা মহাপ্রভুর কথা প্রচার করুন, তিনি কি লীলা করিয়াছিলেন, কিরূপ ভাবে নৃত্য করিতেন, কৃষ্ণ কোন্ সখীর কুঞ্জে কি সেবা গ্রহণ করেন, বৈষ্ণবধর্ম্মের এই সকল কথা খুব প্রচার করুন, আমাদের আপত্তি নাই।" আবার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলিতেন ও এখনও বলেন,—"আপনারা নির্ব্বিশেষ বেদান্তমতকে খণ্ডন করুন, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধ্যে খুব পাণ্ডিত্য ও বৈভব আছে, তাহা প্রদর্শন করুন, গোস্বামিপাদগণের সংস্কৃত গ্রন্থরাজি বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রকাশ করুন, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করুন, জগতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ঐশ্বর্য্য ও প্রভাব প্রকাশিত হউক,—ইহাতে আমাদের আপত্তি নাই (কারণ, তাহাতে আমাদের বর্ত্তমান ও ভাবী ভোগের যোগানদারী আছে); কিন্তু আপনারা আমাদের (অসদ্) গুরুবর্গের ও আমাদের কোন দোষ প্রদর্শন করিবেন না—আমাদিগকে আক্রমণ করিবেন না।" তাঁহারা শাস্ত্র-প্রমাণ দেখাইয়া বলিতেন,—"পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে।" জগতের সকল মনো-ধর্ম্মীই একবাক্যে বলেন,—"আপনারা শত শত ধর্ম্মকথা ও ধর্ম্মমত প্রচার করুন, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু আমাদিগকে কোন কটাক্ষ করিবেন না অর্থাৎ অসংসঙ্গ পরিবর্জ্জন করিবার বাস্তব উপদেশটি দিবেন না।"

সে-দিন এক ব্যক্তি একখানি পুস্তিকা ছাপাইয়া এইরূপ প্রচার

করিয়াছেন,—

"রাধা-ভাবাপন্ন মহাপ্রভু যদি 'কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী-বদন' বাক্যে বিলাপ এবং অশ্রু-বর্ষণ-পূর্ব্বক স্বীয় বিরহানল নির্ব্বাণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, অথবা নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়াই শান্ত থাকিতেন, পক্ষান্তরে শ্রৌতজগৎ-কারণসহ স্বীয় প্রাণনাথের একত্ব-প্রতিপাদন-কল্পে শ্রুতি ও দার্শনিক সূত্রে হস্তক্ষেপ-পূর্ব্বক জন-সাধারণের ভ্রান্তি উৎপাদন না করিতেন এবং নাস্তিক, পাষণ্ডাদি আখ্যান প্রদান-পূর্ব্বক ভিন্নমতাবলম্বীর জন্য যমদণ্ডের ব্যবস্থা-দানে বিরত থাকিতেন, তবে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতাম না; তাঁহাকে প্রেমের ঠাকুর গৌর বলিয়াই পূজা করিতাম। কিন্তু তিনি যখন পরচর্চ্চা করিয়াছেন, তখন আমরাও তাঁহার সমালোচনা করিব।"

মনোধর্ম্মিগণের ঐ সকল উক্তির মধ্যে যে কপটতা, মৎসরতা ও বাস্তবসত্য-বিদ্বেষ আছে, তাহা বিনোদ-বাণী-গৌরই ধরাইয়া দিয়াছেন,—বিনোদ-বাণী-গৌর ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন,—

"যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥

(চৈঃ চঃ ম ৭।১২৮-১২৯)

'কৃষ্ণ-উপদেশ' বলিতে কৃষ্ণ ব্রজের কোন্ স্থানে কোন্ লীলা করিয়াছেন, কেবল তাহাই নহে। আত্ম-মঙ্গল ও আত্ম-সংশোধনের

উপদেশ—যাহা অপ্রাকৃত-কৃষ্ণ-লীলায় প্রবেশের অধিকার দান করে, তাহাই কৃষ্ণোপদেশ। সেই কৃষ্ণোপদেশ-কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য—বিষয়তরঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি ও তৎসঙ্গে-সঙ্গে বাণী-গৌরের সঙ্গ-প্রাপ্তি। গুরুপাদপদ্মবাণীর অনুকীর্ত্তন—আত্ম-সংশোধন ও আত্ম-শাসনের জন্য। তবে ঘরে বসিয়া একাকী বা মনে মনে কীর্ত্তন করিলে লোকে আমাকে কেবল 'ভক্ত'-প্রতিষ্ঠা দিয়া আমার অমঙ্গল সাধন করিতে পারে ; কিন্তু সর্ব্বসাধারণে উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিলে আমিও তাহাদের আক্রমণের পাত্র হইয়া বা আক্রমণের পাত্র হইতে পারি ভাবিয়া পূর্ব্বেই সতর্ক বা ভবিষ্যতে সংশোধিত হইবার বিশেষ সুযোগ পাই ; এইজন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্ম ঘর বন্ধ করিয়া একাকী কীর্ত্তন করিবার উপদেশ না দিয়া নির্ভীকভাবে উচ্চকণ্ঠে মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক বা দৈনিক কাগজ ছাপাইয়া দেশে-দেশে, নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে, পল্লীতে-পল্লীতে, গৃহে-গৃহে সর্ব্বসাধারণে কীর্ত্তন করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

অনুকীর্ত্তনকারি-সূত্রে আমার বিচার থাকা উচিত,—আমি বিনোদ-বাণী-গৌরের দাস্যানুদাস্যাভিলাষী। আমি উপদেষ্টা নহি, আচার্য্য নহি, সংশোধক নহি, শাসকও নহি। আমি কেবল শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রুত বিষয় সকলের নিকট নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে অনুকীর্ত্তন করিবার কৃপা যাচ্ঞা করিয়া বাণী-গৌরের প্রতি-শব্দের দ্বারা আমার আত্ম-সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেছি। সেই সকল বাণী পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিতে করিতে হৃদয়ে বিনোদ-বাণী-

গৌরের নিত্য প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষা করিতেছি; শত শত জন্ম পরেও যেন বিনোদ-বাণী-গৌরের দ্বারা শাসিত হইতে পারি, শত শত জন্ম পরেও যেন বিনোদ-বাণী-গৌরের নিজ-জনগণের আনুগত্যে তাঁহাদের শতমুখীদ্বারা আমার চিত্ত-গুণ্ডিচা মার্জ্জন করিতে করিতে আমাকে জগদ্দর্শনের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীজগন্নাথের সুশীতল সিংহাসনরূপে প্রকাশিত করিতে পারি, ইহাই আমার লক্ষ্য থাকা উচিত। প্রবন্ধ-লেখকানুচর বা সম্পাদকানুচররূপ বিনোদ-বাণী-গৌরের সেবকানুসেবকের বিচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভ্রমক্রমেও যেন আমার এই দুর্ব্বুদ্ধি না হয়,—'আমি কি হনুরে', 'আমি বড়', 'আমি ভাল', 'আমি আদর্শ', 'আমি আচারবান্', 'আমি ঠিক, আর সব বেঠিক', 'আমি সব জান্তা, আর সকলেই ভ্রান্ত'। তবে ইহাও যেন মনে না হয়,—'আমার গুরুপাদপদ্ম ভ্রান্ত, ব্যাস ভ্রান্ত।' 'ব্যাস ভ্রান্ত'—এই বুদ্ধি অন্তরে টনট'নে রাখিয়া যেন কপটতা করিয়া ব্যাসকে আমি 'অভ্রান্ত' করিয়া লোকের নিকট সাজাইয়াছি বা সাজাইতে পারি—এরূপ কুবিচার পোষণ না করি।

অথবা যদি নির্ভীক কণ্ঠে সত্যকথা বলিতে যাই, তবে আমার সংসারের ক্ষতি হইবে, চাকুরীর ক্ষতি হইবে, আমার রুটী মারা যাইবে, জলপানি বন্ধ হইবে, চর্ব্ব্য-চুষ্যভোগে বিঘ্ন হইবে, অথবা আমার কোন-না-কোনপ্রকার ভোগের ঘরে আগুন লাগিবে, অপরের আক্রমণের পাত্র হইব, আমার সযত্নে ও সকৌশলে আবৃত অনন্ত ছিদ্রগুলি লোকের নিকট উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে—এই

ভয়ে বা কোনপ্রকার আপেক্ষিকতার বশবর্ত্তী হইয়া যদি বিনোদ-বাণী-গৌরের দাস্য পরিত্যাগ করি, তবে আমার কোন দিনই মঙ্গল হইবে না। 'গৌড়ীয়ে'র প্রত্যেকটি প্রবন্ধের দ্বারা নিত্য যেন আমি স্বরূপ-রূপানুগবর ও তদনুগ ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষকগণের নিকট আত্ম-পরীক্ষা প্রদান করিয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা অমায়ায় সংশোধিত হইয়া বিনোদ-বাণী-গৌরের সেবকানুসেবকের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি,—এই নিত্য-ভজন হইতে যেন কখনও পতিত না হই।

আমার শত শত দুর্ব্বলতা থাকে থাকুক, শত শত ছিদ্র থাকে থাকুক, শত শত অনর্থ থাকে থাকুক ; কিন্তু আমি বাণী-গৌরের নিজ-জনগণের সেবকানুসেবকসূত্রে শত শত আক্রমণ সহ্য করিয়া, কোটি কোটি কটাক্ষবাণে জর্জ্জরিত হইয়া আত্ম-সংশোধনের জন্য—আত্মশাসনের জন্য সর্ব্বপ্রকার আপেক্ষিকতা বর্জ্জন করিয়া, অথচ মূল আশ্রয়-বিগ্রহের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া যদি নির্ভীক-কণ্ঠে সত্যকথা প্রচার করি, তবে হয় ত' জন্ম-জন্মান্তর পরেও আমি স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথ-কবিরাজ-নরোত্তম-ভক্তিবিনোদবাণী-গৌরের গণে গণিত হইতে পারিব। আমার অনন্তকোটি জন্ম হরিভজন না হয় হউক, তথাপি যেন স্বরূপ-রূপানুগ-ভক্তিবিনোদবাণী-গৌরবিরোধি-চিন্তাস্রোত ও কার্য্যকলাপের অনুমোদন করিতে চিত্ত ধাবিত না হয়—নিরপেক্ষভাবে আত্মসংশোধনের জন্য ও আত্ম-শাসনের জন্য উহার প্রতিবাদ করিতে হৃৎকম্প উপস্থিত না হয়।

সকল দুর্ব্বলতা হইতে নিস্তার আছে ; কিন্তু স্বরূপ-রূপানুগ-ভক্তিবিনোদবাণী-গৌর বিরোধি-সিদ্ধান্ত ও কার্য্যকলাপের প্রতিবাদে হৃৎকম্পরূপ দুর্ব্বলতাকে বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দিলে তাহা অতি অল্প দিনেই এরূপভাবে সহিয়া যাইবে ও তাহাতে একটি নূতন অভ্যাস গঠন করিবে যে, আমি সত্যের সন্ধান হইতে চিরতরে পাতিত হইয়া যাইব। অতএব আমার অনাচার, শত শত ছিদ্র, শত শত অনর্থ দেখাইয়া, শত শত ভাবে আক্রমণের ভয় দেখাইয়া, অপরদিকে শত শত প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া আমাকে বিনোদ-বাণী-গৌরের নিজ-জনগণের আনুগত্যময়ী সেবা হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য মৌনধর্ম্মাবলম্বী করিবার শতচেষ্টা করিলেও যেন আমি কেবল কাতর কণ্ঠে ব্যাকুল অন্তঃকরণে বিনোদ-বাণী-গৌরের নিকটই আশ্রয় ভিক্ষা করি।

আমি বিশ্ব রাখিব,—না ব্রজ রাখিব ; কুল রাখিব,—না শ্যাম রাখিব ; বণিক্-ভৃত্য হইব, না ভক্ত-ভৃত্য বা তদ্ভৃত্য-ভৃত্য হইব ; আমি জগদ্ভোক্তা হইব, না জগন্নাথের আশ্রয়বিগ্রহের দাস্যাভিলাষ করিব ; আমি মৌন হইব,—না ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীমুখর হইব ?—এই সমস্যা উদিত হইলে আমি বিনোদ-বাণী-গৌরের নিকট যেন অকপটচিত্তে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আত্ম-নিবেদন জানাইতে পারি,—

"হে বিনোদ-বাণী-গৌর ! আমি অতি দুর্ব্বল, আমি শত শত অনর্থযুক্ত, প্রতিমুহূর্ত্তে প্রলুব্ধ হইবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি, আমি হৃৎকম্পরোগের রোগী ; কিন্তু আমি

শুনিয়াছি—কীর্ত্তনমুখে কীর্ত্তন-বিগ্রহ তোমার সেবা করিতে
করিতে হৃদয়ে বল সঞ্চার হয়। হরিভজন কাহাকে বলে,
তাহা আমি বুঝি না, জানি না ; সিদ্ধি কি, তাহাও আমার
অগোচর। কিন্তু ইহা আমি তোমার কৃপায় শ্রবণ করিয়াছি
যে, তোমার বাণী কীর্ত্তন করিতে করিতে তোমার নিষ্কপট
সঙ্গ-সৌভাগ্য লাভ হয়। জন্ম-জন্মান্তর যেন বিনোদ-বাণী-
গৌরসেবাই আমার একমাত্র ব্রত হয়, ইহা ব্যতীত আমি
কোন সিদ্ধি চাই না ; —অন্ততঃ এই আশীর্ব্বাদটি যেন নিষ্কপটে
আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি। আমি নিজের অসংখ্যকামদুষ্ট মনকে
বেত্রাঘাত করিবার জন্য, তোমার নিজ-জনগণের আনুগত্যে
তাঁহাদের শতমুখীদ্বারা আমার চিত্ত মার্জ্জিত করিবার জন্য আমার
প্রতি তাঁহাদের যে-সকল শাসনবাক্য লিখি ও বলি, তাহা কেহ
যদি কৃপা করিয়া আমার ভ্রান্তি অপনোদন ও আমাকে সতর্ক
করিয়া দিবার জন্য ইহা অপরের প্রতি আক্রমণ ও অনাচারী
আমার দাম্ভিকতা বলিয়া স্মরণ করাইয়া দেন, তখন যেন আমি
তাঁহাদের সেই সকল বাক্যে সতর্ক হইয়া অনুক্ষণ তোমারই সেবা
করিতে করিতে আমাকে সংশোধিত ও শাসিত করিতে পারি ;
কিন্তু শত আক্রমণ ও বিঘ্নের মধ্যেও যেন বিনোদ-বাণী-গৌরের
দাস্য-কামনা পরিহার না করি।

হে বিনোদ-বাণী-গৌর. আমি যেন বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের
সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য, সালোক্য ও সাযুজ্যকামী না হই, কিংবা
যাঁহারা শ্রীগুরুর সাযুজ্য, সার্ষ্টি প্রভৃতি কামনা করেন, সেই সকল

অতি মহদ্‌ব্যক্তির সহিত আমাকে কোনরূপে প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে না করি। আমি যেন কখনও ভুলিয়া না যাই,— **"দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ"**—ইহাই **গুরু-সেবকের স্বরূপ-লক্ষণ**, আমি যেন গুরু-কৃষ্ণকে দিয়া কেবলমাত্র সংসারোত্তরণ, বিশ্ব-দর্শনের হস্ত হইতে উদ্ধারমাত্র কামনা না করি, আমাকে সযুথ আশ্রয়বিগ্রহের কৃষ্ণসংসারের সংসারী. কৃষ্ণের সংসার-পত্তনকারী আশ্রয়বিগ্রহের সংসারে নিত্য প্রবিষ্ট রাখিয়া আশ্রয়বিগ্রহের সুখে বিষয়বিগ্রহকে সুখী করিতে পারি। আমি বিনোদ-বাণী-গৌরপাদপদ্মের অতি নিম্নস্থানে সর্ব্ব-নিষ্কপটসেবক-গণের পশ্চাতে থাকিয়া যেন জন্ম-জন্মান্তর পরেও কোন প্রকার অতি নীচসেবায় অধিকার প্রাপ্ত হই। মানবজাতির সর্ব্বশেষ আকাঙ্ক্ষা যে নির্বিবশেষ ব্রহ্ম হইবার চেষ্টা, তাহাতে যেন আমার চিত্ত প্রলুব্ধ না হয়। আমি যেন নামহট্টের পরিমার্জ্জকের, ভক্তি-মণ্ডপের বিনোদ-বাণী-গৌরের দাসানুদাসগণের একজন হীন দাস্যাভিলাষী হইতে পারি। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীপুরুষোত্তমে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জন শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌর-পাদপদ্মের সম্মুখে ভক্তিমণ্ডপ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আর বিনোদ-বাণী-গৌর উৎকল পুরুষোত্তমে আত্ম-প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রচার-কার্য্যের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা ও শ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জকের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-লীলা সাধন করিতেছেন। 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে'র ভূমিকায় শ্রীল প্রভুপাদ

লিখিয়াছেন,—

"শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদার-পরিচয়ে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে অপ্রাকৃত-লীলার প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার প্রপঞ্চ-মার্জ্জন-সেবার উপকরণরূপ শতমুখী-সূত্রে আমাদের শত শত জনের মহাজনানুগমন এবং দুঃসঙ্গানুকরণ-বর্জ্জনকার্য্য জগতের অপ্রিয় হইলেও উহাই আমাদের চরম কল্যাণ উৎপন্ন করিবে।"

সেই নামহট্ট বা ভক্তিমণ্ডপের বিরোধী জড়প্রতিষ্ঠাশার পরিণাম বিভুত্ব বা ব্রহ্মত্বের অভিমান-ভূমিকা মুক্তিমণ্ডপে অবস্থান করিবার দাম্ভিকতা ও পাষণ্ডতা যেন আমাদের হৃদয়ে উদিত না হয়। যেন শত শত জন্ম পরেও সেই পরিমার্জ্জকের ধারায় একজন অতি নীচ যোগানদারের পদের জন্য নিষ্কপটে আন্তরিক আবেদন জানাইতে পারি। পরিমার্জ্জকের ধারার একটি কুলাঙ্গার হইলেও যেন পরিমার্জ্জকের পরিমার্জ্জন-সেবার কোন-না-কোন একটি যোগানদারী বিনোদ-বাণী-গৌরের অকপট কৃপায় লাভ করিয়া আত্মশোধন করিতে পারি এবং এই সেবা-কামনায় যত প্রকার নির্য্যাতন, বিঘ্ন ও বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা যেন নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের আনুগত্যে সহ্য করিবার মত শ্রীগুরু-কৃপায় বল প্রাপ্ত হই। শ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জকের অকপট কৃপা-কটাক্ষ জন্ম-জন্মান্তর পরেও এই কুলাঙ্গারের প্রতি পতিত হইলে অসংখ্য লোকের কটাক্ষ আমাকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারিবে না। ভক্তিমণ্ডপের স্বরূপ-রূপানুগবর পরিমার্জ্জক বিনোদ-বাণী-গৌর কোনদিন পরিমার্জ্জন-সেবার কোনপ্রকার যোগানদারি-কার্য্যে এই

কুলাঙ্গারকে আহ্বান করিবেন—এইরূপ অকপট আশাবন্ধ হৃদয়ে ভরপুর রাখিয়া যেন অনন্তকোটি জন্ম বরণ করিতে পারি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট আনুগত্যে এই ভক্তিমণ্ডপের পরিমার্জ্জকের সেবা-কাম ব্যতীত ভুক্তিমণ্ডপ বা মুক্তিমণ্ডপের কোন প্রকার লোকরঞ্জনকারী বীরত্বে যেন প্রলুব্ধ না হই।

—*—

ভূতানুকম্পা

'ভূত'-শব্দের অর্থ 'প্রাণী'। 'ভূতানুকম্পা' বলিতে প্রাণী বা জীবমাত্রেরই প্রতি দয়া। এই ভূতানুকম্পা বা 'জীবে দয়া' ধর্ম্মটা মনোধর্ম্মের ছাঁচে পড়িয়া নানাপ্রকার ব্যভিচারী রূপ প্রকাশ করিয়াছে। "ভূতমহেশ্বরেরই ভূত" এই বিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র অভাব হইলে ভূতমহেশ্বর হইতে ভূতকে পৃথক্ করিয়া বা ভূতকেই ভূতমহেশ্বরের সহিত একাকার করিয়া যে কল্পনাময় দর্শনের পিপাসা, তাহা হইতেই নানাপ্রকার অনর্থ ও জগজ্জঞ্জালের উৎপত্তি হইয়াছে। এইজন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে (৯।১১) শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥"

সর্ব্বভূত-মহেশ্বররূপ আমার পরমভাব জানিতে না পারিয়া মূর্খগণ আমাকে 'মানবতনু-গ্রহণকারী' বলিয়া প্রাকৃতবুদ্ধি করে।

কতকগুলি ব্যক্তি ভূতমহেশ্বরকে 'ভূত' মনে করে, আবার কতকগুলি লোক ভূতকেই 'ভূতমহেশ্বর' মনে করে ; অন্য কতকগুলি লোক ভূতরূপী আপনাকেই ভূতমহেশ্বর কল্পনা করে, অন্য কতিপয় লোক ভূতরূপী নিজ হইতে অন্য ভূতের উদর-ভেদ করিয়া থাকে ; কতকগুলি লোক ব্যষ্টিভূত ও সমষ্টি-ভূতের অন্তর্য্যামী অধিযজ্ঞ ও অধিদৈবত-পুরুষোত্তমের সংবাদ না জানিয়া ব্যষ্টিভূত ও সমষ্টিভূতকে ভূত-মহেশ্বররূপে কল্পনা করে ; কতকগুলি লোক ভূতকে ভূতমহেশ্বর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া ভূতমহেশ্বরের পূজার অভিনয় করে। ইহারা সকলেই ভূতমহেশ্বরের 'পরমভাব' জানিতে না পারিয়া তাঁহার অবজ্ঞাকারী। ইহারা ভূতমহেশ্বরের শুদ্ধ-সত্ত্বময়তনুতে প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্টভাবে প্রাকৃত-বুদ্ধিকারী।

অনাদর, অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞাহেতু মহিমজ্ঞান বা স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব হয়। ভূতমহেশ্বরের অনাদর হইতে ভূতের অনাদরের উদ্ভব হইয়াছে। সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামি-দৃষ্টি যত কম হইবে, ততই উদর-ভেদ ও উদরের অবস্থিতির স্থানভেদজাত ভেদবুদ্ধি, সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তির বিশ্বব্যাপিনী অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইতে থাকিবে। সর্ব্বভূতে সর্ব্বভূত-মহেশ্বরের অন্তর্য্যা-মিত্ব-দর্শনের অভাবে যে ভূঁই ও ভূঁড়ির ভেদবুদ্ধি বিশ্বভূতের স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছে, তাহা হইতে রাজনীতি ও অর্থনীতিরূপ ভেদ-নীতির জন্ম হইয়াছে। ভূতের ভূঁইয়ের ভেদ হইতে রাজনীতির

ভেদ ও ভূতের ভুঁড়িভেদ হইতে অর্থনীতির ভেদের পরিকল্পনা হইয়াছে। সমস্ত ভূতের অন্তর্য্যামী সর্ব্বভূত-মহেশ্বর; তাঁহার মানুষী তনু অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রাকৃতের ন্যায় সৌসাদৃশ্যযুক্ত হইলেও প্রকৃতির অতীত—এই জ্ঞান, যাহারা মোঘাশা অর্থাৎ নিষ্ফল-আশাবিশিষ্ট, যাহারা মোঘ-কর্ম্মা অর্থাৎ নিষ্ফল-কর্ম্মা, যাহারা মোঘ জ্ঞানী অর্থাৎ বৃথাজ্ঞানী বা কুতর্কাশ্রিত-শাস্ত্রজ্ঞানবিশিষ্ট ও যাহারা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়াও বুদ্ধিভ্রংশকারিণী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতির আশ্রিত, তাহাদের কিছুতেই হইবে না। সর্ব্বভূত-মহেশ্বরের পরমভাব এবং তাঁহার অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি যত হইবে, তত ভূতানু-কম্পাস্বরূপ অন্তর্য্যামি-দৃষ্টি হইতে ভগবদ্‌বৈভব-দর্শনের দিকে অভিসার হইবে।

বর্ত্তমান যুগে বিশ্বে হিংসা ও প্রতিহিংসার যে বিশ্বব্যাপিনী রাক্ষসী মূর্ত্তির অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহার মূলে ভূতমহেশ্বরের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ব্বক ভূতের প্রতি অনুকম্পারাহিত্য। যে ভূতকে ভোগ্য-রূপে পরিণত করা যায়, কেবল তাহাকেই সাময়িকভাবে অর্থাৎ ভোগকালে তোষণের অভিনয়ে অপস্বার্থপরতা-সিদ্ধির যে চেষ্টা—যেমন ছাগমাংস-ভক্ষণের জন্য ছাগকে তৃণাদির দ্বারা দয়া বা পুষ্ট করিবার যে ছলনা, তাহা ভূতানুকম্পা নহে, কাপট্যময়ী ভূতহিংসা।

শ্রীকপিলদেব শ্রীদেবহূতিকে বলিতেছেন,—

"আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥"

(শ্রীভাঃ ৩।২৯।২৬)

ইহার তাৎপর্য্য শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বলিতেছেন,—"'অন্ত-রোদরম্' উদরভেদেন ভেদং করোতি, ন তু মদধিষ্ঠানত্বেনাত্মসমং পশ্যতি ; ততশ্চ ক্ষুধিতাদিকমপি দৃষ্ট্বা স্বোদরাধিকমেব কেবলং বিভর্ত্তীত্যর্থঃ। তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুরূপোঽহমুল্বণম্ : ভয়ং সংসারম্।" (শ্রীভঃ সঃ ১০৫ অনুচ্ছেদ)

যে ব্যক্তি নিজের ও পরের মধ্যে উদর-ভেদহেতু পরস্পর ভেদবুদ্ধি করে অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ উদর বা দেহ আছে বলিয়া 'অমুক ব্যক্তি পর'—এইরূপ মনে করে, কিন্তু আমার অধিষ্ঠান-হেতু আত্মসম দর্শন করে না, সুতরাং ক্ষুধিত ব্যক্তিকে দেখিয়াও সে কেবল নিজ উদরাদিই পোষণ করে, সেই ভেদ-দর্শনকারীর মৃত্যুরূপী হইয়া আমি তাহাকে ভীষণ ভয়ে অর্থাৎ সংসারে পাতিত করি।

যাঁহারা বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া কর্ম্মার্পণাত্মক কর্ম্ম-মিশ্র অর্চ্চন করিবেন, তাঁহাদের সেই অর্চ্চন ভূত দয়া ব্যতীত সিদ্ধই হইতে পারে না। অর্চ্চনকার্য্যে কেবলমাত্র ভূতে অনাদরকারী ব্যক্তিরই সত্বর ফললাভ হয় না ; নতুবা যে-কোন প্রকারে শ্রীভগবানের পূজাদ্বারা ফললাভ অবশ্যই হয়।

"দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥"
(শ্রীভাঃ ৩।২৯।২৩)

সর্ব্বভূতে একই অন্তর্যামিমাত্র—এইরূপ দৃষ্টিরহিত, অতএব দেহে আত্মাভিমানী, সুতরাং ভূতসমূহের প্রতি বদ্ধবৈর ব্যক্তির

মন কখনই শান্তি লাভ করে না। শ্রীমহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—

"পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনম্।
বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশস্তস্য তূর্ণং প্রসীদতি॥"

কৃপালু পিতা যেমন পুত্রকে উৎপীড়ন করেন না, তদ্রূপ যিনি অন্য কোন ব্যক্তিকে উদ্বেগ প্রদান করেন না, সেই বিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তির প্রতি ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশ শীঘ্রই প্রসন্ন হন।

শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন,—

"অহমুচ্চাবচৈদ্র্ব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥"

(শ্রীভাঃ ৩।২৯।২৫)

হে অনঘে! ভূতসমূহের অবজ্ঞাকারী অর্থাৎ নিন্দাকারী ব্যক্তি উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বস্তুসমূহ এবং তদুৎপন্ন অনুষ্ঠানসমূহের দ্বারা অর্চ্চাতে পূজা করিলেও তাহার পূজায় আমি তুষ্ট হই না।

ভূতদ্বেষ অপেক্ষাও ভূতনিন্দা অধিকতর দোষাবহ। ইহা শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—

"মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোনকালে।
পরচর্চ্চকের গতি নহে কভু ভালে॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৩.৪৩)

মহৎ বা বৈষ্ণবের নিন্দা বা অনাদর দূরে থাকুক, শ্রীকপিলদেব সাধারণ প্রাণিগণের অবমাননাদির নিন্দা করিয়াছেন,—

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্ ॥"

(শ্রীভাঃ ৩।২৯।২১)

শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বলেন,—"শ্রীকপিলদেবেন সাধারণানামপি প্রাণিনামবমানাদিকং নিন্দিতং, কিমুত তদ্বিধানাম্ ; * * 'ভূতেষু' বক্ষ্যমাণরীত্যা অপ্রাণভৃজ্জীবমারভ্য ভগবদর্পিতাত্ম-জীবপর্য্যন্তেষু ; 'ভূতাত্মা' তদন্তর্যামী, তং মামবজ্ঞায়—তেষামবজ্ঞয়া তদধিষ্ঠানকস্য মমৈবাবজ্ঞাং কুরুতে কৃত্বেত্যর্থঃ। ততস্তাং কৃত্বা যোঽর্চ্চাং মৎ-প্রতিমাং কুরুতে, স 'তদ্বিড়ম্বনং' তস্যা অবজ্ঞামেব কুরুতে ইত্যর্থঃ।" (শ্রীভঃ সঃ ১০৫ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ মহদ্-বৈষ্ণবগণের কথা ত' দূরে থাকুক, শ্রীকপিলদেব সাধারণ প্রাণিগণেরও অপমানাদি-কার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন। হে মাতঃ ! আমি সর্ব্বভূতে অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদি প্রাণবৃত্তি-হীন (সুপ্তচেতন) জীব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবানে আত্ম-সমর্পণকারী জীব পর্য্যন্ত (পূর্ণ-বিকচিত-চেতন) সকল ভূতের অন্তর্য্যামী ; সেইরূপ আমাকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক অর্থাৎ তাহাদিগের অবজ্ঞার দ্বারা তাহাদের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়স্বরূপ আমাকেই অবজ্ঞা করিয়া যে ব্যক্তি আমার অর্চ্চা স্থাপন করে, সে অর্চ্চার বিড়ম্বনা অর্থাৎ অবজ্ঞাই করে।

"যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্,
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥"

(শ্রীভাঃ ৩।২৯।২২)

"'মৌঢ্যাৎ' শৈলী দারুময়ী বা কাচিং প্রতিমেয়মিতি মূঢ়-বুদ্ধিত্বাৎ, যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু বর্ত্তমানং পরমাত্মানমীশ্বরং মাং হিত্বা তস্যা ময়ৈক্যমবিভাব্য 'অর্চ্চাং' মদীয়াং প্রতিমাং ভজতে কেবল-লোক-রীতি-দৃষ্ট্যা তস্যৈ জলাদিকমর্পয়তি, তস্য চ মূঢ়স্য মদ্দৃষ্ট্যভাবাৎ সর্ব্বভূতাবজ্ঞাপি ভবতি।" (শ্রীভঃ সঃ ১০৫ অনুচ্ছেদ)

যে ব্যক্তি মূঢ়তাবশতঃ অর্থাৎ 'এই প্রতিমাটী প্রস্তরময়ী, কাষ্ঠময়ী'—এইরূপ মূঢ়বুদ্ধিপ্রযুক্ত সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান পরমাত্মা ঈশ্বর-স্বরূপ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ আমার সহিত আমার অর্চ্চামূর্ত্তির ঐক্যবুদ্ধি না করিয়া মদীয় প্রতিমার ভজন করে, যে কেবল লৌকিক-রীতি-দৃষ্টিতে সেই প্রতিমায় জলাদি অর্পণ করে, সেই মূঢ় ব্যক্তির সর্ব্বভূতে আমার দর্শনাভাবহেতু সর্ব্বভূতের প্রতি অবজ্ঞারূপ দোষ হয়। তাহার সেইরূপ অর্চ্চন ভস্মে ঘৃতাহুতি-প্রদানের ন্যায় নিরর্থক হয়।

"অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥"

(শ্রী ভাঃ ৩।২৯।২৭)

এইহেতু সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামিরূপ অবস্থিত আমাকে যথাযুক্ত যথাশক্তি দানের দ্বারা, দান-সামর্থ্যের অভাবে সম্মানের দ্বারা মিত্রভাবে অভিন্ন-দৃষ্টিতে বা ভিন্ন-দৃষ্টিতে পূজা করিবে। 'অভিন্ন-দৃষ্টিতে' বলিবার কারণ এই যে, শ্রীশ্রীসনকাদির প্রতি জয়-বিজয়ের অপরাধ হেতু তাঁহাদিগক সান্ত্বনা-প্রদান-প্রসঙ্গে শ্রীনারায়ণের উক্তি' —হে ঋষিগণ! ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী ও অনাথ প্রাণিসমূহ—

এই তিনটী আমারই তনুকে অর্থাৎ অধিষ্ঠানকে আমা হইতে
ভেদবুদ্ধিতে যাহারা দর্শন করে, আমার প্রদত্ত অধিকারলব্ধ
দণ্ডধারী যমের ক্রুদ্ধ গৃধ্রাকার সর্পতুল্য দূতগণ চঞ্চুদ্বারা পাপনষ্ট-
চক্ষু সেই ব্যক্তিগণের চক্ষুগুলিকে ছেদন করে। অতএব শ্রীভগ-
বানের এই সকল অধিষ্ঠান ভূতসমূহকে শ্রীভগবান্ হইতে ভিন্ন-
দৃষ্টিতে দেখিলে শ্রীভগবানেরই অবমাননা করা হয়। 'অভিন্ন
দৃষ্টিতে দেখা' অর্থে 'অন্তর্য্যামি-দৃষ্টিতে দেখা' বা 'ভগবানের
অধিষ্ঠানরূপে দেখা'; ভূতগণের দেহ বা আকারকে শ্রীভগবানের
সহিত একাকার করা নহে। যাহারা ভূতগণের দেহকেই 'সত্ত্বতনু
ভগবান্' বা 'নারায়ণ' বলে, তাহাদের দর্শন রাক্ষস-দর্শন; ইহা
পরে প্রদর্শিত হইবে।

'ভিন্নদৃষ্টিতে দর্শন' এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিলে স্বদেহ-সম্পর্কিত
স্ত্রী-পুত্রাদি ভূতের প্রতি যেভাবে দৃষ্টি করা হয়, তাহা হইতে অতি
বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্মানজনক দৃষ্টিতে পূজা করিবে—
ইহাই তাৎপর্য্য। সকল প্রাণীর সম্বন্ধে সাধারণভাবে সম্মানের
উপদেশ থাকিলেও শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিলদেব পাত্রের বৈশিষ্ট্য
নিরূপণ করিয়া সম্মানের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিয়াছেন। বিষ্ণুর সমস্ত
পাত্রের মধ্যে বৈষ্ণবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অন্য জীবের প্রতিও যোগ্যতা-
অনুসারে যথাশক্তি আদর করা কর্ত্তব্য। ইহাও পরে প্রদর্শিত
হইবে।

বর্ণাশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তিগণ প্রাণিমাত্রকে অন্তর্য্যামি-দৃষ্টিতে
আদর করিবেন। যদি দ্রব্যাদির দ্বারা একান্ত সামর্থ্য না থাকে,

তবে অন্ততঃ মানদান অর্থাৎ আসনাদি-প্রদান বা মিষ্ট কথায় আদর করিতেই হইবে। যাহারা ইহা না করিবে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী ও অনাথ প্রাণীকে কোনরূপে পরিত্যাগ করিবে, তাহারা ধর্ম্মরাজ যমের কিঙ্করগণের ক্রোধানলে নিশ্চয় পতিত হইবে। গৃহস্থলীলাভিনয়কারী স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর অতিথি-সেবা ও প্রাণিমাত্রের প্রতি আদরপ্রদর্শনের লীলা প্রকাশ করিয়া উদর-ভেদবাদী জীব-জগৎকে ভূতাদর শিক্ষা দিয়াছেন। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন,—

"প্রভু সে পরম-ব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার॥
দুঃখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি'।
অন্ন, বস্ত্র, কড়ি-পাতি দেন গৌরহরি॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যা'র যেন যোগ্য, প্রভু দেন সবাকারে॥

* * * *

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
'অতিথির সেবা'—গৃহস্থের মূলকর্ম্ম॥
গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে।
পশু-পক্ষী হইতে 'অধম' বলি তা'রে॥
যা'র বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট দোষে।
সেই তৃণ, জল, ভূমি দিবেক সন্তোষে॥

'তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১১-১৩, ২১-২৪)

শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুর অন্যত্র বলিয়াছেন,—
"ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি'।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি' ॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম—সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্ম-ধ্বজী, যা'র ইথে নাহি রতি ॥"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৩।২৮-২৯)

"বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্ ॥"
(শ্রীভাঃ ১১।২৯।১৬)

শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজের নিকট শ্রীনারদ গৃহস্থগণের যে পরম-ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এই উপদেশ পাওয়া যায়,—

"যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥"
(শ্রীভাঃ ৭।১৪।৮)

যে পরিমাণ অর্থাদি-দ্বারা উদর পূর্ণ হয়, তদুপযোগী অর্থাদি-তেই শরীরিগণের অধিকার। ইহা অপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষী চোর, অতএব দণ্ডার্হ।

"মৃগোষ্ট্রখরমর্কাখুসরীসৃপ্ খগমক্ষিকাঃ।
আত্মনঃ পুত্রবৎ পশ্যেৎ তৈরেষামন্তরং কিয়ৎ ॥"

(শ্রীভাঃ ৭।১৪।৯)

মৃগ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, মর্কট, মূষিক, সর্প, পক্ষী ও মক্ষিকা—ইহাদিগকে স্বীয় পুত্রের তুল্য দর্শন করিবে; যেহেতু, পুত্রাদি হইতে ইহাদের পার্থক্য কি পরিমাণ?

"আশ্বাঘান্তেঽবসায়িভ্যঃ কামান্ সংবিভজেদ্ যথা।
অপ্যেকামাত্মনো দারাং নৃণাং স্বত্বগ্রহো যতঃ ॥"

(শ্রীভাঃ ৭।১৪।১১)

কুকুর, পতিত ব্যক্তি এবং চণ্ডাল প্রভৃতিকে যথাযোগ্য ভোগ্যবস্তু বিভাগ করিয়া দিবে। মমতাস্পদ একমাত্র ভার্য্যাকে আত্ম-সেবায় উপেক্ষা করিয়াও অতিথি-সেবায় নিযুক্ত করিবে।

"ভূতানুকম্পা শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সমস্ত শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা জানিতে পারা গেল; অতএব ভূতকেই 'পরমেশ্বর' জানিয়া তাহাদের সেবা করাই ত কর্ত্তব্য? পৃথক্ পরমেশ্বরের পূজা বা অর্চ্চনের প্রয়োজন কি? পরমেশ্বর আমাদের দৃষ্টির গোচরীভূত নহেন, ভূতসমূহ আমাদের স্থূল-দৃষ্টিরও অন্তর্গত; অতএব, প্রত্যক্ষ পরমেশ্বরকে নারায়ণ বা পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাঁহারই সেবা ও তাহাতে প্রেমের অনুশীলন করা যাউক্। পরমেশ্বরই নানাপ্রকার অভাবগ্রস্ত ভূতরূপে আমাদের সেবা ও প্রীতি গ্রহণ করিবার জন্য এই জগতে বহুমূর্ত্তিতে আসিয়াছেন; অতএব অতিথি-নারায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণ, দুঃস্থ-নারায়ণ, মেথর-

নারায়ণ প্রভৃতিরই সেবা ও তাহাদিগের প্রতি প্রেমই পরমধর্ম্ম।" —যখন এই প্রকার এক মায়াচ্ছন্ন মতবাদ জগতে প্রকাশিত হইল, তখন এইরূপ এক ছড়া (slogan) প্রচারিত হইল,—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

যাঁহারা পরমেশ্বরের পূজা করিবার সময় বলিতেছিলেন— "পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়ের অতীত ; পরমেশ্বর নিত্যসুখবোধতনু, আনন্দ-নিধি, পূর্ণ, সনাতন পরমানন্দলক্ষণ", তাঁহারাই তাঁহাদের পূর্ব্বকথা ভুলিয়া গিয়া এইবার বলিলেন—"আমাদের প্রত্যক্ষ-ইন্দ্রিয়গোচর, কর্ম্মফলবাধ্য, ত্রিতাপ-বৈচিত্র্যের নানা দুঃখ ও ক্লেশে জর্জ্জরিত, অভাবগ্রস্ত, রোগী, দরিদ্র, মেথর, মুর্দ্দাফরাস—ইহারাই নারায়ণ।"

সকলজীবেরই অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে নারায়ণ বাস করেন সত্য, কিন্তু কর্ম্মফলবাধ্য যে দেহ বা ভূতাকার, তাহা কি নারায়ণ ? এইখানে কতকগুলি লোক বৈশারদী মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া বলিলেন,—"ইহারাই নারায়ণ বটে। 'পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ি' কাঁদে।' পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়িয়া ব্রহ্ম বা নারায়ণ আপ-নাকে দুঃখিত, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তের ন্যায় দেখাইতেছেন। সুতরাং ইহাদের সেবা করিলে ব্রহ্মেরই—নারায়ণেরই উপাসনা হইবে। ইহাদিগের প্রতি প্রীতি করিলেই অর্থাৎ ভূত-প্রেম করিলেই হইবে।"

আজ এই মতবাদ সমস্ত বহির্ম্মুখ মানবজাতির মস্তিষ্ককে

মহামারীর ন্যায় গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার প্রতিকূলে কোন যুক্তি বা শাস্ত্রীয় বিচার শুনিবার বা চিন্তা করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। এই সংক্রামক মনোধর্ম্মে শতকরা প্রায় শতজন বহির্ম্মুখ ব্যক্তি আক্রান্ত। অন্তর্য্যামি-দৃষ্টির পরিবর্ত্তে আকারকেই 'নারায়ণ' মনে করিতেছে, অথচ ইহারা সাকার-উপাসনার বিরুদ্ধ-বাদী! ইহারা 'নিরাকার ব্রহ্মের ইহাই সাকার রূপ'—এইরূপ কল্পনা করিয়া লইয়াছে। তাহাতে ব্রহ্মদর্শনের বা অন্তর্য্যামী পরমাত্মাদর্শনের পরিবর্ত্তে ভূতদর্শনরূপ রাক্ষসদর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ ভূতদর্শনকে শ্রীমদ্ভাগবত 'কল্মাষপাদদর্শন' বা 'রাক্ষস-দর্শন' বলিয়াছেন; কারণ, ভূত কখনও ভূতমহেশ্বর নহেন। **অনাদি-বহির্ম্মুখ যে সকল জীব কর্ম্মফলে বিভিন্ন ভূতাকারে বিভিন্ন সংসার-দশা লাভ করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে ভূতমহেশ্বরকে অন্তর্য্যামিরূপে দর্শন করিয়া ভূতের প্রতি অনুকম্পা করিলেই পরস্পরের মঙ্গল হয়। অন্তর্য্যামি-দর্শন পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভূতানুকম্পা অর্থাৎ কর্ম্মফল-বাধ্য ভূতাকারের বা তাহাদের দেহমনের সেবা করিলে সংসার-দশা লাভ হয়। অন্তর্য্যামি-দর্শন হইতে উন্মুখতা আরম্ভ; আর ভূতাকার-দর্শনে বিমুখতারই পুনরাবৃত্তি।** ভূত কখনই ভূতমহেশ্বর হইতে পারে না—জীব কখনও ব্রহ্ম নহে। জীব বা ভূত মায়াবশযোগ্য, আর ভূতমহেশ্বর বা শ্রীনারায়ণ মায়াধীশ। যাঁহারা ভূতকে নারায়ণ কল্পনা করিয়া ভূতাকারের ইন্দ্রিয়-তর্পণকে 'ভূতপ্রেম' বলেন, তাঁহাদের প্রেম জাগতিক কামমাত্র। কারণ,

অন্তর্য্যামী বা পরমাত্মা হইতে বদ্ধজীবকে পৃথক্ করিয়া বা বদ্ধজীবকেই সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র মনে করিয়া তাহার যে বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টা, তাহা কাম ব্যতীত আর কি হইতে পারে? বদ্ধ-জীবের ইন্দ্রিয়গুলি প্রকৃতির বিকৃতি; ইহাই সাংখ্য-শাস্ত্র ও বিজ্ঞান নির্ণয় করিয়াছেন। প্রকৃতির বিকৃতিগুলির তর্পণ মায়িক কাম ব্যতীত আর কি? **এইজন্য যাহারা অন্তর্য্যামি-দৃষ্টি-রহিত হইয়া ভূত-প্রীতির অভিনয় করে, তাহারা আপাত-ভূত-রক্ষক হইয়া পরে ভূত-ভক্ষক হইয়া পড়ে। যাহাদিগের প্রতি সাময়িক প্রীতি প্রদর্শন করে, তাহাদিগকেই পরমুহূর্ত্তে যূপ-কাষ্ঠে বলি দেয়। তাহাদের এই প্রীতির অভিনয় কেবল প্রভুত্ব-কামনা।** ইহারা সম্ভবতঃ স্বজাতিপ্রীতিরূপ-বহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন মানুষকে 'নারায়ণ' বলিয়া ছাগ, মৎস্য, কুক্কুট, কচ্ছপ প্রভৃতি ভূতকে 'অনারায়ণ' মনে করে অথবা যুক্তির খাতিরে 'নারায়ণ' বলিতে বাধ্য হইয়া সেই কল্পিত নারায়ণগুলিকেই রাক্ষসের ন্যায় ভক্ষণ করে। **যদি দরিদ্র নারায়ণ হয়, মেথর-মূর্দ্দাফরাস নারায়ণ হয়, তবে অতিদীন অসমর্থ ছাগ-মেষাদি কি নারায়ণ নহে? তাহাদিগকে ভক্ষণ করাই কি তাহাদিগের প্রতি প্রেম? "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?" —এই উক্তি কি মনুষ্যের প্রতি প্রযোজ্য? ছাগমেষাদির প্রতি কি প্রযোজ্য নহে? ইহারা কি মেথর-মূর্দ্দাফরাস হইতেও অধিক দীন, অনাথ ও অভাব-গ্রস্ত নহে? অনাথ-নারায়ণ কি কেবল স্বজাতি**

মনুষ্যই? অনাথ ছাগ-মেষ-কুক্কুট-কচ্ছপাদির জন্য যে অনাথাশ্রম উন্মুক্ত হয় ও তাহাদের প্রতি যে প্রেম করা হয়, তাহা কি কেবল তাহাদিগকে কিছুদিন খোঁয়াড়ে বা খাঁচার মধ্যে আট্‌কাইয়া রাখিয়া তাহাদের অঙ্গ সাময়িকভাবে পুষ্ট করাইয়া তাহাদিগকে যূপকাষ্ঠে আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে?

যাহারা উক্ত ছড়াটি (slogan) গান করে, তাহাদিগকে যদি কেহ এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাহারা বলে,—"আমরাও জীবে নারায়ণ আছেন, ইহা বিচার করিয়াই তাহার প্রতি প্রেম প্রদর্শন করিতে বলি।" তখন যদি তাহাদিগকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা যায়,—"জীবে নারায়ণ ও জীবই নারায়ণ—উভয়ই কি এক? আর স্বরূপশক্তির বৃত্তি প্রীতি বা প্রেম কি অনিত্য ভূতদেহে প্রযুক্ত হইতে পারে?" যদি আরও জিজ্ঞাসা করা যায়,—"তোমরা অন্যান্য ভূতগণকে ঈশ্বর ভাব কি? না, কেবল মনুষ্যকেই ঈশ্বর মনে কর?" তখন তাহারা বলে,—"মনুষ্যের জীবনের অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা অধিক মূল্য আছে।" যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, "এই মূল্য কি তোমাদের সুবিধাবাদের দিক্ হইতে? তোমরা তথাকথিত সভ্যমানব-সমাজের অন্তর্ভূক্ত; সুতরাং নরমাংসভোজী নহ, অথবা নরনির্ম্মিত দণ্ডনীতিতে অন্যান্য জীবহত্যায় কোন দণ্ড নাই, কিন্তু নরহত্যায় দণ্ড আছে—এই বিচারে কি তোমরা নরকে 'নারায়ণ' বলিতেছ? কিন্তু ছাগকে ত 'নারায়ণ' বলিতে পারিতেছ না? কেবল সময় সময় কি যুক্তির

খাতিরে মৌখিকভাবে ছাগেরও নারায়ণত্ব স্বীকার করিতেছ?" শ্রীকপিলদেব কিন্তু জীবের তারতম্য বিচার করিয়াছেন। প্রত্যেক জীবেই অন্তর্য্যামিরূপে বিষ্ণু আছেন। যে জীব যতটা বিষ্ণুর অধিক সন্তোষ বিধান করে, সেই জীব ততটা শ্রেষ্ঠ এবং সেই জীব ততটা অধিক আদর পাইবার যোগ্য—ইহাই শ্রীকপিলদেব শ্রীমদ্-ভাগবতে ভূত-বিজ্ঞানের বিচার অবতারণা করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন।

"জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ॥
তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ॥
রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ॥
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।
ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ॥
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মকৃৎ।
মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্ম্মমাত্মনঃ॥
তস্মান্ময্যর্পিতাশেষ-ক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণঃ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ।"

(শ্রীভাঃ ৩।২৯।২৮-৩৩)

মাতা দেবহূতিকে ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন—"হে

মঙ্গলদায়িন মাতঃ! অচেতন পদার্থ অপেক্ষা জীব অর্থাৎ সচেতন পদার্থ—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা (শ্বাসাদি ক্রিয়াশীল) প্রাণবৃত্তিমান্ জঙ্গমপদার্থ—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা জ্ঞানবান্ পদার্থ-শ্রেষ্ঠ; আর তদপেক্ষা ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট বৃক্ষাদি—শ্রেষ্ঠ।

স্পর্শ অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা অনুভবশীল বৃক্ষাদি অপেক্ষা রস অর্থাৎ জিহ্বেন্দ্রিয়-দ্বারা অনুভবশীল মৎস্যাদি—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা গন্ধ অর্থাৎ নাসিকেন্দ্রিয়দ্বারা অনুভবশীল ভ্রমরাদি—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা শব্দ অর্থাৎ কর্ণেন্দ্রিয়দ্বারা অনুভবশীল সর্পাদি—শ্রেষ্ঠ।

সেই সর্পাদি অপেক্ষা রূপভেদবিৎ অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা বস্তুর রূপবৈশিষ্ট্যানুভবশীল কাকাদি পক্ষী—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা উভয়দিকে (পঙ্‌ক্তিতে) দন্তযুক্ত (পাদহীন) জীব-শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা বহুপদ জীব—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা চতুষ্পদ জীব (পশু) —শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা দ্বিপদ জীব (মনুষ্য)—শ্রেষ্ঠ।

মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ, তন্মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ—শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ—শ্রেষ্ঠ; বেদজ্ঞ অপেক্ষা বেদার্থবিৎ শ্রেষ্ঠ।

বেদার্থজ্ঞ অপেক্ষা সংশয়চ্ছেত্তা অর্থাৎ মীমাংসাকারী—শ্রেষ্ঠ; মীমাংসাকারী অপেক্ষা স্বধর্ম্মানুষ্ঠানকারী—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা মুক্তসঙ্গ (অর্থাৎ সঙ্গত্যাগী, নিষ্কাম, অনাসক্ত, বিরক্ত জ্ঞানী)—শ্রেষ্ঠ; যেহেতু তাঁহার স্বকৃত-কর্ম্ম-ফলাভিসন্ধি নেই।

এই জ্ঞানী অপেক্ষাও যে ব্যক্তি জ্ঞানাদি-সাধনের প্রতি আদর না রাখিয়া অশেষ ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল আমাতে অর্পণ করেন, সেই

ভক্ত—শ্রেষ্ঠ; হে মঙ্গলমূর্ত্তি-জননী! যে ব্যক্তি আমাতে সর্ব্ব-প্রকারে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া নিজ দেহের ভরণ-পোষণাদির জন্য কোন চিন্তা না রাখিয়া সর্ব্বদা নিজকে ভগবদধীন ভাবনা, ফলকামনামূলক অন্য কোন কামনা না করিয়া একমাত্র ভগবান্ আপনাকে ভক্তি করেন এবং সর্ব্বভূতে ভগবদধিষ্ঠান-বোধে নিজের মত হিত-কামনা করেন, সেই ভক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ প্রাণী আমি আর কাহাকেও দেখি নাই।

"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্‌বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥"

(শ্রীভাঃ ৩।২৯।৩৪)

জীবরূপা কলার সহিত অর্থাৎ বিভিন্নাংশের সহিত ভগবান্ অধিযজ্ঞ-পুরুষোত্তম অন্তর্য্যামি ঈশ্বররূপে সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট, ইহা জানিয়া চিত্তদ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত-সমূহকে সম্মান প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করিবে।

"পুরাণ্যনেন সৃষ্টানি নৃতির্য্যগৃষিদেবতাঃ।
শেতে জীবেন রূপেণ পুরেষু পুরুষো হ্যসৌ॥
তেষ্বেব ভগবান্ রাজংস্তারতম্যেন বর্ত্ততে।
তস্মাৎ পাত্রং হি পুরুষো যাবানাত্মা যথেয়তে॥"

(শ্রীভাঃ ৭।১৪।৩৭-৩৮)

ভগবান্ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ঋষি এবং দেবতারূপ শরীর-সকল সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং অন্তর্য্যামিরূপে তাহাদিগের মধ্যে শায়িত থাকেন, এই কারণে তিনি 'পুরুষ'-নামে প্রসিদ্ধ।

হে রাজন্! সেই শরীরসমূহে ন্যূনাধিকভাবে ভগবান্ অধিষ্ঠিত আছেন ; সুতরাং পুরুষই পাত্র। যাবৎ পরিমিত জ্ঞানাংশ যাহাতে প্রতীত হয়, তাহা তদ্রূপ পাত্র হইয়া থাকে।

শ্রীনারদ-যুধিষ্ঠির-সংবাদের "কর্ম্মনিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ" ইত্যাদি (৭।১৫।১-২) শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়া শ্রীল শ্রীজীব প্রভু বলিতেছেন—"অনেন যথাত্র মুমুক্ষু প্রভৃতীনাং জ্ঞানিপূজৈব মুখ্যা, পুরুষান্তরপূজা তু তদভাব এব, তথা প্রেমভক্তিকামানাং প্রেমভক্ত-পূজা জ্ঞেয়া।" (শ্রীভঃ সঃ ২৯৪ অনু)

'জ্ঞাননিষ্ঠকেই হব্য (দেবতার উদ্দেশ্যে দেয় বস্তু) ও কব্য (পিতৃগণের উদ্দেশে দেয় বস্তু) প্রদান করিবে, জ্ঞানিপুরুষের অভাবে অন্যান্য পুরুষগণকে তাহা প্রদান করিতে হইবে।'—এই উক্তির দ্বারা যেইরূপ মুমুক্ষুগণের সম্বন্ধে জ্ঞানিপুরুষের পূজাই মুখ্যা এবং তাহার অভাবস্থলে অন্য ব্যক্তির পূজা জ্ঞাপিত হইয়াছে, তদ্রূপ প্রেমভক্তিলাভেচ্ছুগণের সম্বন্ধেও প্রেমভক্ত-পূজাই মুখ্যা জানিতে হইবে।

এই সকল প্রমাণানুসারে দেহধারী জীবগণের মধ্যে জ্ঞান-বিকাশের তারতম্যানুসারে যে জীবের দ্বারা যতটা অধিক শ্রীভগবানের সন্তোষবিধান হয়, সেই জীবের প্রতি ততটা অধিক আদর প্রদর্শন করাই ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের অভিপ্রায়।

"ততো মদ্ভক্তেষ্বেবাদরবাহুল্যাদিকং কর্ত্তব্যম্ ; অন্যত্র তু যথাপ্রাপ্তং যথাশক্তি চেতি ভাবঃ।" (শ্রীভঃ সঃ ১০৫ অনুচ্ছেদ)

অতএব আমার ভক্তগণের প্রতি প্রচুর আদরাদি কর্ত্তব্য, অন্যত্র অর্থাৎ অন্যান্য ভূতে যথাযোগ্য যথাশক্তি আদর করিতে হইবে। তাহাই পরের শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

ঈশ্বর সর্ব্বভূতে জীবনিয়ামকরূপে প্রবিষ্ট আছেন,—ইহা জানিয়া এই সমুদয় প্রাণীকেই বহুমানপুরঃসর মনে মনে প্রণাম করিবে। অতএব নিত্যারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব বা শ্রীবৈষ্ণব—যাঁহারা পরতত্ত্বের প্রেষ্ঠ ও প্রিয় অর্থাৎ পরতত্ত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রীতি-বিশিষ্ট, তাঁহাদের ন্যায় অন্যান্য জীবকে আদর করিতে হইবে না। তাহাদিগকে যথাযোগ্য যথাশক্তি সম্মান করিতে হইবে।

জীবে প্রেম দেখাইতে গিয়া কেহ কেহ মেথরকে আলিঙ্গন করে এবং তাহা সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রচার করিয়া প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করে, অথচ ইহারা বৈষ্ণবকে লঙ্ঘন করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। কেহ কেহ মনুষ্য-নির্ব্বিশেষে 'সকলই নারায়ণ' মুখে বলিলেও নিজের দেহ ও দেহ-সম্পর্কিত বস্তুর প্রতি অধিক প্রীতি-সম্পন্ন হয় এবং নিজ দেহের সেবাই নারায়ণের সেবা বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ দরিদ্র-নারায়ণ, রোগি-নারায়ণ ও দুঃস্থ-নারায়ণের সেবাশ্রম বা আর্ত্তাশ্রম প্রভৃতি উন্মোচন করিয়াও ভূঁই-ভেদ ও ভূঁড়ি ভেদজনিত অর্থনীতি ও রাজনীতির বিচার হইতে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে তাহাদের কল্পিত নারায়ণগণের মৃত্যুসাধক অস্ত্রশস্ত্র ও বিষাক্ত দ্রব্যাদি আবিষ্কার করিবার জন্য সমগ্র সত্তা নিয়োগ করে। ইহা একহস্ত নারায়ণের (?) পাদদেশে, আর একহস্ত তাঁহার গলদেশে প্রদান করিবার নীতিরূপ কাপট্য ব্যতীত আর

কি ? অন্তর্য্যামি-দৃষ্টি-রহিত হইয়া যাহারা ভূতমাত্র-দৃষ্টিতে ভূতকম্পা করে, তাহাদের এইরূপ কল্মাষপাদ-দর্শন বা রাক্ষস-দর্শন অবশ্য-ম্ভাবী। শ্রীমদ্ভাগবতে সৌদাস-রাজার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যা-য়িকাটী শ্রুত হয়।

সুদাসপুত্র রাজা সৌদাস কোন সময়ে মৃগয়া করিতে করিতে কোন এক রাক্ষসকে বধ করেন। ইহাতে উক্ত রাক্ষসের ভ্রাতা ভ্রাতৃবধ-প্রতীকার-বাসনায় রাজা সৌদাসের অনিষ্ট-চিন্তা করিয়া তাঁহার প্রাসাদে পাচকরূপে অবস্থান করিতে লাগিল। একদিন কুলগুরু বশিষ্ঠ রাজগৃহে আগমন করিলে উক্ত পাচকরূপী রাক্ষসটী বশিষ্ঠ-মুনিকে নরমাংস রন্ধনপূর্ব্বক প্রদান করে। যোগবিভূতিশালী বশিষ্ঠ দিব্যদৃষ্টিতে অভক্ষ্য-দ্রব্য পরিবেশিত হইতেছে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে "নরমাংসভোজী রাক্ষস হও" বলিয়া রাজাকে অভিশাপ প্রদান করেন। কিন্তু বশিষ্ঠ কিছুকাল পরে উক্ত কার্য্য রাক্ষসের, পরন্তু রাজার নহে—ইহা জানিতে পারিলেন। রাজা সৌদাস জলাঞ্জলি-গ্রহণপূর্ব্বক গুরু বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। ইহাতে রাজ-মহিষী মদয়ন্তী রাজাকে নিবারণ করেন। তখন রাজা সৌদাস দশদিক্‌ আকাশ, পৃথিবী—সকল স্থানই জীবময় দর্শন করিয়া জীবগণের বিনাশ হইবে ভাবিয়া সেই মন্ত্রপূত জলাঞ্জলি নিজ-পদদ্বয়ে নিক্ষেপ করেন। ইহাতে সৌদাসের পদদ্বয় কল্মষতা অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং তিনি বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস-ভাবাপন্ন হন।

"বারিতো মদয়ন্ত্যাপো রুশতীঃ পাদয়োর্জহৌ।
দিশঃ খমবনীং সর্ব্বং পশ্যন্ জীবময়ং নৃপঃ ॥"

(শ্রীভাঃ ৯।৯।২৪)

যে রাজা সৌদাস সর্ব্বত্র জীবদর্শন করিয়া জীবের অনিষ্টা-শঙ্কায় নিজপদদ্বয়ে সেই অনিষ্ট বরণ করিয়াছিলেন, সেই কাল্মষ-পাদই রাক্ষস-ভাবাপন্ন হইয়া অন্য এক বনবাসী ব্রাহ্মণকে তাঁহার সাধ্বী পত্নীর নিকট হইতে বল-প্রয়োগে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ তাহাকে বিধবা করিয়া ব্যাঘ্রের পশুভক্ষণের ন্যায় ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

ভূতকে ভূতমহেশ্বর বা নারায়ণ-কল্পনা যেইরূপ রাক্ষস-দর্শন বা পাষণ্ডী মতবাদ, অন্তর্য্যামি-দৃষ্টিরহিত হইয়া কেবল ভূতানুকম্পা-বৃত্তিও তদ্রূপ সংসারের হেতু। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে মহাভাগবতবর শ্রীভরতের আদর্শে লোকশিক্ষাকল্পে প্রদর্শিত হইয়াছে। মহারাজ শ্রীভরত সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীহরিক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক শ্রীহরিভজন করিতেছিলেন। মহানদীর তটে শ্রীভরতের প্রণব-জপ-কালে একটী পূর্ণগর্ভা জলপান-রতা হরিণী সহসা সিংহগর্জ্জনে ভীষণ ভয়বিহ্বলা হইয়া লম্ফ-প্রদানপূর্ব্বক নদী উল্লঙ্ঘন করায় তাহার গর্ভপাতহেতু গর্ভস্থ শিশুটী জলে পতিত হয় ও হরিণী প্রাণত্যাগ করে। তখন শ্রীভরত "ন্যূনং হ্যার্য্যাঃ সাধব উপশমশীলাঃ কৃপণ-সুহৃদ এবং বিধার্থে স্বার্থানপি গুরুতরানুপেক্ষন্তে" (শ্রীভাঃ ৫।৮।১০। অর্থাৎ উপশমশীল আর্য্য সাধুগণ দীনজনের সুহৃদ্, তাঁহারা দীন-ব্যক্তিগণকে দয়া করিবার জন্য আপনাদের গুরুতর অর্থও উপেক্ষা

করেন—এই বিচার করিয়া স্রোতে ভাসমান অনাথ হরিণশিশুটীকে নিজ আশ্রমে লইয়া সর্ব্বতোভাবে লালন-পালন করিতে থাকেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, অনাথ প্রাণী শ্রীভগবানের তনু অর্থাৎ অধিষ্ঠান। সেই অধিষ্ঠানকে যে ভেদবুদ্ধিতে দর্শন করে, সে যমদণ্ড্য হয়। অনাথ হরিণশিশুটীকে রক্ষা করায় ভরতের কেন মৃগত্ব-প্রাপ্তি অর্থাৎ হরিভজনকারীর ন্যায় বৈকুণ্ঠ-গতি না হইয়া সংসার-গতি লাভ হইয়াছিল? তাহা হইলে ভূতানুকম্পার দ্বারা কি শ্রীভগবানের তোষণ হয় না? সংসার-গতিই কি লাভ হয়? শ্রীভগবদুক্তি ও সাধুশাস্ত্রের উক্তির সহিত ভরতের গতির সঙ্গতি কোথায়? ভরতের এইরূপ গতি দেখিয়া কেই বা ভূতগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে সাহসী হইবে?

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীক্রমসন্দর্ভে ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ইহার সমাধান করিয়াছেন। প্রথমে একটী কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, ভক্তিসিদ্ধ শ্রীভরতের এই যে ভূতপালনেচ্ছারূপ সাত্ত্বিক-কষায়-প্রতিম ভাব, তাহাকে কোন কোন তত্ত্ববিৎ "শ্রীভগবানের প্রতি উৎকণ্ঠা-বর্দ্ধনার্থ ভগবদিচ্ছানুসারেই সংঘটিত হইয়াছিল" (শ্রীভঃ সঃ ১৫৮ অনু)—এইরূপ বলিয়া থাকেন। কারণ, দুর্ব্বল সামান্য প্রারব্ধ কর্ম্ম কিছুতেই পরমসবলা ভগবদ্ভক্তিকে বাধা দিতে পারে না।

অতএব কেবল লোক-শিক্ষা-কল্পে মহাভাগবত ভরতের দ্বারা শ্রীভগবান্‌ই ঐরূপ আচরণ করাইয়াছিলেন। শ্রীভরত অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে ভূতানুকম্পা না করিয়া কেবল-ভূতদৃষ্টিতে অর্থাৎ মাংসদৃষ্টিতে

মৃগশাবকের প্রতি দয়া-প্রদর্শনের অভিনয় করিয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তজ্জন্যই তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মাচরণ একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছিল। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। হরিণ-শিশুতে ভরতের এইরূপ আত্মীয়-অভিমান হইয়াছিল যে, উহাকে অহরহঃ তৃণাদির দ্বারা পোষণ, বৃকাদি হইতে রক্ষণ, কণ্ডুয়নাদির দ্বারা প্রীতিসম্পাদন ও চুম্বনাদির দ্বারা লালন প্রভৃতি ব্যাপারে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার নিজের স্নানাদি নিয়ম, অহিংসাদি আচরণ ও মহাপুরুষ বিষ্ণুর পরিচর্য্যাদি কৃত্য প্রত্যহ এক একটী করিয়া ভ্রষ্ট হইতে থাকায় কতিপয় দিনের মধ্যেই সমস্ত ধর্ম্মাচরণই একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছিল (শ্রীভাঃ ৫।৮।৮)। মৃগশিশুর অন্তর্যামী মহাত্মাকে না দেখিয়া কেবল মৃগশিশুর দেহে অত্যাসক্ত হওয়ায় বিষ্ণুর আবেশের পরিবর্ত্তে ভরতের উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান, ভোজনাদি প্রত্যেক কার্য্যেই মৃগদেহেরই আবেশ হইয়াছিল (শ্রীভাঃ ৫।৮।১১)। অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে ভূতানুকম্পা করিলে পরমাত্মার অনুসন্ধানই প্রবল হয় এবং ক্রমে ক্রমে শ্রীভগবানে আবেশ হয়, ভূতাকারের প্রতি আবেশ হয় না ; কিন্তু ভরতের ভূতাকারের জন্যই বিরহে ও মিলনে সর্ব্বক্ষণ আবেশ হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তদন্তর্যামীর পূজা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি ভগবদর্চ্চন হইতে ভ্রষ্ট হইলেন (শ্রীভাঃ ৫।৮।২৬)। সুতরাং যে বিষয়ে যাহার অভিনিবেশ, তদ্রূপত্ব-লাভ তাহার স্বাভাবিক অর্থাৎ পরমাত্মার আবেশের দ্বারা মুক্তি ও ক্রমে প্রীতিলাভ হইতে পারে ;

কিন্তু ভূতাকার-মাত্রের আবেশের দ্বারা দ্বিতীয়াভিনিবেশবশতঃ ভীতি বা সংসৃতি অনিবার্য্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভূতানুকম্পা-প্রদর্শনকারী অতিথিপরায়ণ আর এক মহাত্মার আচরণ বর্ণিত আছে। তিনি ভরদ্বাজবংশীয় শ্রীরন্তিদেব। তিনি কিছুই নিজে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন না, সর্ব্বস্ব দান করিতেন। তাহাতে আত্মীয়-পাল্যবর্গের সহিত অত্যন্ত কষ্টবোধ করিতেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাঁহাদের শরীর কম্পমান হইত। তাহাতে তিনি সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া জলপান পর্য্যন্ত করিতেন না ; কিন্তু তিনি সর্ব্বভূতে অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে এইরূপ অতিথিসেবা ও ভূতাদর করিতেন। একদিন ভোজনকালে শ্রীরন্তিদেব ভোজন করিতে যাইবেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন—

"তস্মৈ সংব্যভজৎ সোঽন্নমাদৃত্য শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
হরিং সর্ব্বত্র সম্পশ্যন্ স ভুক্ত্বা প্রযযৌ দ্বিজঃ॥"

(শ্রীভাঃ ৯।২১।৬)

শ্রীরন্তিদেব সর্ব্বভূতে ভগবৎসম্বন্ধ দর্শন করিতেন। সুতরাং তিনি অতিথিকে সমাদর করিয়া শ্রদ্ধা-সহকারে ঘৃত-পায়সাদি বিভাগ করিয়া দিলেন। অতিথিও অন্ন ভোজন করিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার পর শ্রীরন্তিদেব অবশিষ্ট অন্ন স্বজনগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া স্বয়ং ভোজন করিতে যাইবেন, এমন সময় অন্য একজন শূদ্র অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকেও তিনি ভগবৎ-

সম্বন্ধ-দৃষ্টি করিয়া অন্ন বিভাগ করিয়া দিলেন। সেই শূদ্র ভোজনান্তে গমন করিলে, কুক্কুর-পরিবেষ্টিত হইয়া একজন কুক্কুর-স্বামী অতিথি আসিলেন। রন্তিদেব সেই কুক্কুরস্বামীকে ও কুক্কুর-দিগকে বহু সম্মান করিয়া অবশিষ্ট অন্ন প্রদান করিলেন এবং অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে তাহাদিগকে নমস্কার করিলেন। ইহার পর মাত্র একজনের পরিমাণ পানীয় জল অবশিষ্ট থাকিল। তিনি সেই জলটুকু পান করিতে যাইবেন, এমন সময় এক চণ্ডাল অতিথি আসিয়া জল প্রার্থনা করিল। তাহাকে অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে জলদান ও মিষ্টবাক্যে আদর করিয়া শ্রীরন্তিদেব অভ্যর্থনা করিলেন। ফলাকাঙ্ক্ষিগণের ফলদাতা ব্রহ্মাদি দেবতাবর্গ ও বিষ্ণু-বিনির্ম্মিতা মায়া শ্রীরন্তিদেবকে ছলনা ও পরীক্ষা করিবার জন্য তৎপরে আগমন করিলেন। কিন্তু—

"স বৈ তেভ্যো নমস্কৃত্য নিঃসঙ্গো বিগতস্পৃহঃ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্ত্যা চক্রে মনঃ পরম্॥"

(শ্রীভাঃ ৯।২১।১৬)

আসক্তিরহিত ও বিষয়ভোগস্পৃহাশূন্য হইয়া শ্রীরন্তিদেব ব্রহ্মাদি দেবতাবর্গকে নমস্কার করিয়া কেবলমাত্র ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে ভক্তিসহকারে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন।

"ঈশ্বরাবলম্বনং চিত্তং কুর্ব্বতোঽনন্যরাধসঃ।
মায়া গুণময়ী রাজন্ স্বপ্নবৎ প্রত্যলীয়ত॥"

(শ্রীভাঃ ৯।২১।১৭)

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শ্রীরন্তিদেব ভগবদ্ভিন্ন অন্যফলা-

পেক্ষাশূন্য হইয়া চিত্তকে ভগবন্নিষ্ঠ করিয়াছিলেন ; সুতরাং গুণময়ী মায়া তাঁহার নিকট স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইত।

"তৎপ্রসঙ্গানুভাবেন রন্তিদেবানুবর্ত্তিনঃ।
অভবন্ যোগিনঃ সর্ব্বে নারায়ণপরায়ণাঃ ॥"

(শ্রীভাঃ ৯।২১।১৮)

শ্রীরন্তিদেবের অনুগতজন সকলে তাঁহার (শ্রীরন্তিদেবের) কৃপাশক্তিপ্রভাবে ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ যোগী হইয়াছিলেন।

শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু দয়াবীররসে স্থায়িভাবরূপা ভগবৎ-প্রীতিসমুৎপন্না দয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই দয়ায় সমস্ত জীবকে তদীয় অর্থাৎ শ্রীভগবানের বলিয়া উপলব্ধি হয়। দয়াবীররসের দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে শ্রীরন্তিদেবের উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীরন্তিদেব ও শ্রীভরতের ভূতানুকম্পার দুইটি পৃথক্ আদর্শের দ্বারা শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু ক্রমসন্দর্ভেও অন্তর্যামি-দৃষ্টিহীন কেবল ভূতানুকম্পার দ্বারা যে বন্ধন হয় ও অন্তর্যামি-দৃষ্টির সহিত ভূতানুকম্পায় যে ভগবৎসন্তোষ হয়, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরন্তিদেব শ্রীবাসুদেবে ভক্তিময় যে মোক্ষের প্রতি অনাদর করিয়াছিলেন, তাহাও ভগবানের কারুণ্যবিভাবনময় ভক্তিকৃত।

"কেবলজীবকারুণ্যং খলু বিঘ্নায় ভবতি ভরতবৎ। যো মোক্ষানাদরঃ ; সোঽপি তৎকারুণ্য-বিভাবনময়ভক্তিকৃতঃ।" (ক্রমসন্দর্ভে ৯।২১।৫—৮)

অতএব শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু সিদ্ধান্ত

করিয়াছেন,—"অতএব কেবলভূতানুকম্পয়া শ্রীভগবদর্চ্চনং ত্যক্তবতো ভরতস্যান্তরায়ঃ। তস্মাদ্ভূতদয়ৈব ভগবদ্‌ভক্তির্মুখ্যা, নার্চ্চনমিতি নিরস্তম্।" (শ্রীভঃ সঃ ১০৫ অনু)

অতএব অন্তর্যামি-দৃষ্টিহীন কেবল-ভূতানুকম্পা বা জীবে দয়ার দ্বারা শ্রীভগবদ্ভজন-পরিত্যাগকারী ভরতের বিঘ্ন হইয়াছিল। সুতরাং ভূতদয়াদ্বারাই ভগবদ্ভক্তি মুখ্যা অর্থাৎ যাঁহারা প্রাণীর প্রতি দয়া করেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভগবদ্ভজন করেন। 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" ভগবানের পৃথক্ পূজার আর প্রয়োজন কি?—এই নাস্তিক্য মতবাদ নিরস্ত হইল।

অতএব অন্তর্য্যামি-দৃষ্টিহীন কেবল-ভূতানুকম্পার দ্বারা শ্রীভগবদ্ভজন-পরিত্যাগকারীরই পতন হয়, ইহাই শ্রীভরত মহারাজ অভিনয় করিয়া দেখাইলেন। শ্রীরন্তিদেব অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে ভূতানুকম্পা করিয়াছেন এবং সর্ব্বক্ষণ শ্রীবাসুদেবে ভক্তিবিশিষ্ট ও অভিনিবিষ্ট ছিলেন। এইজন্য ফলদাত্রী দেবতাগণ ও গুণময়ী মায়া তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে পারেন নাই। শ্রীবাসুদেবে ভক্তির আবেশে আবিষ্ট শ্রীরন্তিদেবের অনুসরণকারী ব্যক্তিগণও শ্রীনারায়ণ-পরায়ণ ভক্তিযোগী হইয়াছিলেন। অন্তর্যামি-দৃষ্টিহীন ভূতানুকম্পায় ভরতের ভূতের নশ্বর আদরের প্রতি আবেশ হইয়াছিল, আর অন্তর্যামি-দৃষ্টিযুক্ত শ্রীরন্তিদেবের ভূতানুকম্পারূপ কর্ম্মার্পণের ফলে তাঁহার শ্রীবাসুদেবে আবেশ হইয়াছিল; অতএব অন্তর্যামি-দৃষ্টিহীন কেবল ভূতদয়া বা জীবে দয়া বা আধুনিক কালের অতাত্ত্বিক-পরিভাষায় যাহা 'জীবসেবা' বা 'জীবপ্রেম', উহা

ভগবদ্ভক্তি, আর পৃথক্ ভগবদ্ভক্তি নাই—ইহাই মুখ্য উপাসনা, শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনের প্রয়োজন নাই অর্থাৎ 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥"—এই নাস্তিক্য-মতবাদ নিরস্ত হইল।

ভূতানুকম্পার বিচারে আর একটী সংশয় ও কুতর্ক অজ্ঞ ব্যক্তিগণের হৃদয়ে উদিত হয়। প্রাণিমাত্রকেই যখন হিংসা করা উচিত নহে ও আদর করা উচিত এবং শ্রীভগবান্ প্রাণিমাত্রের প্রতি হিংসাকারীর অর্চ্চন স্বীকার করেন না, তখন অর্চ্চনের জন্য যে পত্র-পুষ্পাদি চয়ন করা হয়, তদ্দ্বারা অনিচ্ছাকৃত হিংসা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। যদি ছাগাদি-বলি হিংসা বলিয়া বিহিত হয়, তবে কেন পুষ্প-পত্রাদি অর্চ্চনোপকরণ সংগ্রহ-চেষ্টা হিংসা বলিয়া গণিত হইবে না ? কুতার্কিকগণ এইভাবে বিচার করিয়া যখন দেখিতে পায় যে, বায়ুভক্ষণ করিয়া অবস্থান করিলেও হিংসা অনিবার্য্য, তখন তাহারা হিংসাকেই জীবের নৈসর্গিক ধর্ম্ম বলিয়া বহুমানন করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন,—

"নিষেবিতানিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা।
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ ॥
মদ্ধিষ্ণ্যদর্শন-স্পর্শ-পূজা-স্তুত্যভিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ ॥"

* * * *

"মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্ ॥"

(শ্রীভাঃ ৩।২৯।১৫-১৬, ১৯)

"'নাতিহিংস্রেণ' প্রাণ্যাদিপীড়াপরিত্যাগ ফলপত্রাদি জীবাবয়ব-স্বীকারার্থঃ।" (শ্রীভঃ সঃ ২২৯ অনুচ্ছেদ)

"নাতিহিংস্রেণ অতিহিংসারহিতেনৈত্যতি-শব্দেন ভগবন্মন্দির-মার্জ্জন-লেপনতদর্থান্নাদিবিবিধ-নৈবেদ্যসাধনাদিষ্বতি-দুর্ব্বার-দুর্লক্ষ্য-সূক্ষ্মজীব-হিংসন-শাক-পত্র-মূল-ফলাদিত্রোটনাদাবপি ন ক্ষতিরিতি জ্ঞাপিতঃ।" (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর)

শ্রীকপিলদেবেরই উক্তি হইতে জানা যায় যে, অতিহিংসা-রহিত যে পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনরূপ ক্রিয়াযোগ, তাহা ভূতসমূহের মধ্যে অন্তর্যামিভাবনার ন্যায় শ্রীভগবান্‌কে সত্বর লাভ করায়। এই স্থানে 'নাতিহিংসা'-শব্দের দ্বারা পত্র-পুষ্পাদি-চয়ন-লক্ষণা অর্চ্চন-ক্রিয়ায় সামান্য হিংসাও বিহিত হইয়াছে এবং ইহা ভূতসমূহের মধ্যে ভগবদ্ভাবনার বিরোধী নহে। পরস্পর বিরোধী হইলে এই উভয় লক্ষণকে একসঙ্গেই তাঁহার প্রাপ্তির উপায় বলিয়া বলিতেন না। শ্রীভগবান্ যাহাতে সন্তুষ্ট হন, সেইভাবে অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছার অনুকূলে ও অবিরোধে নিখিল চেষ্টা করাই ভক্তি। ইহাতে ধর্ম্মার্থ-কামিগণের তত্তৎকামনা-পূরয়িত্রী দেবতার প্রতি বলি-প্রদানের ছলে যে আত্মতোষণপর চেষ্টা, তাহা পঞ্চরাত্রোক্ত শ্রীহরি-তোষণপর 'নাতিহিংসা' হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ধর্ম্মার্থকামমুলক চেষ্টার দ্বারা জীবের সন্তোষ হয়, আর শ্রীহরিতোষণপর চেষ্টাদ্বারা শ্রীহরির প্রীতি হয়। শ্রীহরির প্রীতি যাহাতে হয়, তাহা কখনও হিংসা হইতে পারে না। আর শ্রীহরির প্রীতি যাহাতে না হয়, তাহার আকার হিংসার মত না থাকিলেও তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

হিংসা অর্থাৎ জগন্নাশকর কার্য্য। সমস্ত ব্যাপারই শ্রীহরিতোষণের মানদণ্ডে মাপিতে হইবে।

জৈনমতবাদের ভূতাদর বা অহিংসা, আর শুদ্ধ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের ভূতাদর ও অহিংসায় প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বোক্ত মতবাদে ভূতমাত্র-দর্শনে ভূতানুকম্পা বিহিত হয়, আর বিষ্ণু-উপাসকগণ ভূতের অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে ভূতানুকম্পা করিয়া থাকেন ; এইজন্য বিষ্ণু-উপাসকগণের 'খাটমল খিলাইবা'র অর্থাৎ ভাড়াটিয়া মনুষ্যের রক্ত ছারপোকাকে খাওয়াইবার অর্থাৎ একপ্রাণীর প্রতি হিংসা করিয়া আর এক প্রাণীর প্রতি দয়ার ছলনা করিবার প্রয়োজন হয় না। একদিকে যেমন "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?"—নীতিবাদী ব্যক্তিগণ ছাগকে অনীশ্বর বলিয়া মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিবার পক্ষপাতী অথবা ছাগ-নারায়ণকে মনুষ্য-নারায়ণের ভোজ্য করিবার পক্ষপাতী, আর একদিকে এই মতবাদিগণেরই প্রতিযোগিরূপে জৈনমত মনুষ্যকে দিয়া ইতর প্রাণীর সেবা করাইতে বদ্ধপরিকর। **বিষ্ণু-উপাসকগণ এই উভয় মতবাদী হইতে বিলক্ষণ। তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর তোষণের জন্য শ্রীবিষ্ণুর অধিষ্ঠান-বোধে সর্ব্বভূতে আদর করিয়া থাকেন এবং যিনি বিষ্ণুর যত অধিক তোষণ করেন, তাঁহার প্রতি ততটা আদর ও প্রীতি প্রদর্শন করেন।**

কেহ কেহ ভূতানুকম্পা-সম্বন্ধে এত বিচার শ্রবণ করিয়াও আবার জিজ্ঞাসা করেন যে,—যদি ঘরে বিষাক্ত সর্প দৃষ্ট হয়, তবে কি তাহাকে মারিব না ? মশা, ছারপোকা, পিপীলিকা প্রভৃতি

গৃহের নিত্যসহচর প্রাণিগুলি যদি আমাদিগকে আক্রমণ করে বা আমাদের দ্রব্যাদি নষ্ট করে, তবে কি আমরা তাহাদিগকে বাধা দিব না? এই সকল প্রশ্ন অত্যন্ত বালোচিত ও প্রাকৃতবুদ্ধিজাত। যাঁহারা শ্রীভগবানে সমর্পিতাত্মা নহে বা শ্রীভগবৎসুখানুসন্ধানকে সকল বিষয়ে মানদণ্ড করেন নাই, তাঁহাদিগের অনন্ত প্রশ্ন, অনন্ত সন্দেহ অনন্তকাল হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া থাকিবে। যাঁহারা ভগবৎসুখানুসন্ধানে সতত যুক্ত থাকেন, শ্রীভগবান্ই তাঁহাদিগকে সর্ব্বক্ষণ বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। প্রীতিমানের নিকট হিংস্র প্রাণীও হিংসা হইতে নিবৃত্ত হয়। শ্রীগৌরসুন্দর যখন ঝারিখণ্ডের পথ দিয়া কৃষ্ণানুসন্ধান করিয়া চলিতেছিলেন, তখন বন্য হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লূকাদিও হিংসারহিত-ভাব প্রদর্শন, অধিক কি, প্রেম-পুলকিত হইয়া নৃত্য ও পরস্পর সম্ভাষণ করিয়াছিল। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস যখন ফুলিয়ায় গঙ্গাতীরে নির্জ্জন গুহায় ভজন করিতে-ছিলেন, তখন গুহাবাসী বিষাক্ত সর্পের জ্বালায় অন্যান্য সকলের ক্লেশের কথা শুনিয়া ঠাকুর হরিদাস স্থান পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলে মহানাগ নিজেই ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল। শ্রীব্রজ-মণ্ডলে শ্রীমানসী গঙ্গার উত্তরতীরে শ্রীবক্রেশ্বর-শিবের স্থানে ভজনকালে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু মশকের অত্যন্ত উপদ্রব দেখিয়া স্থান ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলে শ্রীবক্রেশ্বর-মহাদেবের ইচ্ছামাত্র সেই স্থান মশক-রহিত হইয়া অদ্যাপি তাহার সত্যতা প্রমাণিত করিতেছে। সূর্য্যকুণ্ডে শ্রীল মধুসূদন দাস গোস্বামী মহারাজ যখন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন, তখন হিংস্র সর্প পর্য্যন্ত

হিংসা ভুলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতে আসিত এবং ফণা নত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দণ্ডবৎ ও সমাপ্তিকালে দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া যাইত। পরমপ্রীতিমান্ মহাভাগবতগণের কথা দূরে থাকুক, যাঁহাদের মধ্যে শরণাগতির আভাসও আসিয়াছে তাঁহারাও পৃথিবীর কোন বস্তু হইতে ভীত হন না। এখনও মুনি-ঋষি ও ভজনানন্দিগণ কত গভীর বনে, পর্ব্বত-গুহায়, কত উপত্যকায় হিংস্র জন্তু প্রভৃতির সহিত বাস করিতেছেন। যাহার হৃদয়ে হিংসার বৃত্তি আছে, তাহাকেই অপরে হিংসা করিতে ধাবিত হয়। যাঁহারা অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে ভূতাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা ভজন-প্রভাবে যতই উন্নত হইবেন, ততই তাঁহাদের সর্ব্বত্র ভগবদ্বৈভব স্ফূর্ত্তি হইতে থাকিবে। অতএব ভূতাদর যে কেবল প্রাকৃত কনিষ্ঠ কনিষ্ঠের জন্য বিহিত হইয়াছে, তাহা নহে। তবে পার্থক্য এই যে, উত্তম মহাভাগবতগণে ভূতাদরটী শাস্ত্র-শাসনমূলক ত' নহেই, তাহা অতি স্বাভাবিক ও অদ্বিতীয় প্রীত্যাস্পদের সম্বন্ধে পরমভাব-বিশিষ্ট। এই সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু যাহা অতি গম্ভীরভাবে বিচার করিয়াছেন, তাহার একটু সামান্য দিগ্‌দর্শন করা হইতেছে।

যাঁহারা প্রথমোপাসক অর্থাৎ যাঁহাদের বৈষ্ণবপ্রকৃতি বা স্বভাবমাত্র আরম্ভ হইয়াছে, সেইরূপ মাত্র প্রারব্ধভক্তি ব্যক্তিগণ লোক-পরম্পরাগত শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির পূজা করেন, কিন্তু ভক্ত বা সর্ব্বপ্রাণীতে তাঁহাদের আদর নাই ; এইরূপ কনিষ্ঠ-সোপানাশ্রিত কনিষ্ঠগণের ভাবি-মঙ্গলের জন্য অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাবস্থিত এইরূপ

কর্ম্মমিশ্র-অর্চ্চনকারিগণের অধিকারের উন্নতির জন্য অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে সমস্ত ভূতের প্রতি আদর শাস্ত্র বিধান করিয়াছেন। ইঁহারা বর্ণাশ্রমে অবস্থিত অভিমান করিয়া যদি যুগপৎ বিষ্ণুর অর্চ্চন ও সর্ব্বভূতকে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান-জ্ঞানে সম্মান না করেন, তবে ইঁহাদের কোনদিনই বিষ্ণ্বাবেশ হইবে না ; কেবল লোকপরম্পরা-গত শ্রদ্ধায় প্রতিমার অর্চ্চন বর্ণাশ্রমাভিমানিগণের অর্থাৎ দেহাত্ম-বুদ্ধিকারিগণের কোন দিনই নির্গুণ শ্রদ্ধার উদয় করায় না, পরন্তু তাঁহাদের অর্চ্চনাভিনয়ও ব্যর্থ হয়। এইজন্য যাহারা কর্ম্মমিশ্র-অর্চ্চনকারী লৌকিক শ্রদ্ধাবান্, তাহারা 'সর্ব্বভূতে অন্তর্যামিরূপে বিষ্ণু বিরাজিত আছেন'—এই জ্ঞানটি শাস্ত্র-শাসনের দ্বারাও যদি লাভ করেন এবং ভূতাদরের সহিত অর্চ্চন করেন, তবে শীঘ্রই রাগ, দ্বেষ ও দেহাত্মবুদ্ধি হইতে নিবৃত্তি লাভ করিতে পারিবেন এবং মহতের কৃপায় শ্রদ্ধা যত পরিপক্ক হইতে থাকিবে, ততই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বা নির্গুণা শ্রদ্ধার দিকে গতি লাভ করিবেন ; শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রতি আদরযুক্ত, সর্ব্বভূতে সম্মানকারী, শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন করিতে করিতে প্রেমের নিকটস্থ হইতে থাকিবেন। তখন কনিষ্ঠসোপানাশ্রিতের কনিষ্ঠতা হইতে তাঁহাতে উত্তম-সোপানাশ্রিত মুখ্য-কনিষ্ঠতা প্রকাশিত হইলে সেইরূপ নির্গুণ-শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকের সর্ব্বভূতাদর-বৃত্তিটী সর্ব্বত্র শ্রীভগবদ্বৈভব-স্ফূর্ত্তির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবে। 'সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা ভগবদ্-বৈভব-স্ফূর্ত্তি' অর্থে 'সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের লীলাকর্ত্তৃত্ব-শক্তি-স্বীকার' অর্থাৎ তাঁহার ধাম, তাঁহার লীলা ও

পরিকরাদির স্ফূর্ত্তি। এইরূপ সশ্রদ্ধ সাধকের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে,—

"এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪৩ ধৃত স্কান্দবচন)

হে ব্যাধ! তোমার যে অহিংসাদি গুণ হইয়াছে, তাহা অদ্ভুত নয়, কেননা, যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা অন্যের ক্লেশদ হন না।

শ্রীনারদের কৃপাপ্রাপ্ত ব্যাধ তখন সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়া শ্রীতুলসী-সেবা, নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ও শ্রীনাম-ভজন-প্রভাবে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি আদরযুক্ত, নির্গুণ শ্রদ্ধাযুক্ত ও প্রেমের নিকটস্থ হইতেছিলেন, তখন একদিন শ্রীনারদ শ্রীপর্ব্বত-মুনির সহিত উক্ত ব্যাধকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। উক্ত ব্যাধ দূর হইতে শ্রীগুরুদেবের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া --

"আস্তে-ব্যস্তে ধাইয়া আসে, পথ নাহি পায়।
পথের পিপীলিকা ইতি-উতি ধরে পায়॥
দণ্ডবৎ-স্থানে পিপীলিকারে দেখিয়া।
বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৪।২৬৪-২৬৫)

ইহাতে—

"নারদ কহে,—'ব্যাধ, এই না হয় আশ্চর্য্য।
হরিভক্ত্যে হিংসাশূন্য হয় সাধুবর্য্য ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৪।২৬৬)

শ্রীনারদের কৃপালব্ধ ব্যাধের পিপীলিকাকে দেখিয়া বস্ত্রের দ্বারা স্থান ঝাড়িয়া যে দণ্ডবৎ করিবার আদর্শ, তাহা জৈন বা বৌদ্ধ-মতবাদোখ তথাকথিত অহিংসা নহে। তাহাতে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সবিশেষ-পরতত্ত্বের লীলাকর্ত্তৃত্বশক্তি স্বীকার অর্থাৎ শ্রীধাম, লীলা ও পরিকরস্ফূর্ত্তিরূপ ভগবদ্‌বৈভব-স্ফূর্ত্তি আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীহরিভক্তিতে প্রবৃত্ত অর্থাৎ নির্গুণ সশ্রদ্ধ সাধক, তাঁহাদেরও সর্ব্বত্র ভগবদ্বৈভবের স্ফূর্ত্তি আরম্ভ হয়; সিদ্ধগণের ত' সর্ব্বভূতাদরের মধ্যে সপরিকর ইষ্টদেবের দর্শন পরিপক্কই হইয়া থাকে; আর যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক শ্রীগোকুলবাসিগণের মঙ্গলকামনাময় সিদ্ধ-বন্ধুতাদিভাবে লুব্ধ হইয়া সুতীব্র আবেগের সহিত তাঁহাদের চরিত্র অনুসরণ করেন এবং সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিজ ভক্তের প্রতি বন্ধুভাবের অনুধ্যান করেন, সেই রাগানুগ ভক্তগণের সর্ব্বজীবে সর্ব্বত্র প্রিয়তা-বুদ্ধি স্বভাবতঃই উদিত হইয়া থাকে। প্রেমের প্রথমোদয়াবস্থা-প্রাপ্ত জাতরতিগণের অহিংসা ও উপরতি কিন্তু নিজেরই অসাধারণ স্বভাব। যেমন শ্রীসূতগোস্বামি-প্রভুর উক্তি,—

"যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা
ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।

ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমন্ত্যং
যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্ম্মঃ ॥"

(শ্রীভাঃ ১।১৮।২২)

জ্ঞানী ও ভাগবতত্ব-ভেদে পরমহংস দুইপ্রকার। জ্ঞানি-পারমহংস্যকে আদি-পারমহংস্য ও ভাগবত পারমহংস্যকে অন্ত্য বা পরাকাষ্ঠাস্বরূপ ভাগবত-পারমহংসত্ব বলা হয়। শ্রীহরিতে অনুরক্ত ধীরগণ সহসাই দেহাদি-বস্তুধৃত আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পরম-কাষ্ঠাপন্ন পরমহংসত্ব লাভ করেন। সেই অবস্থায় অহিংসা অর্থাৎ মৈত্রী ও উপরম অর্থাৎ পরতত্ত্ব-আবেশময় অনুভবানন্দ বা উপশম অর্থাৎ নৈষ্ঠিকী ভক্তি স্বভাবসিদ্ধরূপেই বর্ত্তমান থাকে। অহিংসারূপ ক্ষান্তি কেবল ব্যতিরেকভাব প্রকাশ না করিয়া মৈত্রীরূপ অন্বয়ভাবে প্রকাশিত হয় অর্থাৎ সর্ব্বভূতকে অভীষ্টদেবের নিজজনরূপে দর্শন হয়, আর উপরম বা উপশম কেবলমাত্র ব্যতিরেকভাবে না হইয়া নিরবচ্ছিন্ন-তৈলধারাবৎ ভগবৎস্মৃতিরূপ নির্ব্বন্ধ বা অভিনিবেশরূপে বাস্তব অন্বয়ভাবে প্রকাশিত হয়।

পরমসিদ্ধ অর্থাৎ উত্তমোত্তম মহাভাগবতগণের চেতন-অচেতন সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাবের উপলব্ধি স্বভাবসিদ্ধ; তাহাই শ্রীহবিঃ মহারাজ বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥"

(শ্রীভাঃ ১১।২।৪৫)

উত্তমোত্তম মহাভাগবত স্থাবর-জঙ্গমাদি সর্ব্বভূতে অভীষ্ট

শ্রীভগবদ্‌ভাব অর্থাৎ শ্রীভগবানের আবির্ভাব-দর্শনরূপ বহিঃ-সাক্ষাৎকার করেন এবং নিজের মধ্যে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ইষ্টদেবের লীলা-পরিকরগণকে দর্শন করেন; ইহাই তাঁহাদের অন্তঃসাক্ষাৎকার। ইষ্টদেবের প্রতি নিজের রতি হইতে আরম্ভ করিয়া অধিরূঢ় মহাভাব পর্য্যন্ত ভাবে সর্ব্বভূতকে বিভাবিত দর্শন করেন এবং স্বচিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীইষ্টদেবের অবতারের আশ্রয়বিগ্রহরূপে ভূতসমূহকে দর্শন করেন। উত্তম মহাভাগবতের প্রতি কেহ অজ্ঞতাক্রমে শত্রুতাচরণ করিলেও সেই শত্রুর প্রতি অথবা শ্রীভগদ্বিদ্বেষী বা শ্রীভাগবত-বিদ্বেষীর প্রতি ইষ্টদেবেরই স্ফূর্ত্তি হয়; আর, মধ্যম-মহাভাগবতের বিদ্বেষীর ব্যবহারে চিত্তে অনভিনিবেশ-রূপ উপেক্ষার উদয় হয়। উত্তম মহাভাগবত শ্রীশুকদেবের কংসের প্রতি 'ভোজকুল-কুলাঙ্গার' রূপে উক্তি বা শ্রীউদ্ধবের ভক্তবিদ্বেষী ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের বন্দনা একই তাৎপর্য্যপর। শ্রীশুকদেবের ভগবদ্-বিদ্বেষীর প্রতি শাসন ও শ্রীউদ্ধবের ভক্ত-বিদ্বেষীর প্রতি বন্দনা—উভয়েরই মধ্যে ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

—:০:—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের উপদেশাবলী

১) যাহারা হরিভজন করে না,—beware of them (তাহাদের সঙ্গবিষয়ে খুব সাবধান থাকিতে হইবে)। তাহারা গুরুদেবকে ও তাহাদের আত্মীয়বর্গ সকলকেই ঠকাইতে চায়। তাহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র টান, আত্মীয়বুদ্ধি বা স্নেহ থাকিলে হরিভজনের আশা নাই।

২) শরণাগতের অবস্থা ঠিক কুকুরের মত। কুকুর প্রভুকে দেখিলেই আনন্দিত হয় এবং তাহা নানাভাবে প্রকাশ করে। তাহাকে যদি খাইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলেও সন্তোষের সহিত লেজ নাড়িবে ; আবার যদি খাইতে না দেয়, তবুও সে মনিবকে দেখিয়া সন্তোষের সহিত লেজ নাড়া বন্ধ করিবে না।

৩) দম্ভই কুরূপ, কুৎসিৎ ; উহা রূপকে নষ্ট বা আবৃত করিয়া ফেলে। অকিঞ্চনতা – রূপ, আর দম্ভ ঠিক্ উহার বিপরীত বস্তু। দম্ভ থাকিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বা শ্রীরূপের রূপে রূপসী হওয়া যায় না।

৪) বৈষ্ণবের সেবা-বিচারটি যাঁহার যত অধিক পরিমাণে উদিত হইয়াছে, তিনি তত অধিক বৈষ্ণবতা লাভ করিতে পারেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-বৈষ্ণবসেবকাভিমানেই গুরুত্ব সংপ্রতিষ্ঠিত।

৫) আমার বৈষ্ণব সেবা হইল না বলিয়া বৈষ্ণবমাত্রেরই দৈন্য থাকা অত্যাবশ্যক। সেই নিষ্কপট দৈন্য যাঁহার যত বেশী, তিনি তত অধিক কৃষ্ণের প্রিয়—কৃষ্ণ তাঁহার নিকট তত অধিক আকৃষ্ট।

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥
যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥

—ভগবান্ অজ্ঞ জনগণেরও অনায়াসে আত্মলাভের জন্য যে যে-সকল নিউপায় রূপণ করিয়াছেন, তাহাই 'ভাগবত ধর্ম্ম' বলিয়া জানিবে। হে রাজন্! ঐ সমস্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে মানব কখনও বিঘ্ন-কর্ত্তৃক বাধিত কিংবা নেত্র নিমীলন পূর্ব্বক ধাবিত হইলেও অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে কোন কর্ম্ম করিলেও স্খলিত অর্থাৎ প্রত্যবায়গ্রস্ত বা পতিত হন না।

—শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ